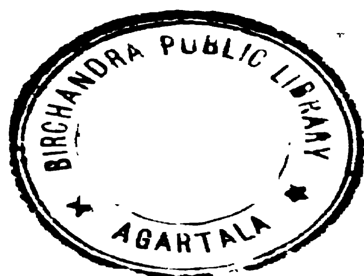
উপনগর

নরেন্দ্রনাথ মিত্র



বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো



প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন, ১৩৬৪

প্রকাশক : শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর : মন্মথনাথ পান
কে. এম. প্রেস
১।১ দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা-৬

সাত টাকা

শতদলবাসিনী বললেন, 'তা তো যাবেই। আজকে এই শুভদিনে ডাক্তার বৈদ্য না এলে চলবে কেন। আমার কপাল, সব আমার কপাল। ফিক ব্যথায় আবার ডাক্তার। সিভিল সার্জনকে ডেকে নিয়ে আসুক। অত আদর দিয়ে দিয়েই তো এই হয়েছে। ফিক ব্যথা না ছাই। আসলে ও যে কিসের ব্যথা তা কি আর আমি বুঝিনে। জায়গা পছন্দ হয় নি, বাড়ি পছন্দ হয় নি। সেই রাগ, সেই দুঃখ, সেই জেদের জানান দিচ্ছে। ফিক ব্যথা-ট্যথা কিচ্ছু নয়।'

এনাক্ষী ঠোঁটে আঙুল ছোঁয়াল, 'চুপ চুপ। তোমার গলা মা শুনতে পাচ্ছে।'

কমলাক্ষও বিরক্ত হয়ে ধমক দিল, 'চুপ কর ঠাকুরমা। তুমি কি আজও একটা ঝগড়াঝাঁটি না বাঁধিয়ে ছাড়বে না? তোমার মতো নিষ্ঠুরও তো আমি কাউকে দেখি নি। মানুষের অসুখ-বিসুখেও তোমার মনে দয়া হয় না?'

নাতি-নাতনীর কাছে মুখ না পেয়ে শতদলবাসিনী অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন, বললেন, 'আচ্ছা নটবরটা আবার গেল কোথায়? সেই যে পুরুত মশাইকে ডাকতে গেছে আর ফেরবার নাম নেই। যত ফাঁকিবাজের পাল্লায় পড়েছি আমি।'

নটবরটা বাড়ির পুরনো চাকর। পদমর্যাদায় কর্তার ঠিক পরেই তার স্থান। রক্ষা যে ফাঁকিবাজ কথাটা তার কানে যায় নি। নইলে বুড়োঠাকরুনকে সে দশ কথা শুনিয়ে ছাড়ত। সে কারো পরোয়া করে না। কর্তার উপরও কর্তৃত্ব করে।

কমলাক্ষ বিরক্ত হয়ে বলতে লাগল, 'কি দরকার ছিল এইসব হাঙ্গামার? অসুখ মানবে না, বিসুখ মানবে না। এখনো তোমার গুরু চাই, পুরুত চাই, ধোপা চাই, নাপিত চাই। কি দরকার ওসবের। আমরা যখন কিছু মানি নে, বিশ্বাস করি নে।'

শতদলবাসিনী বাধা দিয়ে বললেন, 'তোরা না করিস আমি করি, তোরা না মানিস আমি মানি। দেশ ছেড়েছি বলে তো আর ধম্মকম্ম সব ছেড়ে আসি নি! তা যদি ছাড়তাম তাহলে তো সেই ম্লেচ্ছ মুসলমানদের মধ্যেই

পক্ষে থাকতাম। আমি যতদিন আছি সব মানব, আমার ছেলেকে দিয়ে সব মানাব। তোদের আমলে যা খুশি তাই করিস তোরা।'

তরুণ বয়সী এক ডাক্তারের সঙ্গে প্রৌঢ় অমিয়ভূষণ বাড়িতে ঢুকলেন। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। দেখলে অবশ্য অতটা বোঝা যায় না। নাতিদীর্ঘ, নাতিপুষ্ট ভদ্রলোক। গায়ে পুরনো একটা খদ্দরের জামা। পরনে খাটো ধুতি। ফরসা রঙ। মুখটা একটু গোল ধরনের হলেও নাক চোখ লম্বা। মাথায় পাকা চুল হঠাৎ চোখে পড়ে না কিন্তু একদিন দাড়ি না কামালে দুটি গাল রুপালী দানায় চিকচিক করে। আজও তাই করছিল। অমিয়ভূষণ বললেন, 'কি হয়েছে মা। অত চেঁচাচ্ছ কেন।'

শতদলবাসিনী বললেন, 'চেঁচাচ্ছি সাধে। তোমার ছেলেমেয়েরা আমাকে খোঁটা দিচ্ছে ওদের কিচ্ছু দরকার নেই। এইসব গৃহসঞ্চার-টঞ্চার ওরা মানে না। বামুন পুরুতে ওদের বিশ্বাস নেই। আমি তোমাকে দিয়ে জোর করিয়ে করাচ্ছি।'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'না হয় তাই করাচ্ছ। তাতেই বা কি এসে গেল। ওদের তো কিছু করতে হচ্ছে না। করছি তো সব আমিই। ওরা তো সব ঠুঁটো জগন্নাথ। নড়েও বসবে না, হাত দিয়েও ছোঁবে না কিছু।' তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমিও আস্তিক নই। পার্সোন্যাল গডে আমিও বিশ্বাস করিনে। কিন্তু এথিক্স্ মানি, এস্থেটিক্স মানি। আমার সত্তর বছর বয়সের বুড়ো মায়ের হৃদয়কে মূল্য দিই। আসুন ডাক্তারবাবু।'

একটু বিরক্তভাবেই ডানদিকের ছোট ঘরখানিতে গিয়ে ঢুকলেন অমিয়ভূষণ। তরুণ ডাক্তার সুকুমার মিত্র ব্যাগ হাতে তাঁর পিছনে পিছনে গেল।

বাবার ধমক শুনে নিজের মনেই একটু হাসল কমলাক্ষ। নীতি সৌন্দর্যবোধ আর ঠাকুরমার হৃদয়ের দোহাই দিয়ে বাবা একটু একটু করে সব কুসংস্কারকেই বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছে। এরই নাম বয়স, এরই নাম বার্ধক্য। সৌন্দর্য! গামছা কাঁধে, পৈতে গলায় অর্ধশিক্ষিত বামুনঠাকুরের অশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণের মধ্যে কোনো সৌন্দর্য নেই, তাঁকে পোষণ করার মধ্যে

কোনো নীতিও নেই। বাবা যদি নাস্তিক, অন্ততপক্ষে অপৌত্তলিক, তবে শালগ্রাম শিলা কেন তার বাড়িতে ঢোকে, কেন আজও নারায়ণপুজো আর চৌরির ব্যবস্থা হয়? এর মূলে কি শুধু ঠাকুরমার হৃদয়? তাঁর নিজের মনের দ্বিধা নেই? নেই যুক্তির ওপর অনাস্থা? বাবা একথার জবাবে হেসে বলেন, 'ওতে কিচ্ছু এসে যায় না। মানে তাঁর ভিতরকার যুক্তির জোর এত বেশি, সেখানে নাস্তিক্যবোধ এত অটুট যে, এসব তুচ্ছ লোকাচার দেশাচারের অযৌক্তিকতায় তা টোল খায় না। কমলাক্ষ ভাবে, মিথ্যে কথা। বাবা আপোস করছেন। ঠাকুরমার হৃদয়কে মেনে চলবার নামে তিনি আপোস করছেন অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কারের সঙ্গে। তিনি বৃদ্ধকে আঘাত দেবেন না, নিরক্ষরকে দুঃখ দেবেন না, শুধু নিজে জ্ঞানী, বিজ্ঞানী আর পণ্ডিত হয়ে থাকবেন। কোনো মানে হয় না, কোনো মানে হয় না। এর নাম ক্রিয়াকর্ম নয়, এর নাম প্রতিক্রিয়া কর্ম।

এনাক্ষী আগেই চলে গিয়েছিল। এবার কমলও ঘরে গিয়ে ঢুকল। কল্যাণী তক্তাপোষের ওপর শুয়ে আছেন। একদিকে জিনিসপত্র টাল হয়ে পড়ে রয়েছে। এখনো সব গুছিয়ে তোলা হয় নি। এক পাশে অমিয়ভূষণের বোন করুণা দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার বয়স বছর চল্লিশেক। শ্যামবর্ণের ওপর মিষ্টি সুশ্রী চেহারা। দোহারা গড়ন্। করুণা বিয়ে করে নি। কোনোদিন করবেও না। এম. এ., বি. টি. পাশ করে হাইস্কুলে টিচারি করছে। অবশ্য স্কুলে যখন ঢুকেছিল তখন তার এত উঁচু ডিগ্রী ছিল না। আস্তে আস্তে কয়েক বছর বাদে বাদে এক একটি করে এই ডিগ্রীর অধিকারিণী হয়েছেন। এখন হেডমিস্ট্রেস হবার কথা চলছে করুণাকণার।

সুকুমার কিছুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে দেখল কল্যাণীকে। রোগের বিবরণ শুনল, উপসর্গের কথা শুনল। নাড়ি দেখল, থার্মোমিটারে টেম্পারেচার নিল, জিভ দেখল, তারপর সবাইকে ভরসা দিয়ে বলল, 'কিচ্ছু ভাববেন না, কলিক পেইন। এক ডোজ ওষুধেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আধ ঘণ্টার মধ্যে উঠে বসবেন উনি।'

করুণা উৎকণ্ঠার স্বরে বলল, 'দেখুন তো কি কাণ্ড। আজ গৃহপ্রবেশ। পাঁচজন লোক আসবে বাড়িতে। আজই বউদি অসুস্থ হয়ে পড়ল। কি করে যে কি হবে, আমি তো কিছুই ভেবে পাচ্ছি নে।'

কল্যাণীর বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ হয়েছে। বেশি মাত্রায় মোটা হয়ে পড়েছেন। কিন্তু এত মেদবাহুল্যও তাঁর সৌন্দর্যকে ঢেকে ফেলতে পারে নি। গায়ের রংঙে, নাক মুখ ঠোঁট চিবুকের গড়নে তিনি যে এনাক্ষীর মা, এমনকি যৌবনে এনাক্ষীর চেয়েও অনেক বেশী সুন্দরী ছিলেন তা বেশ বোঝা যায়। হঠাৎ দেখলে তাঁর এই স্থূলতাটা চোখে বিসদৃশ লাগে। কিন্তু একটু ভালো করে দেখলে সেই মেদবাহুল্যের ভিতর থেকে এমন একটি কান্ত কমনীয় শ্রী ফুটে বেরোয় যে, দর্শকের চোখ সরিয়ে নিতে ইচ্ছা করে না। সেই শ্রীর মধ্যে শুধু মাধুর্য নয়, একটু বিষণ্ণতাও যেন জড়িয়ে রয়েছে। তাতে কল্যাণীর রূপে শুধু লাবণ্য নয়, এক ধরনের রহস্যের ছায়া পড়েছে।

রোগ যন্ত্রণায় পাশ ফিরলেন কল্যাণী। পাশ ফিরতে ফিরতে বললেন, 'সেজন্যে ভেব না করুণা। আমি শুয়ে থাকলেও তোমাদের গৃহপ্রবেশের কোনো বাধা হবে না। শুভ কাজ ঠিকমতই চলবে।'

করুণা একবার দাদার মুখের দিকে তাকাল, তারপর বলল, 'কি যে বল বউদি, তোমার কথার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। তুমি বাড়ির কর্ত্রী, তুমি শুয়ে থাকলে সব যে পণ্ড হয়ে যাবে তা বুঝতে পারছ না?

ডাক্তার বলল, 'না, শুয়ে থাকবেন কেন। উনি এক্ষুনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। আমার সঙ্গে কাউকে দিন। আমি ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। উনি এক্ষুনি সেরে উঠবেন। অবশ্য ভালো করে পরে ট্রিটমেণ্ট করাতে হবে।'

অমিয়ভূষণই গেলেন ডাক্তারের পিছনে পিছনে। বাড়ির সীমানা ছাড়াবার আগে সুকুমার বলল, ওকি, আপনি আবার কষ্ট করে কেন আসছেন। কাজের বাড়ি। অন্য কাউকে দিন সঙ্গে। কেউ না থাকে আমি কম্পাউণ্ডারকে দিয়ে ওষুধ পাঠিয়ে দেব।'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'সিরিয়াস কিছু নয় তো?'

সুকুমার হেসে বলল, 'মোটেই না। আপনি মোটেই ভাববেন না প্রফেসর সেন। আচ্ছা, ওঁর কি আগে হিস্টীরিয়া-টিস্টীরিয়া কিছু ছিল?'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'ছিল। প্রথম বয়সে অনেকদিন তাতে ভুগেছেন।'

সুকুমার বলল, 'এ বয়সেও তা একেবারে যায় নি। আচ্ছা, আপনি আসুন, আমার কম্পাউণ্ডার এসে ওষুধটা দিয়ে যাবে।'

তরুণ ডাক্তারটি খুবই ভালো। কলোনির বাইরে বড় রাস্তার ওপর ডিসপেন্সারি খুলেছে। অল্পদিনেই খুব সুনাম কিনেছে, জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এখানে। বলতে গেলে বাড়ির ভিত পত্তনের দিন থেকে সুকুমারের সঙ্গে অমিয়ভূষণের আলাপ। তখন থেকেই তিনি তার সৌজন্যে মুগ্ধ।

ভিজিটের চারিটি টাকা সুকুমারের হাতে দিলেন অমিয়ভূষণ। দু টাকার নোটখানি সুকুমার তাঁর হাতে ফেরত দিয়ে বলল, 'কলোনির মধ্যে আমার ভিজিট দু টাকা।'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'কিন্তু আপনি তো এম. বি., আপনি তো শুনেছি গায়নোকোলজিতে স্পেশ্যালিস্ট।'

সুকুমার হেসে বললে, 'তা হলামই বা। এ তো আর কলকাতা শহর নয়। বেশির ভাগই দরিদ্র রিফিউজীদের বাস। এখানে ভিজিট চড়িয়ে রাখলে আমাকে উপোস করতে হবে, বেকার হয়ে থাকতে হবে। অবশ্য আপনাদের এই কীর্তিপুর কলোনির কথা স্বতন্ত্র। এখানে কীর্তিপুরকে সবাই বলে এদিককার চৌরঙ্গী, বলে বালীগঞ্জ। গণ্যমান্য ধনী ভদ্রলোকেরা সব এসে রয়েছেন এখানে, আচ্ছা চলি।'

নমস্কার জানিয়ে সুকুমার বিদায় নিল। ছেলেকে ডেকে অমিয়ভূষণ ডাক্তারের সঙ্গে পাঠালেন। দু টাকা ফেরত পেয়ে খুব খুশি হলেন না। কলকাতায় থাকতে বহুকাল দু টাকা ভিজিটের ডাক্তারকে বাড়িতে ডাকেন নি অমিয়ভূষণ।

বাড়ির চারদিকে এখনো পাঁচিল গাঁথা হয় নি। কলোনির চারদিকে সুরক্ষিত উঁচু প্রাচীর। বাড়ির জন্যে আলাদা পাঁচিল অনেকেই করে নি।

অমিয়ভূষণ এ সম্বন্ধে মনস্থির করতে পারেন নি। হয়তো পরে করে নেবেন। বাড়ির এখনো অনেক কাজই বাকি। রাজমিস্ত্রীকে আরো কতবার যে ডাকতে হবে তার ঠিক নেই।

পাঁচিল না তোলায় দক্ষিণ দিকটা সম্পূর্ণ খোলা পড়ে আছে। শুধু দক্ষিণ কেন, প্রায় সবদিক। বিশেষ করে পূব দক্ষিণ দু-দিকই খোলা থাকবে অমিয়ভূষণের। পাশের ছোট ছোট বাড়িগুলি দেখা যাচ্ছে। বেশির ভাগই একতলা ভিলা প্যাটার্নের বাড়ি। ছবির মতো সুন্দর দেখতে। অমিয়ভূষণের বাড়িটি সবচেয়ে সুন্দর। তাঁর শিল্পী বন্ধু বিজন রায় প্রথমে এই বাড়ির ছবি আঁকেন। তারপর ইঞ্জিনীয়ার বন্ধু সলিল দত্ত সেই ছবির একটু রদবদল করেন। তারপর কনট্রাক্টর আর রাজমিস্ত্রীরা সেই ছবিতে হাত দেয়। অবশ্য শিল্পীর মানস-লোকের চেহারা তাতে অনেক পালটে গেছে। তবু গোলাপী রঙের এই একতলা বাড়িটি যে কলোনির সবচেয়ে সুন্দর না হোক সুন্দর বাড়িগুলির মধ্যে একটি, একথা সবাই স্বীকার করে।

বাড়ির জন্তে শেষ পর্যন্ত একটি ভাল নামও পাওয়া গিয়েছে—'মধু নিলয়'। এই নামকরণ নিয়ে মা, বোন, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে সকলের সঙ্গে আলোচনা আর তর্ক হয়েছে অমিয়ভূষণের। মাসের পর মাস গেছে, সে তর্কের আর মীমাংসা হয় নি। অমিয়ভূষণের বাবার নাম ছিল মধুসূদন। আর মার নাম শতদলবাসিনী। অমিয়ভূষণের ইচ্ছা এই দুটি নামের দুটি শব্দ নিয়ে নাম রাখেন বাড়ির। মধু-শতদল কি শতদল-মধু। শেষের নামটি পছন্দ হয়েছিল অমিয়ভূষণের। কিন্তু স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে কেউ পছন্দ করল না। তারা বলল, বড় সেকেলে, বড় সাবেকী। অমিয়ভূষণ নিজের বাপ-মার নামে কিছু করতে চান, স্কুল করুন, লাইব্রেরি করুন, হাসপাতালে বেড করে দিন। টাকা থাকলে সৎকাজের অভাব নাকি পৃথিবীতে। কিন্তু ও ধরনের লম্বা নাম বাড়ির চলবে না। অমিয়ভূষণ শেষপর্যন্ত হার মেনেছেন। কিন্তু তাই বলে স্ত্রী আর মেয়ের দেওয়া নামগুলিও নেন নি। নীড়, স্বপ্ননীড়, শুকতারা, কেতকী—এমনি আরো কত কি। চলন্তিকা আর সঞ্চয়িতা খুলে বসেছিল

ওরা। অনেক বাদ-বিসংবাদের পর অনেক চিন্তা ভাবনার পর জীবিতা মা'র নামটি বাদ দিয়েছেন অমিয়ভূষণ, কিন্তু পরলোকের বাপকে বাদ দেন নি। অবশ্য নিজের নাম বাদ পড়ায় শতদলবাসিনীও মনে মনে খুব ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। নিজের দীর্ঘ নামের অসুবিধার কথাটা তিনিও বোঝেন। কৈফিয়তের সুরে নাতিনাতনী আর পুত্রবধূর কাছে বলেছেন, 'আমাদের আমলে তো ওইরকমই ছিল। আমার ঠাকুরদা রেখেছিলেন ওই নাম। আমার দিদির নাম রেখেছিলেন শরদিন্দুনিভাননা, আর আমার নাম দিয়েছিলেন শতদলবাসিনী। বাবা আদর করে ডাকতেন সতী-মা বলে। তোমরা আমার ওই ছোট নামটিও নিতে পার। ছোট নামই ভালো।'

লজ্জিত ভঙ্গিতে অবশিষ্ট গুটিকয়েক দাঁত মেলে হেসেছিলেন শতদল-বাসিনী।

কিন্তু তাঁর এই আবেদন গ্রাহ্য হয় নি। অমিয়ভূষণ বলেছিলেন, 'তুমি ভেব না মা। আমি তোমার নামে অন্য কিছু একটা করব। তুমি বেঁচে থাকতে থাকতেই করব।'

শতদলবাসিনী জবাব দিয়েছিলেন, 'তোমার কিছু করতে হবে না বাবা। আমার নামে কিছু করতে হবে না। মায়ের নাম ছেলেকে মুখে আনতে নেই। মনের মধ্যে রাখতে হয়। তুমিই আমার বাড়ি, তুমিই আমার মন্দিরের চূড়া, তুমিই আমার সব। এখন তোমার সামনে আমি চোখ বুজতে পারি, এই আমার একমাত্র বাসনা। আমার আর কোনো সাধ নেই।'

নটবর এল পুরুতঠাকুরকে নিয়ে। সেই সঙ্গে বাজারও করে এসেছে। পুরোহিত মাখনলাল চক্রবর্তীর বাড়িও পূর্ববঙ্গে। অমিয়ভূষণের একই জেলার মানুষ। এই কলোনির দক্ষিণে রাস্তার ওপারে নেতাজীনগরে থাকে। খুঁজে-পেতে তাকে যেন কি করে বার করেছেন অমিয়ভূষণ।

মাখনলাল এসে বললে, 'তাড়াতাড়ি করুন, তাড়াতাড়ি করুন। শুভ কাজটা সময় মতো আগে শেষ করে নিন। আর সব পরে হবে।'

শতদলবাসিনী বললেন, 'আপনি আগে নারায়ণকে তুলসী দিয়ে নিন, ঠাকুরমশাই। আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

বাড়িতে ছোট বড় চারখানা ঘর। সামনে বারান্দা। কোণের দিকের একখানা ঘরে পুজোর আয়োজন করে দিলেন শতদলবাসিনী। সময় বুঝে মাখনলাল সংক্ষেপে পুজো সেরে দিল। বলল, 'চৌরি এসে পরে রাঁধব। আগে বাড়ির কর্তা গিন্নী গৃহপ্রদক্ষিণ করে প্রবেশ করুন বাড়িতে। ভালো সময় চলে যাচ্ছে।'

ওষুধ খাওয়ার পর কল্যাণীর ব্যথা অনেকটা কমেছে। কিন্তু দুর্বলতা যায় নি। তিনি ননদকে বললেন, 'আমি উঠতে পারব না। ওসব তোমরা কর।'

কিন্তু কেউ সে কথা শুনল না। স্বামী, ছেলেমেয়ে, শাশুড়ী, ননদ সবাই এসে তাঁকে ঘিরে ধরল, 'তুমি না গেলে চলবে না, তুমি হলে ঘরের লক্ষ্মী।'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'তাহলে সব বন্ধ করে দিই। দরকার নেই কিছুর।'

কল্যাণী বললেন, 'এ তো আচ্ছা জ্বালায় পড়লাম। অসুখ হলেও তোমরা রেহাই দেবে না? না কি আমার অসুখ-বিসুখ কিছু হতে নেই? আমি সব মিথ্যে বানিয়ে বলছি। ডাক্তার কি তাই বলে গেল নাকি?'

কমলাক্ষ বলল, 'না না, তা কেন বলবে। ডাক্তারের ঘাড়ে কটা মাথা। তুমি একটু গিয়ে বাইরে দাঁড়ালে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না মা। যদি না যাও আমি তোমাকে পাঁজা কোলে করে নিয়ে যাব। ওঠো, চল।'

ছেলে এসে হাত ধরে তাঁকে সত্যই টেনে তুলল। আটপৌরে শাড়ি ছেড়ে লালপেড়ে গরদের শাড়ি পরলেন কল্যাণী। কপালে বড় করে সিঁদুরের ফোঁটা দিলেন। বাইরে এসে শাশুড়ীকে প্রণাম করলেন। শতদলবাসিনী বললেন, 'আগে নারায়ণকে আর পুরুতঠাকুরকে প্রণাম কর বউমা।'

এবার গৃহপ্রদক্ষিণ শুরু হল। স্বামীর সঙ্গে সাত পাক ঘুরতে হবে বাড়ির

চারদিকে। যদি অতটা শরীরে না সয় অন্তত পাঁচ পাক। কাছে দাঁড়িয়ে আচারগুলি বলে বলে দিলেন শতদলবাসিনী। নতুন কাপড় পরে জলভরা একটি মাটির কলস কাঁধে নিতে হল অমিয়ভূষণকে। কল্যাণী নিলেন কাঁখে বরণডালা আর হাতে মাছের খালুই। কমল আর এনাক্ষী দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিল। শতদলবাসিনী বললেন, 'তোরাও ওদের সঙ্গে ঘোর। করুণা, তুইও ঘুরতে থাক ওদের সঙ্গে। সবাইকে ঘুরতে হয়, তাই নিয়ম।'

করুণা হেসে বলল, 'বউদি, তুমি একটু বেশি করে ঘোরো। তোমাদের আগেকার পাকটা তেমন কষে বসে নি।'

শতদলবাসিনী বলতে লাগলেন, 'জোকার দে তোরা, হুলুধ্বনি দে। ওলো ও পুনটুরি।'

কিন্তু এনাক্ষী উলু দিতে জানে না, করুণাও না। তাই বলে অনুষ্ঠান কি বাদ যাবে? একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে শতদলবাসিনীই হুলুধ্বনি দিতে শুরু করলেন। এক ঝাঁক, দুই ঝাঁক, তিন ঝাঁক। তাঁর ছেলেমেয়ে, বউ নাতি-নাতনী বাড়ি প্রদক্ষিণ করে এল। একবার, দুইবার, তিনবার। আরো ঘুরুক, আরো ঘুরুক।

তারা যতবার ঘোরে শতদলবাসিনী ততবার হুলুধ্বনি দেন। দিতে দিতে এই আনন্দের দিনে তাঁর দুটি চোখ হঠাৎ জলে ভরে উঠল। কিন্তু সে জল তিনি আঁচল দিয়ে মুছলেন না।

নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত ছেলে বুড়ো আর কলোনির নানা বয়সী মেয়েরা এসে উঠান ভরে ফেলতে লাগল।

সাত পাক ঘুরে অমিয়ভূষণ সপরিবারে বাড়ির বড় ঘরখানায় প্রবেশ করলেন।

২

গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠান সকালে শেষ হল। কিন্তু এ তো শেষ নয় শুরু। কাজ অনেক বাকি। পুব দিকের ঘরখানিতে মাখন চক্রবর্তী নারায়ণ পূজো করল, যজ্ঞ করল, চৌরি বেঁধে দিল ঠাকুরকে। নারায়ণের ভোগ তো অল্পেই হয়ে গেল। এবার নরদেবতাদের ভোগ বাকি। সে ভোগ তো অত সহজে হয় না। সে এক মহাযজ্ঞের ব্যাপার। শতদলবাসিনী বলেন, এই যজ্ঞের জন্যেই তো সব। মানুষের এত ছুটোছুটি, এত ওঠা-নামা, এত ভোগভোগান্তি। কোথায় লাগে এর কাছে অশ্বমেধ আর রাজসূয়। জঠর যজ্ঞে মানুষকে যদি রোজ আহুতি দিতে না হত তাহলে তার সংসারের চেহারা ও সমাজের চেহারা যে কি রকম হত তা ভাবা যায় না।

এনাক্ষী হেসে বলে, 'কেন ভাবা যাবে না ঠাকুরমা, মানুষ তখন এক সন্ধ্যা জপ না করে দিনরাত তোমার মতো মালা টপটপ করত, আর নামকীর্তন শুনত।'

শতদলবাসিনী বলেন, 'তুই হাসিস আর যাই করিস পুনটুরি তা যদি হত মানুষের সুখের সীমা থাকত না। এই পোড়া পেটে দুটি দানা দেওয়ার জন্যে কি কম হানাহানি মানুষে মানুষে? কম খাওয়া-খাওয়ি চলে?'

এনাক্ষী বলে, 'শুধু খাওয়া-খাওয়িটাই বা দেখছ কেন ঠাকুরমা, খাওয়া আর খাওয়ানোও তো আছে। সেইটেই বড়। না হলে নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করে মানুষ এতদিন লোপ পেয়ে যেত।'

তর্কে নাতনীর সঙ্গে পেরে ওঠেন না শতদলবাসিনী। ওর সব কথা বোঝেনও না। এম. এ. পাশ করেছে। শতদলবাসিনী বলেছিলেন, 'মেয়েকে অত পড়িয়ে কি হবে অমিয়। ভালো ছেলে-টেলে দেখে ওর বিয়ে দিয়ে দে। মেয়েদের বেশি পড়াশুনো করতে দিলে কি হয়, তা তো বোনকে দিয়েই দেখলি।'

কিন্তু অমিয় শোনে নি সে কথা। 'এ দেশের উল্টো বিধি, মেয়ের নাম রামনিধি।' পুনটুরিকে এম. এ. পাশ করিয়েছে অমিয়, কিন্তু ছেলেটিকে অতদূর পড়ায় নি। কোনো রকমে বি. এ. পাশ করবার পর, কমলাক্ষ নিজেই পড়া ছেড়ে দিয়েছে। বাপ হয়ে যে কড়া ধমক-টমক দেবে তা দেয় নি অমিয়। পড়তে চাও না! না পড়লে। এত নরম হলে কি ছেলেকে মানুষ করা যায়? মাঝে মাঝে চোখও গরম করতে হয় একটু-আধটু। তা করে নি অমিয়। তার ফলে ওর ছেলে লেখাপড়া না শিখে সেতার বাজিয়ে বেড়াচ্ছে। নামমাত্র চাকরি করে ইনসিওরেন্স কোম্পানির অফিসে। বাকি সময়টা সেতার ঠুং ঠুং করে। ভদ্রলোকের ছেলে, এ কি কাণ্ড! ও কি যাত্রার দলে চাকরি করবে যে সেতার বেহালা হাতে নিয়েছে? এ ছেলের যে কি গতি হবে ভেবে পান না শতদলবাসিনী। কিন্তু যারা ভাববার তারা যদি না ভাবে তিনি ভেবে কি করবেন? সবই বোঝেন তবু তো মন বোঝে না।

গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে শুধু আচার-অনুষ্ঠানই নয়, কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবকেও নিমন্ত্রণ করেছেন অমিয়ভূষণ। তারা সবাই দুপুর বেলায় খাবে। তা, হবে না হবে না করেও, অনেক বাদ-সাদ দিয়েও ছেলেবুড়ো শ-খানেক লোক তো খাবেই। কলোনিরও কয়েকজনকে বলেছেন অমিয়ভূষণ। বাড়ির সকলেই নিষেধ করেছিলেন। কাজ নেই অত হাঙ্গামায়। আজকাল এসব কেউ করে না। এ তো আর দেশ-গাঁ নয় যে সেই সব রীতিনীতি মেনে চলতে হবে। শুধু খরচের ভয়ই না, করে-কর্মায় কে, কে খাটে-পেটে। অমিয়ভূষণ তো নিমন্ত্রণ করেই খালাস। নিজে এক গেলাস জলও কাউকে ভরে দিতে পারবেন না। সব করতে হয় কল্যাণী করুণা আর কমল এনাক্ষীকে। কিন্তু এ ব্যাপারে ছেলেমেয়ে দুটিও যে খুব কাজের তা নয়। তারা কি এসব শিখেছে, কি করেছে যে আজ করবে! কিন্তু বাড়ি করার মত এ ব্যাপারেও অমিয়ভূষণ কারো নিষেধ শোনেন নি। তিনি বলেছেন, 'আত্মীয়-

স্বজনের পাতে যদি ছুটো ভাতই না দিতে পারলাম, তাহলে আর বাড়িঘর করে কি সুখ হল ?'

এনাক্ষী হেসে বলল, 'বুঝলে দাদা, এটা হল বাবার পাবলিসিটি। তিনি বাড়ি করেছেন, সবাই এসে তা দেখে যাক।'

কমলাক্ষ বলল, 'এর চেয়ে আড়াই টাকা খরচ করে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিলেই হত। শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু অমিয়ভূষণ সেনগুপ্ত মহাশয় কীর্তিপুরে একখানি একতলা প্রাসাদ তুলে পৃথিবীতে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছেন।'

এনাক্ষী বলল, 'তাহলে তো আর তাঁদের চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হত না।'

কমলাক্ষ বলল, 'শুধু কি চক্ষুকর্ণ ? রসনাটাকেই বা বাদ দিচ্ছিস কেন ? জেনো বাসনার সেরা বাসা রসনায়।'

কিন্তু মুখে নিজেদের মধ্যে যত ঠাট্টা তামাশাই করুক, অমিয়ভূষণের এই সেকেলে কীর্তিকলাপে যে যত অসন্তুষ্টই হোক, প্রত্যেকেই এসে কাজকর্মে হাত দিল। শতদলবাসিনী করুণাকে নিয়ে তরকারি কুটতে বসলেন। লোক খাওয়ানোর ব্যাপারে তাঁরই উৎসাহ বেশি। এই উপলক্ষে আত্মীয়স্বজন আসুক, দেখাসাক্ষাৎ হোক। তাঁর ইচ্ছা যে ছেলে মেনে চলেছে, সে যে বউ আর ছেলেমেয়ের কথামত হাত গুটিয়ে বসে থাকে নি এতে সব চেয়ে খুশি হয়েছেন শতদলবাসিনী। অবশ্য খরচের কথাটাও যে তিনি না ভাবছেন তা নয়। খরচ করতে হচ্ছে বই কি। খুবই খরচ করতে হচ্ছে অমিয়কে। সবই তো তার নিজের ঘাড়ে। করুণা অবশ্য নিজের মাইনে থেকে প্রায় শ-খানেক টাকা করে দেয় আজকাল। কিন্তু অমিয় বোনের টাকা যে সংসারী-খরচে পারতপক্ষে ভাঙে না তা শতদলবাসিনী ভালো করেই জানেন। বোনের নামে মোটা টাকার বীমা করেছে অমিয়, এই টাকায় তার প্রিমিয়াম দেয়। কিছু হয়তো ব্যাঙ্কে রাখে। এই নিয়ে ভাই-বোনের মধ্যে মস্ত বিবাদ। করুণা বলে, 'দাদা, তোমার সংসার কি আমার সংসারও নয় যে আলাদা করে রাখছ ?'

অমিয় বলে, 'সেজন্যে নয়। আমার টাকা তো কিছুই বাঁচে না, তোর

৩

কল্যাণীর বাবা শিবতোষ মজুমদারের বয়স সত্তরের কাছাকাছি। দীর্ঘ চেহারা। বয়সের ভারে সামনের দিকে একটু নুয়ে পড়েছেন। মাথার পাকা চুল ছোট করে ছাঁটা, বাঁধানো দাঁত। স্মল-কজ কোর্টের পুরানো উকিল। এখনো প্র্যাকটিস ছাড়েন নি। শ্যামবাজারে ভাড়াটে বাসায় বহুকাল বাস করবার পর বছর দশেক হল বেলগাছিয়ায় দোতলা বাড়ি করেছেন। বড় মেয়ে বাণী আছে গৌহাটিতে। জামাই প্রভাকরের সেখানে কাঠের ব্যবসা। বাড়ি গাড়ি ধনসম্পত্তিতে বাপের চেয়ে বাণী অনেক বড়লোক। ছেলেমেয়েও দুটি। বড় সংসারের বড় গৃহিণী। সেখান থেকে তার নড়বার-চড়বার উপায় নেই। যখন আসে অল্পদিনের জন্যে আসে। আবার দিনকয়েক বাদে প্লেনে করে পাখির মতোই উড়ে চলে যায়। তার আসা-যাওয়ার কথা কলকাতার অনেক আত্মীয়-স্বজনেই টের পায় না। তাই ছোট জামাই-মেয়েকে কাছাকাছি রাখতে চেয়েছিলেন শিবতোষ। তাঁর স্ত্রী সুনয়নীরও তাই একান্ত ইচ্ছা ছিল। বেলগাছিয়াতেই তিনি জামাইয়ের জন্যে প্রথমে জমি দেখছিলেন। কিন্তু অমিয়ভূষণ কিছুতেই শ্বশুরবাড়ির কাছে বাড়ি করতে রাজী নন। শ্বশুরের কোনো সাহায্যই তিনি চান না। উপদেশ পরামর্শ তো নয়ই। অমিয়ভূষণ আগে কল্যাণীকে বলেছেন, 'তোমার বাবাকে বোলো, তাঁর পরামর্শ নেওয়ার জন্যে শাঁসালো মক্কেলের অভাব নেই। বহু টাকায় তা বিক্রি হবে। আমার মতো গরিব মাস্টারকে কেন তিনি অত মূল্যবান জিনিস বিনা পয়সায় বিলবেন।'

কল্যাণী জবাব দিয়েছেন, 'তাঁর মেয়েটিকে তো গরিব মাস্টার অসঙ্কোচে হাত পেতে নিতে পেরেছেন। তাতে তো তাঁর কোনো আপত্তি হয় নি? উকিলের পরামর্শের চেয়ে তাঁর মেয়ের দাম অনেক কম, সেইজন্যেই বুঝি?'

ছোট জামাই যে তাঁকে বেশি পছন্দ করে না একথা বুঝতে বাকি নেই শিবতোষের। প্রথম প্রথম তিনি এতে কৌতুক বোধ করতেন। কিন্তু বয়স

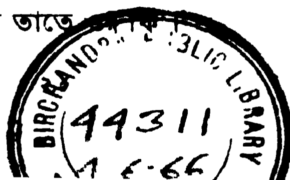
বাড়বার পরে অমিয়র ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে যাওয়ার পরেও যখন তার স্বভাব বদলাল না, তখন আর কৌতুকপ্রিয়তা রাখতে পারেন নি শিবতোষ। জামাইয়ের ওপর বিরক্তি এমন কি বিদ্বেষ এসেছে মনে। কখনো কখনো এও ভেবেছেন, কোনো সম্পর্ক রাখবেন না অমিয়ভূষণের সঙ্গে। নেহাতই ছোট মেয়ে কল্যাণীর মুখের দিকে চেয়ে অতখানি কঠোর হতে পারেন নি শিবতোষ। মেয়ে আর নাতি-নাতনীর ডাকে সাড়া দিয়েছেন। তাও কি প্রাণ ধরে জামাই তার ছেলেমেয়েকে শিবতোষদের কাছে দু-চারদিন বেশী থাকতে দিয়েছে? নিজের পুত্রসন্তান নেই। তাই ভেবেছিলেন, কমলাক্ষকে এনে নিজের কাছে রাখবেন, ল পড়াবেন। জুনিয়র করে নেবেন নিজের। তারপর মক্কেলপত্র সব দিয়ে যাবেন দৌহিত্রকে। কিন্তু গোঁয়ার জামাই তার কোনো আশা পূর্ণ করতে দেয় নি। যেমন দেয় নি, তার ফলও পেয়েছে। অডিনারি গ্র্যাজুয়েট হয়ে রয়েছে কমলাক্ষ। আজকালকার দিনে ওইটুকু বিদ্যা নিয়ে করে খাওয়া মুশকিল আছে। আরো যদি পাঁচ-দশ বছর আয়ু বেশি পান শিবতোষ, নিজের চোখেই দেখে যেতে পারবেন, ছেলে তার বাপকে কত বড় রাজা করে তুলেছে।

জামাইয়ের সঙ্গে যে মেয়ের মোটেই বনিবনাও নেই তাও শিবতোষ ভালো করেই জানেন। এর আগে অনেকবার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে কল্যাণী তাঁর কাছে চলে এসেছে। তখন ওর ছেলেমেয়ে দুটির বয়স কম ছিল। কোনোবার তাদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, কোনো-কোনোবার শাশুড়ীর কাছে তাদের ফেলেও গেছে।

শিবতোষ একেকদিন বলেছেন, 'এত যখন কষ্ট দেয়, তোর আর ফিরে গিয়ে কাজ নেই কল্যাণী। তুই আমার কাছেই থাক।'

কল্যাণী বলেছেন, 'তাই থাকব বাবা।'

সুনয়নী স্বামীকে ধমক দিয়েছেন, 'বালাই, ও আবার কথার কি ছিরি তোমার। ঝগড়া বিবাদ হোক, ক্ষুদ খাক, কুঁড়ো খাক, স্বামীর ঘরই মেয়েদের আপন ঘর। তুমি বড়লোক আছ তাতে



ছদিন বাদে অবশ্য কল্যাণী নিজেই ফিরে গেছেন, না হয় অমিয়ভূষণই ফিরিয়ে নিতে এসেছেন। বয়স বেড়ে যাওয়ায়, ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে ওঠায় কল্যাণী এখন আর অবশ্য অত ছুটোছুটি করেন না। কিন্তু ঝগড়াঝাঁটি যে ওদের মধ্যে প্রায় নিত্যই চলে সে খবর শিবতোষ রাখেন।

গাড়ি একেবারে অমিয়ভূষণের উঠানের ওপর এসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নাতিনাতনী এসে ঘিরে দাঁড়াল, শিবতোষের খবর পেয়ে ঝি সুরধুনীকে রান্নাটা দেখতে বলে কল্যাণী এসে বাপের গাড়ির কাছে দাঁড়ালেন। তার আগেই শিবতোষ আর সুনয়নী নেমে এসেছেন। ষাটের ওপরে বয়স হয়েছে সুনয়নীর। তবে মাথার চুল এখনও তেমন পাকে নি। দাঁতগুলিও নিজেরই আছে, নকল গড়াতে হয় নি। রোগা ছোটখাটো পাতলা চেহারা। পিছন থেকে কল্যাণীকেই বরং তাঁর মা বলে মনে হয়।

শিবতোষ ড্রাইভারকে বললেন, 'শৈলেন, মাছটা ভিতরে দিয়ে এসো।' তারপর মেয়ের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'জানিস খুকি, তোর বাড়িতে আজ কাজ আছে শুনে আমার মক্কেল কৈলাস বিশ্বাস এই মাছ পাঠিয়ে দিয়েছে। এ তার নিজের ফিশারির মাছ। এই মাছ আনতেই তো এত দেরি হয়ে গেল।

কল্যাণী ছোট মেয়ের মতোই অভিমানে মুখ ভার করে ঠোঁট ফুলিয়ে বললেন, 'দরকার নেই তোমার মাছ দিয়ে। তোমরা বুঝি ছু-ঘণ্টা আগে আসতে পারতে না বাবা? একদিন আগে এসে আমাদের বাড়িতে থাকলে তোমার জাত যেত?

শিবতোষ সস্নেহে মেয়ের পিঠে হাত রেখে হেসে বললেন, 'আমার রণচণ্ডী মায়ের কথা শোন। ও খুকি, এখন যে আমার বাড়ি আমার বাড়ি করছিস বড়। তবে নাকি এ বাড়ি তোর নয়? সব সেই গোঁয়ার-গোবিন্দের? মেয়ের যখন বিয়ে-থা দিবি, তখন একদিন কেন এক মাস আগে থেকে তোর বাড়িতে এসে থাকব অবশ্য যদি আমার জামাইটি থাকতে দেন।'

বলে ঝকঝকে বাঁধানো দাঁত বের করে হাসতে লাগলেন শিবতোষ।

কল্যাণী বললেন, 'হুঁ'। তখনও তোমার কত সময় থাকবে তা আমার জানা আছে। তখনও মক্কেলদের ভিড়ে তোমার নিঃশ্বাস ফেলবার জো থাকবে না।'

একটু দূরে কমল আর এনাক্ষী দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল চেয়ে চেয়ে। দেখছিল একটি কিশোরী মেয়ের ভূমিকায় তাদের প্রৌঢ়া স্থূলাঙ্গী মাকে। দেখতে দেখতে কমলের মনে হচ্ছিল মানুষ বুঝি কোনদিন পুরোপুরি বুড়ো হয় না, বুড়ো হতে চায় না। বাবা যখন ছেলে সেজে তাঁর মার কাছে গিয়ে দাঁড়ান তখনও ঠিক এই কথাই মনে হয় কমলের। মানুষ তার শৈশবকে কৈশোরকে পথের ধারে ফেলে আসে না, নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে আসে না, নিজের সঙ্গেই গোপনে বয়ে নিয়ে আসে। তারপব সময়মতো সুযোগমতো ফের সেই শিশুর মুখোশ নিজে পরে বসে। কোনটা যে মুখ কোনটা যে মুখোশ বেছে বের করা শক্ত হয়ে ওঠে। মানুষ শিশুপুত্রের মধ্যে নিজেকে পায়, শিশু পৌত্রের মধ্যে নিজেকে দেখে, পাকা দাড়িগোঁফেব পরচুলা অনুক্ষণ সে বয়ে বেড়াতে পারে না।

বেয়াই বেয়ানের আসার খবর পেয়ে শতদলবাসিনী বাইরে এসে দাঁড়ালেন। সুনয়নীর হাত ধরে বললেন, 'আসুন বেয়ান ঘরে আসুন।' তারপর কল্যাণীর দিকে ফিরে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'কেবল বাপের সঙ্গেই কথা বলছ বউমা, আর মা-টি বুঝি সৎমা? তার বুঝি খোঁজ-খবর নিতে নেই?' এই সুযোগে একটু খোঁটা দিতেও ছাড়লেন না সুনয়নীকে। ফোকলা মুখে হেসে বললেন, 'দেখে-শুনে আমার কিন্তু তাই মাঝে মাঝে মনে হয় বেয়ান। আমার বউমাটি তার সৎমা কি মাসিমার কাছে বড় হয়েছে, নিজের মায়ের আদরে শাসনে মানুষ হয় নি।'

সুনয়নীও ছাড়বার পাত্রী নন। তিনিও হেসে জবাব দিলেন, 'সৎমাই হই আর মাসিমাই হই, মেয়েকে তার আসল মায়ের হাতে অনেককাল আগেই তুলে দিয়েছি বেয়ান। এখন যশ অপযশ সব আপনার। আমার কিছুই না।'

শতদলবাসিনী হার স্বীকার করে বললেন, 'পাকা উকিলের পাকা গিন্নী! কথায় পেরে উঠব কেন।'

বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাগতদের ভিড় বাড়তে লাগল। কলকাতা থেকে অমিয়ভূষণের কয়েকজন সহকর্মী বন্ধু এলেন। একই কলেজের অধ্যাপক। ইংরেজীর সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসের হিরণ্ময় গুপ্ত, বাংলার দেবব্রত স্থর, কেমিস্ট্রির বিভূপদ সামন্ত। আরও কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন অমিয়ভূষণ। তাঁরা আসেন নি কি আসতে পারেন নি। প্রকাশক টি পি চক্রবর্তী অ্যাণ্ড সন্সের মেজো কর্তা স্থধাময় চক্রবর্তী নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলেন।

জায়গা দেখে, বাড়ি দেখে মনে মনে যে যা ভাবুন, মুখে প্রায় সকলেই উৎসাহ দিলেন অমিয়ভূষণকে। সদানন্দ বললেন, 'বেশ করেছ অমিয়। আমার প্রাণটাও এই চাইছিল অমিয়। শহর থেকে দূরে পালিয়ে আসি, পারলাম না। কিছুতেই গিন্নীকে বুঝিয়ে উঠতে পারলাম না। শহরটা হাটবাজার, ব্যবসা-বাণিজ্যের জায়গা। বসবাসের জায়গা নয়।'

দেবব্রত বললেন, 'তা তোমার ঢাকুরিয়াও তো আধা-শহর আধা-গ্রাম। তাকেও তুমি হ্যারিসন রোড কি ক্লাইভ স্ট্রীট বলতে পার না। তোমাকে উত্তরে আসতে না দিয়ে দক্ষিণে টেনে রেখে মিসেস ব্যানার্জি ভালোই করেছেন। শহরের বাইরে থাকতে চাও ভালো কথা; কিন্তু এদিকটায় এলে কেন অমিয়। এদিকটা develop করতে বহু সময় লাগবে। দক্ষিণের মলয় বায়ু ছেড়ে তুমি উত্তরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় চলে এসেছ। তোমার পছন্দের তারিফ করতে পারলাম না।'

স্থরের এই বেস্থরো আলাপে বন্ধুরা অপ্রতিভ হলেন। বিভূপদ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আঃ কি বাজে বকছ দেবব্রত। এদিকে ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন-ট্রেন এসে গেলে এ অঞ্চলের যথেষ্ট উন্নতি হবে। কীর্তিপুরের কীর্তির কাছে সদানন্দের চাকুরিয়া ঢাকা পড়ে যাবে। দুদিন বাদে উত্তর-দক্ষিণে কোনো ভেদ থাকবে না।'

দেবব্রত মুচকি হেসে বললেন, 'যেমন পূর্ব-পশ্চিমের ভেদটা লোপ পেয়েছে।'

বারান্দায় দামী সতরঞ্জি বিছিয়ে বন্ধুদের বসতে দিয়েছিলেন অমিয়ভূষণ। বিভুপদ দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে ছিলেন। দেবব্রতের পরিহাসের সুরে এবার সোজা হয়ে উঠে বসলেন। বললেন, 'পুরোপুরি না পেলেও পাচ্ছে। আলবত পাচ্ছে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, দেশগঠন যে-কোনো বিষয় ধর, সব ব্যাপারেই আমরা পশ্চিমমুখো, পশ্চিমের মুখাপেক্ষী এ কথা তুমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পার না দেবব্রত।'

হিরণ্ময় এঁদের সমবয়সী ও সহকর্মী, অতটা অন্তরঙ্গ নন। কারণ আলাপ অল্পদিনের। তিনি হেসে বললেন, 'আপনাদের সেই পুরনো তর্ক শুরু হল বুঝি? বাসে আসতে আসতে শুনছিলাম।'

সদানন্দ বললেন, 'হিরণ্ময়বাবু, এ শুধু ওদের বাসের তর্ক নয়, বাসী তর্ক। এর মীমাংসা বহুকাল আগেই হয়ে গেছে। আমরা পশ্চিমের মদ আমাদের দেশীয় মেটে হাঁড়িতে রাখব। তার ফলে একটু একটু তাড়ির গন্ধও পাব। তার ফলে তাকে স্বদেশী বলেও চালাতে কোনো অসুবিধে হবে না।'

দেবব্রত আবার তিড়বিড় করে উঠল, 'সদানন্দ, তুমি শুধু ইংরেজী ভাষার দাস হও নি, মনে মনে এখনও ইংরেজের দাস হয়ে আছ। তাই ভাবছ, আমরা সব দেউলিয়ার জাত। আমাদের নিজস্ব বলে কিছু নেই। আমরা সব পরের খেয়ে-পরে মানুষ হয়েছি। পরের অনুকরণে জাতে উঠেছি। এই তো তোমাদের বলবার কথা?'

সদানন্দ বললেন, 'যদি উঠেও থাকি তাতে লজ্জার কিছু নেই। শাস্ত্রে পরস্ত্রী সম্বন্ধে নিষেধ আছে, পরদ্রব্যকেও তুচ্ছ করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরের জ্ঞান বিজ্ঞান সভ্যতা সংস্কৃতি আত্মসাৎ করার বেলায় কোনো বাধা নেই। কারণ এসব পরদ্রব্য নয়, পরম দ্রব্য। এক্ষেত্রে অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।'

দেবব্রত বললেন, 'যতই বল, এর ফলে তোমার স্বাধীন চিন্তা লোপ পাচ্ছে,

স্বাধীন চেষ্টা লোপ পাচ্ছে। জাত হিসেবে তুমি কিছুতেই স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারছ না। কারণ তোমার আত্মাদর নেই, আত্মবিশ্বাস নেই। কিন্তু যে বললে মুখাপেক্ষী, ঠিক তাই। ওইটাই তার মুখের মোক্ষম কথা।'

নারী-পুরুষের সম্পর্কের মতো প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের সম্পর্ক নিয়ে এই পুরনো কিন্তু মুখরোচক তর্ক আরো কতক্ষণ চলত বলা যায় না। ট্রেতে করে চায়ের কাপ সাজিয়ে এনাক্ষী এল সেখানে। পিছনে পিছনে এলেন অমিয়ভূষণ। প্রত্যেক বন্ধুর সঙ্গে মেয়ের পরিচয় করিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'প্রণাম কর।'

এনাক্ষী মনে মনে হাসল। নির্দেশটি বাবা না দিলেও পারতেন। পিতৃবন্ধুদের যে পায়ের ধুলো নিয়েই প্রণাম করতে হয়, তা কি সে আর জানে না?

এনাক্ষীকে দেখে সবাই খুশী হয়ে উঠলেন। সদানন্দ বললেন, 'বাঃ বেশ মেয়ে, চমৎকার মেয়ে। অমিয়, মেয়ের আর এক নাম নন্দিনী, তা তোমার মেয়েকে দেখে ফের মনে পড়ল।'

লজ্জিত হয়ে চোখ নামাল এনাক্ষী। অমিয়ভূষণ স্মিতমুখে চুপ করে রইলেন।

সদানন্দ বললেন, 'তোমার দাদা কোথায় মা?'

এনাক্ষী মৃদু হেসে বলল, 'দাদা ওদিকে আছে।'

একটু বাদে এনাক্ষী চলে গেলে সদানন্দ বললেন, 'আমরা বুড়ো হয়ে গেছি অমিয়, সত্যিই বুড়ো হয়ে গেছি।'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'হঠাৎ তোমার এত খেদ যে।'

সদানন্দ বললেন, 'এর আগে আমি তোমার বাড়িতে এলে তোমার স্ত্রী এসে চা পান দিয়ে আপ্যায়ন করতেন, এখন আসে তোমার মেয়ে। আমার বাড়িতে গেলেও তাই দেখবে। আমার স্ত্রীর বদলে মেয়ে এসেই তোমার খোঁজ নিচ্ছে। আমরা সব জ্যাঠাবাবু কাকাবাবুর দলে ভরতি হয়ে গেছি। হিরণ্ময়বাবু, অমিয়র মেয়েটিকে দেখলেন?'

হিরণ্ময় চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে লজ্জিতভাবে বললেন, 'দেখলাম বইকি। বেশ সুন্দরী মেয়ে।'

সদানন্দ বললেন, 'শুধু সুন্দরী নয়, সুশিক্ষিতা। এম-এ-তে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছে বাংলায়।'

অমিয়ভূষণ প্রতিবাদ করে বললেন, 'না না, অত ভালো করতে পারে নি সদানন্দ। হাই সেকেণ্ড ক্লাশ পেয়েছে।'

সদানন্দ বললেন, 'আরে ওই হল। হয়তো দু-চার নম্বরের জন্যেই ফসকে গেছে বেচারার ফার্স্ট ক্লাসটা। এগজামিনার নিশ্চয়ই স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে খাতা দেখতে বসেছিলেন। তাই নম্বরের বেলায় কার্পণ্য করেছেন। নইলে নিশ্চয়ই ও ফার্স্ট ক্লাশ পেত। তুমি আমি সবাই তো ভুক্তভোগী অমিয়। জীবনের প্রায় সব ব্যাপারেই আজকাল গৃহিণী আমাদের ব্যারিস্টার। একথা লুকোতে চাইলেই কি আর লুকোতে পারবে?'

অমিয় হাসিমুখে চুপ করে রইলেন। কোনো মন্তব্য করলেন না। সদানন্দ আবার হিরণ্ময়ের দিকে তাকালেন, 'আচ্ছা হিরণ্ময়বাবু।'

'বলুন।'

'আপনার ছেলে জ্যোতিশঙ্করও তো বেশ ভালো ছেলে। ও তো ডি-ভি-সি-তে ভালো চাকরি করে। কি পোস্টে আছে যেন।'

'সয়েল কেমিস্ট।'

'গতবার আমেরিকা ঘুরে এসেছে। তাই না?'

'আজ্ঞে হাঁ।'

সদানন্দ বললেন, 'তাহলে আমাদের অমিয়র মেয়ের সঙ্গে লাগিয়ে দিন না। চমৎকার মানাবে। বন্ধুতা একেবারে কুটুম্বিতায় এসে চুম্বকের মতো আটকে থাকবে। চমৎকার হবে। আমরা দল বেঁধে ফের আসব এখানে। কি বল হে অমিয়?'

অমিয়ভূষণ মৃদু হাসলেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, ওসব পরে হবে। তোমাকে আর এক কাপ চা দেবে কিনা তাই বল।' কৃতী ছেলের বাপ হিরণ্ময় চায়ের

কাপ সরিয়ে রেখে স্মিতমুখে সিগারেট ধরালেন। হঠাৎ কোনো মন্তব্য করে বসবার মতো কাঁচা মানুষ তিনি নন। তাঁর মাথার চুল এখনো সকলের চেয়ে বেশি পাকা।

কলোনির নিমন্ত্রিত প্রতিবেশীরা আসতে শুরু করলেন এবার। এলেন রিটায়ার্ড সাব-জজ সুধামাধব সান্যাল, ইঞ্জিনীয়ার কুমুদকান্তি করগুপ্ত। ইন্-সিওরেন্স কোম্পানির সুপারভাইজার বীরেশ্বর পোদ্দার এসে উপস্থিত হলেন। এই কয়েকদিনে এঁদের সঙ্গেই মোটামুটি বেশি আলাপ হয়েছে অমিয়ভূষণের। অল্প আলাপীও দু-চারজনকে বলেছেন। তাঁরাও আসতে লাগলেন। তবে সবাই বিবেচক। সপরিবারে নিমন্ত্রিত হলেও কেউ ছেলেপুলে নিয়ে আসেন নি, একাই এসেছেন।

ব্যতিক্রম দেখা গেল শুধু একজনের বেলায়। একটু বাদে আর একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক এলেন অমিয়ভূষণের বাড়িতে। তাঁর সঙ্গে ছোট বড় চারটি ছেলেমেয়ে. তিনি ছেলেমেয়ে নিয়ে অন্দরমহলের দিকে চলে গেলেন। কিন্তু ভদ্রলোকটি ভিড় দেখে একটু যেন আড়ষ্ট আর কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। ভিতরেই যাবেন না বাইরে বসবেন যেন ঠিক করে উঠতে পারলেন না। সঙ্কোচ দেখে অমিয়ভূষণ এগিয়ে গিয়ে তার ঘরে সকলের মাঝখানে এনে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'নীলকান্ত রায়। আমার অনেককালের পুরনো বন্ধু। হারিয়ে গিয়েছিল। এই কীর্তিপুরে এসে ফের খুঁজে পেয়েছি। বলতে গেলে নীলুদার জন্যেই এখানে আসা হয়েছে আমার। এখন শুধু নাম করলে কি চেহারা দেখলে তোমরা একে চিনতে পারবে না। কিন্তু পরিচয় দিলে নিশ্চয়ই চিনবে।'

সকলের দিকে একবার তাকালেন অমিয়ভূষণ।

অধ্যাপক, সাবজজ, ইঞ্জিনীয়ারের দল উৎসুক হয়ে রইলেন।

অমিয়ভূষণ বললেন, 'নীলকান্ত রায়। তখনকার দিনের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক নীলকান্ত রায়। ওঁর সেই মালতীমালা, যৌবনস্বপ্ন পড়েছ নিশ্চয়ই।'

শ্রোতারা হঠাৎ কি বলবেন ভেবে পেলেন না।

কিন্তু সদানন্দ তাঁদের মুখপাত্র হয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই পড়েছি। অবশ্য পড়েছি। যৌবনে আমি আপনার দারুণ ভক্ত ছিলাম নীলকান্তবাবু। আপনি এই কলোনির মধ্যেই থাকেন নাকি ?'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'না, ঠিক এ কলোনিতে নয়। এর বাইরে আর একটি কলোনি আছে। সেই কলোনিতে। আমার ইচ্ছা এই কীর্তিপুরে নীলুদাকে নিয়ে আসব।'

সকলে বললেন, 'তাহলে তো ভালোই হয়।'

৪

বন্ধুদের সঙ্গে অমিয়ভূষণ বেশিক্ষণ গল্প করবার সময় পেলেন না। ভিতর থেকে ডাক এল। রান্না হয়ে গেছে। দূর থেকে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের এবার বসিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

অমিয়ভূষণ ভিতরে যেতে শতদলবাসিনী আর কল্যাণী একসঙ্গে অনুযোগ দিতে শুরু করলেন। ছেলের দিকে তাকিয়ে তিরস্কারের স্বরে বললেন, 'আচ্ছা, তোর আক্কেলখানা কি। বসে বসে শুধু গল্প করছিস তো গল্পই করছিস। কাজের বাড়িতে অত গা ছেড়ে বসে থাকলে চলে?'

কল্যাণীও স্বামীকে খোঁটা দিতে ছাড়লেন না।

তিনি বললেন, 'এরপর যদি কোনো ত্রুটি হয়, তার জন্যে বাড়িসুদ্ধ লোককে দায়ী করবেন। হুঁশ নেই যে, এত কাজকর্ম রয়েছে।'

রান্নাঘরের সামনে নীলকান্তের স্ত্রী নির্মলা দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসছিলেন। অন্দরে এসে তার ঘোমটার দৈর্ঘ্য হ্রাস পেয়ে কপালের প্রান্তে উঠে গেছে। উজ্জ্বল সিঁদুরের ফোঁটাটি দেখা যাচ্ছে এবার। অবশ্য ফোঁটা যত উজ্জ্বল, মুখখানা তত উজ্জ্বল নয়। সে মুখে শুধু বয়সের ছাপই পড়ে নি, কঠিন জীবন-সংগ্রামেরও আঁচড় পড়েছে। ছিপছিপে দীর্ঘ চেহারা নির্মলার। বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। কপালের কাছে চুলগুলি একটু বেশিরকমই পেকে গেছে। পরনে চওড়া লালপেড়ে শাড়ি। হাতে শাঁখা আর চুড়ি, কানে কমদামী দুটি ফুল। গায়ে আর কোথাও কোনো আভরণ নেই। কিন্তু এই আড়ম্বরহীন বেশবাসের মধ্যেও বেশ একটু স্নিগ্ধ শ্রী ফুটে উঠেছে তাঁর চেহারায়।

নির্মলা কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আর বলবেন না দিদি। ওঁদের ওইরকমই ধরন। বেহুঁশ হয়ে থাকতে পারলে ওঁরা আর কিছু চান না।'

অমিয়ভূষণ হেসে বললেন, 'এ কি বউদি, আপনিও বেদলী! আপনিও বিপক্ষের হয়ে ওকালতি করতে শুরু করলেন?'

নির্মলা বললেন, 'যা সত্যি তাই বলছি।'

অমিয়ভূষণ প্রসঙ্গ পালটে বললেন, 'ছেলেমেয়েরা কোথায়? মালা আসে নি?'

নির্মলা বললেন, 'সে তো আপনাদের সমুখ দিয়েই এল। আপনার মেয়ের সঙ্গে গল্পে মেতেছে বোধ হয়।' ডানদিকের ঘরখানার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মালা এদিকে এস। তোমার কাকাবাবু ডাকছেন।'

এনাক্ষীর সঙ্গে নীলকান্তবাবুর বড় মেয়ে মালা ঘর থেকে উঠানে এসে নামল। এনাক্ষীর চেয়ে সে শুধু মাথায় বড় নয়, বয়সেও বছর দুই বড়। তেইশ-চব্বিশ হবে বয়স। গড়ন অনেকটা মায়ের মতো। ছিপছিপে দোহারা গড়ন। গায়ের রঙ মাজা গৌর। একটু লম্বাটে ধরনের মুখ। বয়সোচিত তারল্য কি তারুণ্য সে মুখে কম। চোখ দুটিতে একটু যেন বিষাদের ছায়া।

অমিয়ভূষণ তার দিকে তাকিয়ে সস্নেহে বললেন, 'ইস, কত বড় হয়ে গেছে! সেই ছেলেবেলায় দেখেছি। ফ্রক পরত তখন। আর এখন রীতিমত মহিলা।'

নির্মলা হেসে বললেন, 'মালা নমস্কার কর কাকাবাবুকে।'

মালা একটু অপ্রতিভ হল। নিচু হয়ে তাড়াতাড়ি পায়ের ধুলো নিতে যাচ্ছিল, অমিয়ভূষণ একটু পিছিয়ে গিয়ে বললেন, 'থাক থাক।'

এনাক্ষী একটু হেসে বলল, 'ও কি করছেন মালাদি, আপনারা যে বামুন।'

কিন্তু এবার আর অপ্রতিভ হল না। অমিয়ভূষণের দিকে চেয়ে হেসে বলল মালা, 'এনাদি ভারি দুষ্টু কাকাবাবু।' এগিয়ে এসে মালা এবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল অমিয়ভূষণের।

অস্বস্তিটুকু কোনোরকমে কাটিয়ে উঠে অমিয়ভূষণ মালার মাথায় সস্নেহে হাত রেখে স্মিতমুখে বললেন, 'সুখী হও মা।'

শতদলবাসিনী ফের এসে তাড়া লাগালেন, 'তুই আবার গল্প করতে শুরু করলি অমিয়?'

আমরা খাব, তোমরা কাজ করবে, আর আমরা বসে বসে আড্ডা দেব। কি বলুন নীলকান্তবাবু?'

সশব্দে হেসে উঠলেন সদানন্দ। জবাবে নীলকান্ত কোন কথা না বলে শুধু মৃদু একটু হাসলেন।

অমিয়ভূষণ এবার শ্বশুরের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার দাদু এলেন না কমল?'

কমলাক্ষ বলল, 'তিনি আলাদা বসেছেন বাবা।'

সদানন্দ হেসে বললেন, 'তাঁর জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না আময়। তিনি নিজের মেয়ের ভরসায় এসেছেন, তোমার ভরসায় আসেন নি।'

করুণা, কমল, এনাক্ষী সবাই পরিবেশন করতে শুরু কবল। মালাও বসে রইল না। কল্যাণী আব এনাক্ষীর নিষেধ সত্ত্বেও মাছ-তরকারির থালাগুলি বয়ে নিয়ে এল মালা।

নির্মলা বললেন, 'করুক না। পাঁচজনকে দিতে-থুতে খুব ভালবাসে মেয়ে। নিজেদেব বাড়িতে এমন উপলক্ষ্য তো বড একটা হয় না।'

বলতে বলতে থেমে গেলেন নির্মলা।

জল আনবার জন্যে তাড়াতাড়ি বাইরে আসছিল কমল, উল্টোদিক থেকে মালা ঘরে ঢুকছিল তরকারির থালা হাতে। ঠোকাঠুকি হবার উপক্রম হতেই দ্রুপা পিছিয়ে গেল সে।

কমল অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'সরি'।

মালা একটু হেসে চোখ নামিয়ে নিল।

এনাক্ষী তা লক্ষ্য করে হেসে বলল, 'আর একটু হলেই যে দুই মেল ট্রেনে কলিসন হয়ে যেত দাদা। হতাহতের সীমা-সংখ্যা থাকত না।'

'আচ্ছা ফাজিল হয়েছিস তুই।' বলে কমল সেখান থেকে সরে গেল।

খাওয়া দাওয়ার পর অমিয়ভূষণের স্বজন বন্ধুরা বিদায় নিলেন। কাজের বাড়ির লোকজনকে বেশিক্ষণ আটকে রাখা ঠিক নয়। তাছাড়া তাঁদের

নিজেদেরও কাজকর্ম আছে। এক জায়গায় বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দেওয়ার সময় কি আর আজকালকার দিনে জোটে জীবনে ?

সদানন্দ হিরন্ময়ের দল অমিয়ভূষণের বাড়ি আর স্থান নির্বাচনের আর এক দফা সুখ্যাতি করে গেলেন। কীর্তিপুর অঞ্চল আরো উন্নত হবে। অমিয়-ভূষণের মত আরও কয়েকঘর গৃহস্থ এদিকে এলে কীর্তিপুরের বাসযোগ্যতা যে বাড়বে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যাতায়াতের দু রকমের ব্যবস্থাই আছে। ট্রেন আর বাস। বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ স্টেশনের দিকে গেলেন। একটু দেরি হলেও ট্রেনে যাবেন তাঁরা। যাঁদের তাড়া বেশি তাঁরা তাড়াতাড়ি বাসে চাপলেন। বন্ধুর দলকে কলোনির সীমানা অবধি এগিয়ে দিয়ে এলেন অমিয়ভূষণ।

ফিরে এসে দেখলেন স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে নীলকান্তও বিদায় নেওয়ার জন্যে তৈরী হচ্ছেন।

অমিয়ভূষণ আপত্তি করে বললেন, 'ওকি নীলুদা, তুমি যাচ্ছ যে। তোমার বাড়ি তো আর এখান থেকে দূরে নয়। বড়-জোর আট-দশ মিনিটের পথ। জোর পায়ে হেঁটে গেলে বোধ হয় তাও লাগে না। তোমার এত তাড়া কিসের।'

নীলকান্ত মৃদু হাসলেন, 'তাড়া কিছু নেই। আমি তো প্রায় নিষ্কর্মা মানুষ। তুমিই বরং আজ ব্যস্ত আছ অমিয়। ব্যস্ত থাকাই উচিত।'

অমিয়ভূষণ প্রতিবাদ করে বললেন, 'না না, এখন আর এমন ব্যস্ত কি ? কাজ-কর্ম, খাওয়া-দাওয়া তো প্রায় মিটেই গেল। বাকি দু-চারজন যা আছেন তাঁদের ব্যবস্থা কমলরাই করতে পারবে। তুমি চল, ঘরে গিয়ে বসবে।'

নির্মলা পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি হেসে বললেন, 'শুধু বন্ধুকেই আপ্যায়ন করছেন অমিয়বাবু, আর আমরা বুঝি কেউ নই ?'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'তা কেন হবে। আমি তো জানি বন্ধুকে বললে বান্ধবীকেও বলা হয়। একজন তো আর একজন ছাড়া নন।'

নির্মলা বললেন, 'তবে বলি শুনুন, আপনার বন্ধু আসতে চাইছিলেন না,

আমিই জোর করে ধরে নিয়ে এসেছি। ওঁর ইচ্ছা ছিল হয় একা আসবেন না হয় আসবেন না। আমি জোর করে ছেলেমেয়ে নিয়ে ওঁর সঙ্গে এসেছি।'

অমিয়ভূষণ নীলকান্তের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'তাই নাকি নীলুদা? তুমি ভিতরে ভিতরে এত পর ভাব আমাকে? আমার বাড়িতে আসতেও তোমার লজ্জা?'

নীলকান্ত অভিযোগের কোনো জবাব না দিয়ে অমিয়ভূষণের দিকে পিছন ফিরে পাতিলেবুর চারা গাছটা থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে স্মিতমুখে চুপ করে রইলেন। আলোচনাটা যেন তাঁর সম্বন্ধে হচ্ছে না।

নির্মলা বললেন, 'আমরাই জোর করে এলাম। আপনি সেদিন অত করে বলে এলেন, না এসে কি পারি! আমরা না এলে আপনারা যাবেন কেন? বন্ধুত্ব বলুন, আত্মীয়তা বলুন এই আসা-যাওয়া, দেখাশোনা দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে। কারো কাছ থেকে কিছু নেবও না, কাউকে কিছু দেবও না এইভাব নিয়ে কি সংসারে থাকা যায়?'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'ঠিক বলেছেন বউদি। আপনার মতের সঙ্গে আমার বেশ মিল আছে। নীলুদার কথা আর বলবেন না, ওকে তো আমরা পুরোপুরি সংসারী কেউ মনে করিনে। নীলুদা আধা-সন্ন্যাসী।'

নীলকান্তের এতক্ষণে বোধ হয় একটু ধৈর্যচ্যুতি হল। স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, 'ঢের হয়েছে। চল, এবার যাওয়া যাক।'

নির্মলা অমিয়ভূষণকে আর একবার অনুরোধ করলেন, 'যাবেন কিন্তু অমিয়বাবু, অবশ্য যাবেন। আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। কাজের কথা।'

অমিয়ভূষণ হেসে বললেন, 'আমাকে বুঝি খুব কাজের মানুষ ভেবেছেন? আচ্ছা যাব। নিশ্চয়ই যাব।'

মালা বলল, 'কাকীমা, এনাদি ওদের সবাইকে নিয়ে যাবেন কিন্তু।'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'আচ্ছা, সবাইকে নিয়েই যাব। তুমিও এসো মাঝে মাঝে। এখন আর কি। এখন তো সব চেনা-শোনাই হয়ে গেল।'

মালার পরে আরো তিনটি ছেলেমেয়ে নীলকান্তের। বিশু আর যীশু দুই ভাই পিঠাপিঠি। একটির বয়স চোদ্দ আর একটির বারো। দুজনই স্কুলের ছাত্র। সম্প্রতি মাঠে যাওয়ার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তাদের খেলার বেলা বয়ে যায়। ছোট মেয়ে রীণার বয়স সাত। তার মনও এখন আর টিঁকছে না। মাকে বার বার তাগিদ দিচ্ছে, 'চল মা, বাড়ি চল।'

নির্মলা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ চল। আচ্ছা বিপদ হয়েছে তোমাদের নিয়ে। বাড়িতেও থাকবে না, আবার একজায়গায় এসেও কেবল ছটফট করবে।'

আর একবার অমিয়ভূষণ আর কল্যাণীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্বামীর দিকে চেয়ে মৃদু হেসে নির্মলা বললেন, 'লেবুগাছটাকে আর মুড়ো করে কাজ নেই। চল এবার এগোনো যাক।'

৫

নীলকান্ত রায় সপরিবারে যে কলোনীতে থাকেন তার নাম নেতাজীনগর। এখানে আশে পাশে এ-ধরনের 'নগর' আরো অনেকগুলি আছে। বাপুজী-নগর, বীরনগর, সুভাষনগর। সবগুলিই পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের জবরদখল কলোনী। কামার, কুমোর, ছুতোর মিস্ত্রী থেকে শুরু করে ধোপা, নাপিত, সাহা, কৈবর্ত, কায়েত, বামুন সর্বশ্রেণীর সবরকম জীবিকার লোকই এখানে এসে বসতি বিস্তার করেছে। আবার জীবিকাহীন বেকার লোকেরও অভাব নেই। এক একটি গৃহস্থের ভাগে দু কাঠা আড়াই কাঠার এক একটি প্লট। অপেক্ষাকৃত যারা সচ্ছল, যারা একটু বেশি ক্ষমতাবান তারা একসঙ্গে দুটো প্লট দখল করেছে। টিন দিয়ে, টালি দিয়ে ঘর তুলে নিয়েছে। কেউ এক-খানা, সামর্থ্য যার বেশি, পরিবারে লোকের সংখ্যা যার বেশি সে দু'তিনখানা পর্যন্ত তুলেছে। প্রায় প্রত্যেকেরই ঘরের সামনে একফালি করে উঠোন। সে উঠোন কেউ মিছামিছি ফেলে রাখেনি। বেগুন মূলো লাউ কুমড়ো সিম সজনে

বছরের নানা ঋতুর নানা তরকারির চাষ হয় সেখানে। সেই সঙ্গে ফুলের চাষও আছে। গাঁদা, দোপাটি, বেল, জুঁই। যার শখ একটু বেশি সে সাদা কি লাল গোলাপের চাষও করে। সে ফুল বুড়িদের পুজোর থালায় উঠে না, তরুণীদের কালো খোঁপায় শোভা পায়।

নেতাজীনগরে চার কাঠা জমির ওপর উত্তর আর পশ্চিমের ভিটিতে দু'খানি টিনের ঘর নীলকান্ত রায়ের। পুব-দক্ষিণে শাকসব্জীর বাগান। বাড়ীর চারদিকে বাঁখারির বেড়ার সীমানা। বড় উত্তর ঘরখানার পিছনে একটি পুকুর। সে পুকুর যদিও সকলেরই সম্পত্তি, তবু নীলকান্তর বাড়ীর লাগা বলে তিনিই এর সুযোগ-সুবিধা বেশি পান। পুকুরের দক্ষিণপাড়ে, নীলকান্ত রায়ের ঘরের পিছনে বেশ বড় একটি বাতাবি লেবুর গাছ। লেবুর ভাগ নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে বাদবিসম্বাদ হলেও গাছের ছায়াটুকু, তার সবুজ শোভাটুকু নীলকান্ত রায়ের নিজস্ব। নিজের ঘরখানিতে জানলার ধারে বসে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারেন। তাঁর মোটেই একঘেয়ে লাগে না. ক্লান্তি আসে না।

শাকসব্জীর বাগান আর গাছগাছালি-ঘেরা এই বাড়িঘর নীলকান্তকে নিজের হাতে গড়ে তুলতে হয়নি। পরের জমি জবরদস্তির সঙ্গে দখল করে তাতে বসতি বিস্তারের যে প্রাথমিক হাঙ্গামা কলোনীর বাসিন্দারা ভোগ করেছে, জমির মালিকের সঙ্গে মাসের পর মাস যে লড়াই তাদের চালাতে হয়েছে তার বিবরণ নীলকান্ত এখানে এসে কিছু কিছু শুনেছেন। কিন্তু নিজের চোখে তাঁকে সে সব দেখতে হয়নি, নিজের হাতে গড়তে হয়নি। তাঁর লড়াই ভিন্ন ধরনের। তাঁর সংগ্রাম নিজের মধ্যে। নিজের সঙ্গে নিজের।

এই বাড়ি নীলকান্তের মামাশ্বশুর পান্নালাল চক্রবর্তীর। দেশ বিভাগের পর তিনি পাকিস্তান ছেড়ে সেখানকার বাড়িঘর বিক্রি করে এই নেতাজী নগরের জবরদখল কলোনীতে এসে বাড়ি করেন। কিন্তু এই নতুন বাড়িতে নিজে বেশিদিন বাস করতে পারেননি। বছর তিনেক আগে কলেরায় স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই মৃত্যু হয়েছে। নির্মলাই এখন মামার স্থাবর-অস্থাবরের উত্তরাধিকারিণী। দূর সম্পর্কের ওয়ারিশ হয়তো এখনো দু'একজন আছে। কিন্তু

তারা অবস্থাপন্ন। ভালো চাকরি বাকরি করে। কলকাতায় বেশি ভাড়া দিয়ে বাসা করে রয়েছে। কলোনীর চার কাঠা জমি আর দু'খানা টিনের ঘর তারা এসে কোনদিন দাবি করবে এমন আশঙ্কা নেই। সেদিক থেকে নির্মলা নিশ্চিন্ত। কিন্তু মাথা গোঁজার স্থান মিললেই সব চিন্তা দূর হয় না। চিন্তা-ভাবনার আরো অনেক বিষয় থেকে যায়। নির্মলারও রয়েছে। ছেলেমেয়েদের খাওয়াপরা, পড়িয়ে শুনিয়ে তাদের মানুষ করে তোলবার সমস্যা আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। বাড়ির কর্তা নীলকান্তের কোন রোজগার নেই। তিনি বেকার। সংসারে একমাত্র সম্বল, একমাত্র ভরসা মালা। কলকাতার হাসপাতালে সে নার্সের কাজ করে। তারই আয়ে সংসার চলে। নির্মলা নিজেও বসে নেই। মেয়েদের স্কুলে নিচের ক্লাসগুলিতে পড়ান। নতুন স্কুল। টাকা তিরিশের বেশি দিতে পারে না। সে টাকাও নিয়মিত আদায় হয় না। তবু যতদিন এর চেয়ে ভালো আয়ের ব্যবস্থা না হয় এ চাকরি ছাড়তে পারেন না নির্মলা। বেশি মাইনের ভালো কোন কাজ এ বয়সে জোটবার আশা আর নেই। বিদ্যাও তো বেশি নয়। স্কুলের গণ্ডি পার হতে পারেননি। কি বাপের বাড়িতে কি শ্বশুর বাড়িতে তখন পড়াশুনার রেওয়াজ তেমন ছিল না।

মালা হাসপাতালে বেরোবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। রাত্রে ডিউটি থাকলে খাওয়াদাওয়া সেরে সন্ধ্যার আগে আগেই বেরিয়ে পড়ে। ওকে তাড়াতাড়ি রওয়ানা করিয়ে দেওয়ার গরজ নির্মলারই বেশি। তিনি বলেন, 'যেতে যখন হবেই একটু আগে বেরোনোই ভালো। বেশি রাত্রে চলাফেরা করা ভালো না বাপু। বিপদ-আপদ ঘটতে আর কতক্ষণ লাগে।'

অবশ্য বেশি রাতকে নির্মলার যত ভয়, মালার তেমন ভয় নেই। একা একা চলাফেরা করা তার অভ্যাস হয়ে গেছে। এখান থেকে রাত আটটায় শেষ বাস ছাড়ে। তার ঘণ্টাখানেক আগে থেকেই পথে লোক-চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। কাঁচা মাটির রাস্তার দু'দিকের ঝোপ-ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে গৃহস্থবাড়ির ক্ষীণ আলোর রেখা অবশ্য মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। কিন্তু তাতে

নিঃসঙ্গ পথের সবখানি অন্ধকার কাটে না। একবার কলোনীর কয়েকটি বকাটে ছোকরা মালার পিছু নিয়েছিল—অশ্লীল ভঙ্গিতে শিস দিতে দিতে অনেকক্ষণ অবধি গিয়েছিলো সঙ্গে সঙ্গে। সেকথা কানে যাওয়ার পর নির্মলা মেয়েকে আর কিছুতেই বাস-স্টপ পর্যন্ত একা যেতে দেন না। তিনি বলেন, 'না বাপু, অত বেশি সাহসে দরকার নেই তোমার। তুমি হয় বেলা থাকতে যাও, নইলে বিশু-যীশুকে সঙ্গে নাও। ওরা টর্চ নিয়ে তোমাকে বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসুক।'

ছোট ভাই দুটি অবশ্য তাকে এগিয়ে দিতে পারলেই খুশী। কিন্তু মালার তা ইচ্ছা নয়। ওরা এই অজুহাতে পড়া কামাই করুক, কি সন্ধ্যার পর বাড়ির বাইরে থেকে কলোনীর বকাটে ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেড়াক, তা মালা চায় না। একবার বেরোতে দিলে ওরা কি আর সহজে বাড়িতে ফিরবে? তার চেয়ে মালা একটু বেলা থাকতে বেরোবে, সেই ভালো।

শাড়ি পালটে, ছোট আয়নাখানার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে পাউডারের পাফটা একটু বুলিয়ে নিচ্ছিল মালা—বিশু, যীশু, রীণা প্রায় একসঙ্গে ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল—'দিদি, দিদি, মণিমামা আজ আবার এক থলি আম নিয়ে এসেছে, দেখো এসে।'

মালা মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে বলল, 'তোরাই দেখ্। খাওয়ার ব্যাপারে এত লোভী হয়েছিস তোরা!'

'লোভ নেই কেবল শ্রীমতী মালার।'

বলতে বলতে মণিময় এসে ঘরে ঢুকল। শ্যামবর্ণ দীর্ঘ চেহারা। বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো বলে অতটা মনে হয় না। পরনে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবী। মালার দিকে চেয়ে মণিময় একটু হেসে বলল, 'কি, সাজসজ্জা হচ্ছে বুঝি? ঘটাপটা তো খুব দেখছি।'

মণিময়ের এ ধরনের কথাবার্তায় মালা প্রথম প্রথম ভারি লজ্জা পেত। বয়সে অনেক বড়, সম্পর্কেও গুরুজন। তাঁর মুখে এরকম হাসিঠাট্টায় মালা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ত গোড়ার দিকে। কিন্তু এখন শুনতে শুনতে মণিময়ের

চালচলন দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে মালা। কোন সঙ্কোচ নেই মনে। সে জানে, স্বভাবগম্ভীর মণিমামা তাদের সংস্পর্শে এলে অনেক লঘু হয়ে পড়েন। বয়সের গুরুত্ব, সম্পর্কের গুরুত্ব কিছুক্ষণের জন্যে সব ঝেড়ে ফেলে ভাগ্নে-ভাগ্নীদের সমবয়সী হতে চান যেন। শুধু মালা নয়, বিশু-যীশুরাও তা উপভোগ করে।

মণিময়ের কথার জবাবে মালা বলল, 'আমার সাজের আর কি ঘটাপটা দেখলেন মণিমামা—আমাদের স্টাফ-নার্স রাণীদির সাজসজ্জাটা যদি দেখতেন, আপনার মাথা ঘুরে যেত।'

নির্মলা কাছেই ছিলেন। মেয়ের কথা শুনতে পেয়ে তিনি তাকে ধমক দিয়ে উঠলেন, 'ছিঃ, ওসব কি ঠাট্টা মালা, মণি না তোর গুরুজন! তার সঙ্গে এঁকি ঠাট্টা-তামাসা। আর মণি, তোমাকেও বলি ভাই, ওদের আস্কারা দিয়ে দিয়ে তুমি একেবারে কাঁধে তুলে ফেলেছ। ওরা এখন আর তোমাকে মোটে ভয়ই করে না।'

মণিময় হেসে বলল, 'না করে না করুক রাঙাদি, তার জন্যে আপনাকে অত ভাবতে হবে না। আমাকে ভয় করে এমন লোক অনেক আছে, ভালোবাসে তাদের সংখ্যাই বরং কম রাঙাদি।'

তক্তপোশের ওপর পা তুলে বসে মণিময় একটু হাসল।

বিশু-যীশু থলি থেকে আমগুলি ঢেলে ফেলে গুণে গুণে আলাদা করে রাখছিল, নির্মলা তাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'থাক থাক, তোমাদের আর বাঁটোয়ারা করতে হবে না, আমিই সব বেঁটে দিয়ে আসব। এখন দয়া করে পড়তে বসো গিয়ে। পড়াশুনোর ধার দিয়েও যদি কেউ হাঁটতে চায়।'

মায়ের ধমক পেয়ে মুখ ভার ক'রে দু'ভাই সেখান থেকে সরে গেল।

মণিময়ের দিকে তাকিয়ে নির্মলা বললেন, 'ওটা তোমার বিনয়ের কথা মণিময়। তোমার কাজের গুণে তোমাকে শ্রদ্ধা করবার, ভালোবাসবার মানুষের অভাব নেই। তবু ঘরে গেলে একেক সময় বোধ হয় ফাঁকা ফাঁকা লাগে। নিজের বউ-ছেলের কাছ থেকে যা পাওয়া যায়, তা কি আর কারো কাছে মেলে? শতজনে শত করুক, শত দিক, তা মেলেনা। তোমাকে অত ক'রে

বললাম, বিয়ে করো। তা তো কিছুতেই শুনলে না। সময়মত বিয়ে-থা করলে এতদিনে ঘর যে ভরে যেত।'

নির্মলার হঠাৎ খেয়াল হলো মালা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছে। তিনি মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোর সময় হলো না মালা? আর রাত করছিস কেন? এর পর অতটা পথ একা একা যাবি কি করে?'

মালা বলল, 'আমি ঠিক যেতে পারব মা। তুমি আমার জন্তে ভেবো না।'

নির্মলা বললেন, 'না আমি ভাবব কেন। আমাকে কারো জন্তেই কিছু ভাবতে হয় না। যত ভাবনা কেবল তুমিই ভাবো।'

মণিময় বলল, 'মালার একা একা গিয়ে কাজ নেই রাঙাদি। ও বরং আমার সঙ্গেই যাবে। আমিও এক্ষুনি উঠব।'

নির্মলা ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'সে কি কথা, তুমি এখনই যেতে চাও নাকি মণিময়? না না, তা হবে না। এই রাত্রে কোথায় যাবে?'

মণিময় হেসে বলল, 'একেবারে চলে যাব না রাঙাদি। এসোসিয়েশনের অফিস পর্যন্ত যাব। তারপর দরকার-টরকার সেরে এখানে এসে শ্রীহস্তের ছুটি বাঁধা ভাতও খাব। সেই নিমন্ত্রণটুকু করে যাওয়ার জন্তেই এখানে প্রথমে এলাম।'

নির্মলা হেসে বললেন, 'বেশ তো।'

মণিময় মালার দিকে চেয়ে বলল, 'তা হলে চলো মালা, ওঠা যাক। কার্যোদ্ধার তো হয়েই গেল। আর দেরি করে লাভ কি।'

নির্মলা বাধা দিয়ে বললেন, 'এক কাপ চা অন্তত খেয়ে যাও, দেরি হবে না বেশি।'

মণিময় একটু ইতস্তত করে বলল, 'চা বরং এখন থাক রাঙাদি। আমি চায়ের তেমন ভক্ত নই।'

নির্মলা বললেন, 'তাই কি হয়? গরম চা না হলে গরম গরম বক্তৃতা জমবে কি করে?'

মণিময় বলল, 'আমি শুধু গরম গরম বক্তৃতা করি, এই বুঝি আপনার ধারণা?'

নির্মলা মৃদু হেসে বললেন, 'তাছাড়া কি।'

তারপর চা, চিনি, মিল্ক পাউডার আর কেটলিটা গুছিয়ে নিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ডালের কড়া নামিয়ে রেখে জলভরা কেটলিটা বসিয়ে দিলেন উনানে। প্রথমে দুকাপ জল নিয়েছিলেন। তারপর স্বামীর কথা মনে পড়ায় এক কাপ জল বেশি নিলেন কেটলিতে।

মণিময় এ বাড়িতে এলে শুধু ছেলেমেয়েরা কেন, নির্মলা নিজেও বেশ উৎসাহ বোধ করেন। ওর আসার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার দীর্ঘদিনের একঘেয়েমি কেটে যায়। যেন এক নতুন জগতের সংবাদ বয়ে নিয়ে আসে মণিময়। সে জগৎ কর্ম-কীর্তিতে পরিপূর্ণ। প্রাণশক্তিতে চঞ্চল। এখানকার মন্থর নৈরাশ্যময় জীবনযাত্রার সঙ্গে কোন মিল নেই মণিময়ের। তবু সে আসে, মাসে দু'একবার করে আসে।

আর আসা-যাওয়া, দেখা-শোনার মধ্যেই সব। মেলামেশার ভিতর দিয়েই আস্তে আস্তে পরও আপন হয়, কুটুম্বও আত্মীয়ও হয়ে ওঠে। নইলে মণিময় তো নির্মলার আপন কেউ নয়, ননদের দেওর। ধরতে গেলে কত দূরের সম্পর্ক। কিন্তু এখন আর দূরের বলে ওকে ভাবাই যায় না। আলাপে-ব্যবহারে এমন অন্তরঙ্গ হয়ে গেছে মণিময়ের সঙ্গে যে, নির্মলার ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত আজ মণিমামা বলতে অজ্ঞান।

প্রথম প্রথম মণিময় এখানে বেড়াতেই আসত। শহরের বাইরে এই গাছপালা আর আগাছা জঙ্গলে ঘেরা গ্রামের পরিবেশ তার ভালো লাগত। মণিময় নিজের মুখেই সেকথা একদিন স্বীকার করেছিল। বলেছিল, 'দশটা পাঁচটা অফিসে বসে ঘাড় গুঁজে বিজ্ঞাপনের কপি লিখি রাঙাদি। কখন যে সূর্য ওঠে, কখন যে অস্ত যায়, তা টেরও পাইনে। আকাশ-মাটি-গাছপালার যে অস্তিত্ব আছে সংসারে, তা প্রায় ভুলেই গেছি।'

নির্মলা হেসে বলেছিলেন, 'তোমরা শহরের লোক গাঁয়ে এসে মাঝে মাঝে

এমন কবিত্ব জন্মে বটে। কিন্তু আমরা যারা এখানে পড়ে থাকি আর টের পাই পাড়াগাঁয়ের কি সুখ-সুবিধে। শুধু তো গাছপালা নিয়েই মানুষের দিন কাটে না। মানুষ মানুষের সঙ্গই চায়। কিন্তু এখানকার লোকজনের যা ধরনধারন তাতে কারো সঙ্গে মিশবার ভরসা হয় না ভাই।'

মণিময় হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, 'আমাকে যথেষ্ট লজ্জা দিলেন রাঙাদি। জেলে বসে দু'চার ছত্র পদ্য লিখলেও আমি যে কবি এমন অপবাদ আমার কোন শত্রুতেও দেয়নি। শুধু গাছপালার সবুজ রঙ নয়, এইসব কলোনীর বেরঙা মানুষকেও আমি দেখেছি। তবে আপনার ছুঁৎমার্গের তত্ত্ব কিন্তু আমি মানিনে। মিশতে পারবেন না কেন? ভালো-মন্দ ছোট-বড় সবাইর সঙ্গে মিশতে হবে। তবে তো মানুষের ভিতরকার পরিচয় পাবেন আপনি।

নির্মলা হেসে বলেছিলেন, 'আর মুখে মুখে কেন। ও ঘর থেকে কাগজ কলম নিয়ে আসি, লিখলেই কাব্য টাব্য যা হোক একটা কিছু হয়ে যাবে।'

কিন্তু কাগজ কলমেই কেবল কাব্য করেনি মণিময়। কথাকে ও কাজে রূপ দেওয়ার চেষ্টাও করেছে। এই কীর্তিপুর অঞ্চলে ওকে আজ সবাই চেনে। অবসর যাপনের ক্ষেত্রকে মণিময় নিজের কর্মক্ষেত্র করে তুলেছে। ওর চেষ্টাতেই এখানে আজ হাইস্কুল হয়েছে, ছেলেদের ছোটমত একটা লাইব্রেরী আর পাঠচক্র গড়ে উঠেছে। যে উদ্বাস্তু কলোনীর ঘরে ঘরে দলাদলি ছাড়া আর কিছু ছিল না তাদের নিয়ে ও দল গড়ে তুলেছে। আজকাল আর অবসর যাপনের জন্যে নয়, কাজের জন্যেই এখানে আসে মণিময়। সবদিন নির্মলার সঙ্গে দেখা করে যাওয়ার সময় পায় না। তাই নিয়ে নির্মলা মাঝে মাঝে অভিযোগ করেন, অনুযোগ দেন।

এক কাপ চা স্বামীকে পাঠিয়ে দিয়ে মণিময়ের কাপ নিজে নিয়ে এলেন নির্মলা। নিজের কাপটিও আনলেন সেই সঙ্গে। মণিময়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'তারপর আর কি খবর টবর বলো। দেশোদ্ধার—থুড়ি, দেশোদ্ধার তো হয়েই গেছে, উদ্বাস্তু উদ্ধারের কাজ কেমন চলছে তোমাদের।'

মণিময় হেসে বলল, 'খুব ঠাট্টা ক'রে নিচ্ছেন। ওসব উদ্ধার-টুদ্ধারের কথা পরে হবে। আপনার কথা বলুন।'

নির্মলা বললেন, 'আমার আর নতুন কথা কি আছে। দু' বেলা রান্না-বান্না, ঘর-সংসারের কাজ। ছেলেমেয়ে আর স্বামীশাসন। দুপুরে এক ফাঁকে গিয়ে কয়েকটি বেয়াড়া মেয়েকে ধমকানো। কারোবই কিচ্ছু হবে না। মিছামিছি হয়রানি।'

মালা এর আগেও লক্ষ্য করেছে, আজও দেখল, মণিময়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার সময় মা একটু প্রগলভ হয়ে ওঠেন। তাঁরও বয়সের ভার কমে যায়। কথায় কোত্থেকে একটু যেন লঘু কৌতুকের সুর আসে। মায়ের এই রূপান্তরটুকু মনে মনে উপভোগ করে মালা। মণিময় শুধু তাঁর ভাইয়ের স্থান নেয়নি, বন্ধুর আসনও নিয়েছে। মণিময়ের সঙ্গে আলাপের সময় প্রসন্নতা আসে নির্মলার মনে, রুক্ষ মুখে যেন স্নিগ্ধতার ছোঁয়া লাগে একটু।

মণিময় বলল, 'বিনয়ে আপনিও বড় কম যান না। জানেন, স্কুলের কাজে আপনার খুব সুনাম হচ্ছে।'

প্রশংসায় ভারি লজ্জা পেলেন নির্মলা। কিশোরী মেয়ের মতো আরক্ত হয়ে উঠলেন। একটু বাদে বললেন, 'কি যে বলো, সুনাম না আরো কিছু। ওসব বাজে কথা রাখো। হ্যাঁ, খবরের কথা জিজ্ঞেস করছিলে, একটা বড় খবর দিতে পারি। এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিলুম বলতে।'

মণিময় উৎসাহিত হয়ে বলল, 'বলুন, বলুন। আমরা সব শহুরে লোক। কাগজ পড়ি, আর খবর শুনি। খবর ছাড়া আমাদের একদিন তো ভালো, এক মুহূর্তও চলে না। কীর্তিপুরের কোন খবর থাকলে চটপট বলে ফেলুন।'

'কলোনীগুলির আলাদা আলাদা নাম থাকলেও মৌজাটা একসঙ্গে কীর্তিপুর নামেই পরিচিত। কিন্তু নির্মলা কথাটা ইচ্ছা ক'রেই অন্য অর্থে নিলেন। হেসে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, কীর্তিপুরেরই খবর। আমাদের হেঁজিপেঁজি গরীব কলোনীর নয়। জানো, সেদিন আমরা কীর্তিপুর থেকে নিমন্ত্রণ খেয়ে এলাম।'

মণিময় কৃত্রিম বিস্ময়ের ভঙ্গিতে বলল, 'সে কি কথা! অমন বড়লোকদের আস্তানায় ঢুকে পড়তে সাহস হলো আপনার? আমি হলে তো কিছুতেই ভরসা পেতাম না রাঙাদি।'

একটু দূরে বিশু যীশু আর রীণা মাদুর পেতে হ্যারিকেনের আলোয় বই নিয়ে বসেছিল। বইয়ের পাতায় চোখ থাকলেও কান ছিল গল্পের দিকে।

বিশু আর থাকতে পারল না। মায়ের শাসনের কথা ভুলে গিয়ে বলে উঠল, 'আমরাও গিয়েছিলাম মণিমামা।' যীশু প্রতিধ্বনি করল, 'আমিও গিয়েছিলাম। আমরা সবাই গিয়েছিলাম। বাবা, দিদি, রীণা—'

নির্মলা ছেলেকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'থাক্ থাক্; তোমাকে আর গোণা গোষ্ঠীর হিসেব দিতে হবে না। একটুকাল পরেই তো ঢুলতে থাকবে।'

মণিময় বলল, 'এ বড় অন্যায় রাঙাদি। ওর বুঝি বলবার কিছু থাকতে পারে না? আমি ফিরে এসে তোমার কাছ থেকে সব শুনব যীশু। তুমি ততক্ষণ দু-এক পাতা যা পড়বার আছে পড়ে নাও।' তারপর নির্মলার দিকে ফিরে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, 'তাহলে সপরিবারেই গিয়েছিলেন। নেমন্তন্নটা খুব জমকালো রকমের হয়েছিল নিশ্চয়ই! ব্যাপারখানা কি?'

নির্মলা অমিয়ভূষণের গৃহপ্রবেশের বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণনা করে বললেন, 'তা যাই বলো চমৎকার লোক অমিয়বাবু। বড়লোক হয়েও পুরোনো গরীব বন্ধুকে এমন ক'রে ক'জনে মনে রাখেন। অন্য কেউ হ'লে যেতাম না। কিন্তু অমিয়বাবু নিজে এসে এতবার ক'রে বললেন। না গিয়ে পারলাম না। ভাবলাম, ভালো লোকের সঙ্গে তো আলাপ-পরিচয় বড় একটা হয় না। এতদিন বাদে সে সুযোগ যখন এসেছে, হাতছাড়া না করাই ভালো।'

মণিময় গম্ভীরভাবে বলল, 'হ্যাঁ, দু'একজন বড়লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় রাখা ভালো বই কি।'

নির্মলা বললেন, 'তুমি যা ভাবছ তা নয়। তাঁদের কাছে আমিও কিছু প্রত্যাশা করিনে, আমাদের কাছেই বা অমিয়বাবুদের কি চাওয়ার থাকতে পারে। তুমি যা ভাবছ তা নয় মণিময়। বড়লোকের সঙ্গে গায়ে পড়ে ঘনিষ্ঠতা

আমি করতে চাইনে। এমনিই আলাপ-পরিচয় রাখতে চাই। তিনি নিজে থেকে যখন এগিয়ে এলেন আমার পক্ষে পিছিয়ে যাওয়া কি ভালো হতো?'

মণিময় একটু হেসে বলল, 'আমি আপনাকে ঠাট্টা করছিলাম রাঙাদি। আপনি যে কি ধরনের মানুষ তা কি আপনি মুখ ফুটে বলবেন তবে আমি বুঝব? ভালো লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন বই কি। তাঁদের সঙ্গে দুটো কথা বলেও আনন্দ আছে। চলো মালা, রাত হয়ে যাচ্ছে।'

মালা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি যান আর না যান, আমার এবার ছুটতে হবে।'

মণিময়ও উঠে পড়ল।

নির্মলা বললেন, ভালো কথা, 'আসল খবরটাই যে বলতে ভুলে গেলাম।'

কি ভেবে নির্মলা যেন মুখ টিপে হাসলেন।

মণিময় ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে আর একবার ফিরে তাকাল। কিছু না বুঝে হেসে বলল, 'কি ব্যাপার, অত হাসছেন যে।'

নির্মলা বললেন, 'একটা কথা মনে পড়ল। এখানে তুমি যেমন একটি আইবুড়ো ছেলে রয়েছ, সেখানে সেই অমিয়বাবুদের বাড়িতে তেমনি আই-বুড়ো একটি মেয়ে আছে। তোমারই বয়সী। কি সামান্য কম হ'তে পারে। নামটিও বেশ। করুণাকণা। আলাপ হওয়ার পর থেকে ভাবছি তোমার জন্যে তার কাছে করুণা ভিক্ষে করলে কেমন হয়? যদিও জাতে মিল নেই। আমরা বামুন, ওরা বদ্যি। কিন্তু তুমি তো আর অত জাত টাত মানো না। জেলে কত জাতের ভাত খেয়েছ ঠিক নেই। কি বল, ঘটকালি শুরু ক'রে দেব নাকি?'

মণিময় একটুকাল থমকে রইল। তারপর ঠোঁটে একটু হাসি টেনে বলল, 'ঘটকালি ক'রে লাভ নেই রাঙাদি। এর আগেও একবার সে চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সুবিধে যে হয়নি তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। মালা চলো, সত্যিই দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার।'

মালা বলল, 'চলুন।'

কিন্তু অল্পবয়সী মেয়ের মতো কৌতূহলী নির্মলা পিছনে পিছনে এলেন। উচ্ছল তরলকণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'ও মণিময়, শোনো শোনো। সবটুকু বলে যাও। ব্যাপারটা সব শুনি।'

কাছে যে মেয়ে আছে সেকথা যেন ভুলে গেলেন নির্মলা। একটি পুরুষের অবিবাহিত থাকার কারণ আবিষ্কার করার চেয়ে বড় আবিষ্কার যেন আর কিছু নেই।

কিন্তু মণিময় এবার আর তাঁর অনুরোধ রাখল না। উঠানের সীমানা পার হবার আগে আবছা অন্ধকারে তাঁর দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে বলল, 'এখন সময় নেই রাঙাদি। মালাকে এগিয়ে দিয়ে নিজের কাজকর্ম সেরে আসি। তারপর ধীরে সুস্থে এসে গল্প করব। ব্যস্ত হবেন না।

শেষ কথাটায় একটু যেন তিরস্কারের সুর বাজল।

নির্মলা লজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

৬

পথে নেমে এসে মণিময় বড় লজ্জা বোধ করল। নির্মলার পরিহাসের জবাবে অত কথা বলা ঠিক হয়নি। এত অল্পেই ধরা দেওয়া উচিত হয়নি তার। মণিময় সাধারণত চাপা স্বভাবের মানুষ। বেশি কথা বলা তার অভ্যাস নয়। নিজের জীবনের কথা তো নয়ই। কিন্তু হঠাৎ মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম ঘটে। যে গুরুভার পাথরে পূর্ব স্মৃতিকে চেপে রেখেছে মণিময়, তা যেন আপনা থেকেই সরে যায়। কোন একজনের কাছে সব কথা খুলে বলতে ইচ্ছা করে; কিন্তু মণিময় মনের এই ইচ্ছাকে সহজে আমল দেয় না। তবু কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে সেই নিষিদ্ধ রুদ্ধ জানলাটি খুলে যেতে চাইলেও মণিময় তা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে।

খানিকটা পথ হেঁটে আসবার পর মালা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'করুণাদির সঙ্গে বুঝি আপনার আগে থেকেই আলাপ ছিল ?'

মণিময় একটু অনিচ্ছার সঙ্গে বলল, 'ছিল অল্প স্বল্প। তাকে তুমি দিদি বল নাকি ? আলাপ হয়েছে তোমার সঙ্গে ?'

মালা বলল, কতক্ষণের বা আলাপ। একদিন তো সবে দেখেছি। তাও ভিড়ের মধ্যে। আপনার সঙ্গে কতদিনের জানাশোনা ?'

আর একটু ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করল মালা।

মণিময় প্রসঙ্গটা থামিয়ে দিয়ে বলল, 'সেকথা পরে একদিন বলব। কিন্তু তুমি যদি অত আস্তে চল, বাস কিছুতেই ধরতে পারবে না মালা।'

মালা বুঝল মণিময় আর বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে চায় না। মণিমামার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কৌতূহল দেখিয়ে বরং একটু লজ্জিত হলো মালা। আর কোন কথা না বলে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। খানিক বাদে মণিময় বলল, 'ও সব নিয়ে জল্পনা-কল্পনার তোমার কোন দরকার নেই মালা। রাঙাদির সঙ্গে আমি একটু ঠাট্টা করছিলাম।'

ব্যাপারটার সবখানিই যে ঠাট্টা নয় তা মালার বুঝতে বাকি নেই। কিন্তু এ নিয়ে আর কোন প্রতিবাদ করল না। মণিমামার প্রকৃতি মালা জানে। তিনি যখন একবার কথাটা চেপে গেছেন কারো সাধ্য নেই তাঁর মুখ থেকে এ প্রসঙ্গে ফের কোন কথা বার করে।

মালা বলল, 'আপনি তো আমার স্বভাব জানেন। কারো কোন বিষয় নিয়ে জল্পনা-কল্পনা আমি করিনে, করার সময়ই বা কই।'

আর একটু জোর পায়ে হাঁটতে গিয়ে মালার ডান পাটা হঠাৎ ছোট একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেল। দিন দুই আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। তার জলকাদা এখনো ভালো ক'রে শুকায়নি। এক পাটি জুতো ভিজে গেল। খানিকটা কাদা ছিটকে গিয়ে লাগল শাড়িতে। মণিময় টর্চটা ঘুরিয়ে ধরল। বাঁ হাতে ধরে ফেলল মালাকে। তারপর একটু হেসে বলল, 'আমার

ওপর রাগ করে নিজের পাটা ভেঙে ফেললে নাকি মালা? খুব লাগল, না?'

শেষ কথাটায় স্নেহ আর সহানুভূতি প্রকাশ পেল মণিময়ের।

মালা বলল, 'না লাগেনি।'

মণিময় বলল, 'না লাগলেও নিশ্চয়ই জুতো আর শাড়িটা গেছে। চলো, বাড়ি গিয়ে বদলে আসবে।'

মালা আপত্তি ক'রে বলল, 'না না, তেমন ভেজেনি। আমি বেশ যেতে পারব। হাসপাতালে গিয়ে সব ধুয়ে নিলেই হবে।'

মণিময় বলল, 'আচ্ছা, তোমার যাতে সুবিধে হয় তাই করবে।' তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'এবার এই রাস্তাটায় হাত না দিলে আর চলবে না।'

মালা একটু বিস্মিত হ'য়ে বলল, 'রাস্তায় হাত দেবেন মানে?'

মণিময় একটু হেসে বলল, 'পায়ের রাস্তা তো হাত দিয়েই গড়তে হয় মালা। সব সময় কি পায়ের ওপর নির্ভর করলে চলে? পথে হাঁটতে আমি নিজেও অনেকদিন হোঁচট খেয়েছি। খানা খন্দে পড়েছি কয়েকবার। যারা রোজ চলে তাদের অসুবিধে তো অনেক বেশি। তবু কেউ টুঁ শব্দ করে না।'

মালা বলল, 'হোঁচট খেতে খেতে তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে মণিমামা।'

মণিময় বলল, 'অভ্যাসটা সদভ্যাস নয়।'

মালা একটু হাসল, 'আপনি সৎই বলুন আর অসৎই বলুন তাদের কিছু এসে যায় না। যারা হোঁচট খেতে ভালোবাসে তারা হোঁচট খাবেই।'

মণিময় বলল, 'হোঁচট খেতে কেউ ভালোবাসে না। ওটা তোমার রাগের কথা। আমার তো মনে হয় দু' একজন গরজ ক'রে হাত লাগালে তার পিছনে পিছনে আরো দশজন ছুটে আসবে।'

মালা বলল, 'হাত লাগিয়ে দেখুন আসে কি না। আমি তো তেমন কোন আশার লক্ষণ দেখিনে।'

মণিময় লক্ষ্য করেছে, মালার কথায় এ ধরনের কিছু না কিছু নৈরাশ্য প্রায় সব সময় ফুটে বেরোয়। এত নৈরাশ্য যেন ওর বয়সের পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়। কিন্তু যে অবস্থার ভিতর দিয়ে ও বড় হয়ে উঠেছে, যে প্রতিকূলতার সঙ্গে ওর প্রতিদিনের সংগ্রাম চলছে তাতে সব সময় ও আনন্দে আহ্লাদে উৎফুল্ল হয়ে থাকবে এমন আশা করাটাও ভুল। মালাকে দেখলে মনে হয় ওর আসল বয়সের চেয়ে মনের বয়স অনেক বেশি। সংসারের নানা অভিজ্ঞতায় ওর প্রবীণতা অনেক বেড়েছে। তাকে ঠিক অকালপক্কতা বলা যায় না। মণিময়ের মনে হয় এই প্রবীণতার ফলেই ওর সান্নিধ্য তার কাছে সহনীয় হয়ে উঠেছে। নইলে একটি অল্পবয়সী মেয়ের বাচালতা প্রগলভতা সে বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারত না তা যত স্নেহের সম্পর্কই ওর সঙ্গে থাকুক।

এতক্ষণে ওরা বাস চলাচলের বড় রাস্তায় এসে পড়ল। এ রাস্তার মোড়ে আলো আছে। লোকজন অছে। দোকান-পাটগুলি এখনো খোলা। শুক্লা লণ্ড্রী আর কাত্যায়নী ভাণ্ডারের ঝাঁপ বন্ধ হয়নি। মিষ্টির দোকানের মালিক খদ্দেরের কাছ থেকে পয়সা গুণে নিচ্ছে।

বড় তেঁতুল গাছটার তলায় কলকাতাগামী বাস দাঁড়িয়ে আছে। কণ্ডাকটার থেকে থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাকছে, 'দমদম, বেলগাছিয়া, শ্যামবাজার।'

মালা বলল, 'যাক ভাগ্য ভালো। বাসটা পাওয়া গেছে। আপনি অনেকদূর কষ্ট ক'রে এলেন।'

মণিময় একটু হাসল, 'ভদ্রতা করা হচ্ছে বুঝি?'

মালা এবার কোন জবাব না দিয়ে মৃদু হাসল। তারপর বাসের ভিতরে গিয়ে বসল। জানলা দিয়ে চোখে পড়ল, মণিময় তখনও দাঁড়িয়ে আছে। মালা মুখ বাড়িয়ে বলল, 'আমি কাল ফিরে না আসা পর্যন্ত চলে যাবেন না যেন।'

মণিময় কোন জবাব না দিয়ে স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে রইল। বাসে বেশি যাত্রী ওঠেনি। প্রায় খালি বাসই বলা যায়। কথায় কথায় বেশ একটু দেরি হয়ে

গেছে মালার। অন্তত আধ ঘণ্টা লেট হ'তে হবে। স্টাফ নার্সের বকুনি খাওয়া আছে ভাগ্যে। অপেক্ষাকৃত এই জনবিরল পথে, রাত্রের এই যাত্রাটা মন্দ লাগে না মালার। প্রথম প্রথম গা একটু ছমছম করত। কীর্তিপুর থেকে মেয়ে বড় একটা কেউ ওঠে না। সব পুরুষ। গোড়ার দিকে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করত মালা। মনে হ'তো সবাই যেন চক্ষুময় হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে গেছে। এখন আর সেই ভয়ও নেই অস্বস্তিও নেই। রাস্তার দু'দিকের থমথমে স্তব্ধ গাছপালাগুলির দিকে তাকিয়ে সেই গা ছমছমানি দূর হয়েছে। আজকাল বরং বেশ একটু মজাই লাগে মালার। চলন্ত গাড়িতে না উঠলে বেগবান জীবনকে যেন টের পাওয়া যায় না। একদিন মালার মনে হয় এই গাড়ির গতি যদি না থামে তাহলে কেমন হয়। অনন্তকাল ধরে যে গাড়ি চলে, যার পথেরও শেষ নেই, গতিরও শেষ নেই তেমন কোন গাড়িতে যদি মালাকে কেউ তুলে দেয় তার কেমন লাগে? ভাবতেই মালা যেন শিউরে উঠল। ওরে বাবা! না, তেমন অফুরন্ত পথ সে চায় না। পথ এসে ঘরের কাছে থামে বলেই তো পথের এত আদর। শুধু যদি পথে পথে বেড়ায় মালা তাহলে তো বাবা মা ভাই বোন কাউকেই পাবে না। ভাইবোনেরা ভারি ভালোবাসে মালাকে। যীশু প্রায়ই বলে 'দিদি, আমাকেও নিয়ে যেয়ো তোমাদের হাসপাতালে।' রীণা বলে, 'দিদির কি মজা! রোজ গাড়িতে করে বেড়াতে যায়।' ওরা খুব ভালোবাসে তাকে। ওদের জন্যেই যে এত কষ্ট করে মালা তা ওরা খুব বোঝে।

বাসটা কীর্তিপুর কলোনীর কাছে এসে থামল। কোন যাত্রী না ওঠায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে দিল। সেই মুহূর্তে পিছন থেকে একজনের গলা শোনা গেল 'বাঁধকে বাঁধকে। এই কণ্ডাকটার বাঁধকে।'

কণ্ডাকটার বাস থামিয়ে বলল, 'আইয়ে, জলদি আইয়ে।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় হুড়মুড় ক'রে একজন যাত্রী উঠে পড়ল। সে যেন চলন্ত বাসে উঠছে এমনই তার ভাব। হাতে খয়েরি রঙের ঢাকনিতে ঢাকা একটি সেতার। টাল সামলাতে না পেরে পা ফসকে সে প্রায় মালার গায়ের ওপর

পড়ে যাচ্ছিল, মাথার ওপরকার রডটা তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল। মালার পাশের বেঞ্চ থেকে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ধমকে উঠলেন, 'কি মশাই, দেখে শুনে উঠতে পারেন না? মেয়েছেলের গায়ের ওপর পড়বেন নাকি? নেশাটেশা করে এসেছেন বুঝি?'

কমলাক্ষ সহযাত্রীর দিকে একবার চোখ তুলে তাকাল। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে এনে মালার দিকে চেয়ে বলল, 'মাফ করবেন।'

মালা তাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে একটু সরে পাশের জায়গাটি দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'বসুন।'

কমলাক্ষ তখনো বিস্মিত হয়ে চেয়ে আছে দেখে মালা মৃদু হেসে বলল, 'চিনতে পারছেন না? সেদিন অত নিমন্ত্রণ খেয়ে এলাম।'

কমলাক্ষ এতক্ষণে চিনতে পেরে বলল, 'ও।' তারপর একটু ইতস্তত ক'রে পাশে বসে পড়ল।

যে ভদ্রলোক ধমক দিয়েছিলেন তিনি অস্ফুটস্বরে কি যেন বিড়বিড় ক'রে উঠলেন ঠিক বোঝা গেল না।

একটু বাদে সংকোচ কাটিয়ে কমলাক্ষ বলল, 'আপনাকে এ সময় বাসে দেখব আশা করিনি।'

মালা স্মিতমুখে চুপ করে রইল।

কমলাক্ষ বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন তো জিজ্ঞেস করি কোথায় যাচ্ছেন?'

মালা বলল, 'মনে করবার কি আছে? ডিউটিতে।'

কমলাক্ষ বলল, 'ডিউটি—সে আবার কি?'

মালা বলল, 'আপনি বোধ হয় জিজ্ঞেস করতে চান সে আবার কোথায়? আমি হাসপাতালে কাজ করি আপনি কি শোনেননি? আপনাদের বাড়ির আর সবাই তো জানেন।'

কমলাক্ষ বলল, 'কই আমি তো শুনিনি। শুনেছি কি না ঠিক খেয়াল নেই।'

মালা বলল, 'বোধ হয় শেষ কথাটাই সত্যি। আপনারা আর্টিস্ট মানুষ, খেয়াল একটু কম।'

কমলাক্ষ বলল, 'না না, ঠিক তা নয়। কিন্তু আপনি হাসপাতালে কাজ কবেন শুনে ভারি অদ্ভুত লাগছে।'

মালা একটু বিস্মিত হয়ে বলল, 'কেন, অদ্ভুত লাগবার কি আছে?' কমলাক্ষ বলল, 'না না, এমনিই বলছিলাম। কিছু মনে করবেন না।'

মালা বলল, 'এব মধ্যে মনে কববাব কি আছে? আপনি বোধ হয় কোন জলসায় টলসায় যাচ্ছেন?'

কমলাক্ষ একটু হাসল, 'হাতেব সেতাব দেখে বলছেন তো। না, কোন জলসায় যাচ্ছিনে। কাল সকালে বেডিওতে আমাব প্রোগ্রাম আছে। অত ভোবে যদি বাসটাস না পাই তাই আজই খানিকটা এগিয়ে থাকি। বেলগাছিয়ায় আমাব দাদুব বাড়ি। সেখানেই থাকব আজ রাত্রে।'

মালা বলল, 'বেডিওতে আপনি বুঝি প্রাযই বাজান?'

কমলাক্ষ স্মিতমুখে বলল, 'প্রাযই না, মাঝে মাঝে প্রোগ্রাম পাই। আপনি কি এসব ভালোবাসেন?'

মালা বলল, 'কি সব?

কমলাক্ষ বলল, 'মানে এই গান বাজনা।'

মালা মৃদু হেসে বলল, 'গান বাজনা কে না ভালোবাসে। শুনতে খুবই ভালোবাসি।'

কমলাক্ষ বলল, 'শুধু শুনতে? কেন নিজে চর্চাটর্চা করলেই পারেন।'

মালা বলল, 'সবাই কি সব কাজ পাবে?'

কমলাক্ষ এবার একটু লজ্জিত বোধ করল। সত্যি ও কথা জিজ্ঞাসা করা তার উচিত হয়নি। সবাই সব জিনিস পারে না তা ঠিক। অনেকের ভিতরেই এ সব জিনিসেব অভাব থাকে। আবার অনেকের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সাধ্যে কুলায় না। মালার কেন হচ্ছে না একবার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হল কমলাক্ষেব। কিন্তু .ক ভেবে থেমে গেল। নিতান্ত বন্ধু-বান্ধবের

সঙ্গে ছাড়া সে বেশি কথা বলে না। কিন্তু এই অল্পপরিচিত মেয়েটির কাছে সে এরই মধ্যে অনেক কথা বলে ফেলেছে। নিজের আচরণে সে নিজেই এতক্ষণে লজ্জা বোধ করল। না জানি মালা তার সম্বন্ধে কি ভাবছে।

কিন্তু এ নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবতে হল না কমলাক্ষকে। মালা নিজে থেকেই ফের কথা শুরু করল, 'আপনাদের বাড়ির সব কেমন আছেন?'

কমলাক্ষ ফিরে তাকাল, 'ভালোই।'

মালা বলল, 'কাকাবাবু একদিন আসতে চেয়েছিলেন, কই এলেন না তো।'

কমলাক্ষ বলল, 'সময় পেয়ে ওঠেন না। এতদূর থেকে কলেজে যাতায়াত করতে খুব অসুবিধে হয়। সময় তো কম লাগে না।'

মালা বলল, 'তা অবশ্য ঠিক। বেশ সময় লেগে যায়। ওঁরা তো আসতে পারেন—'

কমলাক্ষ কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বলল, 'প্রত্যেকেই তো যাবেন যাবেন করেন। আচ্ছা, আমি ওঁদের বলব।'

মালার একবার ইচ্ছা হলো মণিময়ের সঙ্গে কমলাক্ষদের পরিচয় আছে কি না সে কথা একবার জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু পাছে কোন অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ উঠে পড়ে সেই আশঙ্কায় কথাটা চেপে গেল।

বেলগাছিয়ার মোড়ে এসে কমলাক্ষ উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমাকে এবার নামতে হবে। সময়টা বেশ কাটল।'

মালা মৃদু হেসে চোখ নামিয়ে নিল। কথাটা তো তারও।

কমলাক্ষ নেমে গেল। পরের স্টপটায় মালাকেও নামতে হল। সামনেই হাসপাতাল। সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ডিউটি পড়েছে মালার। হল ঘরে ঢুকতেই স্টাফ নার্স রমা নন্দী ভ্রূ কুঁচকে কৈফিয়ৎ তলব ক'রে বসলেন, 'এত দেরি হলো যে মালা?'

বেঁটে কালো মোটাসোটা চেহারা। বয়স চল্লিশ পার হয়েছে।

মেজাজটা একটু খিটখিটে। কাজকর্ম ভালোই বোঝেন। মনে মায়া মমতাও আছে। কিন্তু ভাষা বড় রুক্ষ।

মালা যোগ্য কৈফিয়ৎ খুঁজে না পেয়ে বলল, 'দেরি হয়ে গেল রমাদি।'

শুধু এই স্বীকৃতিতে রমা নন্দী খুশি হলেন না। ধমক দিয়ে বললেন, 'আরে দেরি যে হয়ে গেল তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কেন দেরি হল সেই কথাই জিজ্ঞেস করছি তোমাকে। এত করে বলি অত দূর থেকে আসা পোষাবে না। তোমার যদি বা পোষায় হাসপাতালের পোষাবে না। এখানে হোস্টেল টস্টেল আছে তাতে থাক, তা নয়। আসবে সেই খেড়খেড়ে গোবিন্দপুর থেকে আর রোজ লেট হবে।'

রোজ অবশ্য লেট হয় না মালা। কদাচিৎ দু' একদিন দেরি হয় তার, কিন্তু এই মুহূর্তে প্রতিবাদ করে লাভ নেই। তাতে রমাদি আরও চটে যাবেন। মালা ওর স্বভাব জানে। আর হোস্টেলে থাকার কথা তিনি বললেন। হোস্টেলে থাকতে গেলে যা মাইনে পায় তার প্রায় সবটাই এখানে তাকে রেখে যেতে হবে সে কথাও রমাদি না জানেন তা নয। সে কথাও ওঁকে মনে করিয়ে দেবে। একটি পয়সাও কি হিসাবের বাইরে ব্যয় করবার জো আছে মালার। তাতেও তো মাসের পনের দিন যেতে না যেতে টানাটানি শুরু হয়ে যায। নিজেদের সংসারের এত খুঁটিনাটি ব্যাপার মালা কাউকে বলে না। অনর্থক অনুকম্পা কুড়িয়ে লাভ কি। নিজের দুঃখ নিজে বহন করাই ভালো। নিঃশব্দে মালা চার্জ বুঝে নিতে লাগল।

রমা নন্দী আড় চোখে তার দিকে একটুকাল তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখলেন। তারপর এগিয়ে এসে পিঠে হাত রেখে বললেন, ঈস, একটা কথা বলেছি কি মেয়ের চোখ অমনি ভার। চোখ ছলছল করছে।'

মালা এবার মুখ ফেরাল, 'ও কথা বলবেন না রমাদি। আমার চোখ অত অল্পে ছলছল করে না।'

রমা নন্দী বললেন, 'থাক আর বাহাদুরী দেখাতে হবে না। তোমরা কত যে শক্ত মেয়ে আমার খুব জানা আছে। এই বয়সে দিব্যি ঘর গেরস্থালী

করবে, বিয়ে থা হবে, মান অভিমানের পালা চলবে স্বামীর সঙ্গে। তা তো নয় এসেছ রাজ্যের রোগী ঘাটতে। এসেছ যখন যাও ওই একুশ নম্বর বেডের কাছে। একটু তত্ত্বতালাস কর।'

অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে একুশ নম্বর বেডের পেশেণ্টকে।

মালা সেদিকে একবার তাকিয়ে স্টাফ নার্সকে জিজ্ঞাসা করল, 'অপারেশন হয়ে গেছে বুঝি?'

রমা নন্দী বললেন, 'হ্যাঁ, ওভারিটা বাদ দিতে হয়েছে। টেম্পারেচার ক্রমেই রাইজ করছে। বেশ ভোগাবে বলে মনে হচ্ছে। থার্মোমিটারটা আবার দাও তো।'

স্টাফ নার্সের নির্দেশে মালা একুশ নম্বর বেডের দিকে এগিয়ে গেল।

হল-ভরা সারি সারি বেড। বেশির ভাগই ভরতি। একবার ঘুরে এসে মালা মাঝখানে টেবিলটার কাছে দাঁড়াল। দু' একটি পেশেণ্টের চীৎকার কানে আসছে। প্রথম প্রথম এতে ভারি বিব্রত বোধ করত মালা। বিচলিত হয়ে পড়ত। আজকাল সয়ে গেছে। রমাদি বলেন, শুধু হাত পা নয়। হৃদয়কেও যন্ত্রের মত ক'রে নিতে হয়। নইলে নিয়মমতো কাজ করা যায় না।

ঢং করে একটা বাজল দেয়াল-ঘড়িতে। ঘড়ির নিচে রেডিওর এমপ্লিফায়ার। পেশেণ্টদের জন্যে রেডিওর ব্যবস্থা আছে ঘরে। মালার হঠাৎ মনে পড়ল কমলাক্ষের কথা। কাল সকালে তার প্রোগ্রাম আছে।

সারারাত জাগবার পর কাল এই হাসপাতালে বসেই শুনতে পারবে মালা। কিন্তু শুনতেই যে হবে তার কি মানে আছে। নিজের আগ্রহের ওপর মালা ঔদাসীন্যের আবরণ টানল।

৭

মণিমামা ওঠো, ও মণিমামা! চা খাবে না?' নীলকান্তের ছোট মেয়ে রীণার ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল মণিময়ের। চোখ মেলে দেখল বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে রোদ এসে পড়েছে। বেশ বেলা হয়েছে তাহলে।

রোজই অবশ্য রোদ চোখে লাগবার পর ঘুম ভাঙে মণিময়ের। ভোরে ওঠা নিয়ে সূর্যের সঙ্গে তার কোন প্রতিযোগিতা নেই। মাণিকতলার দোতলার মেসের ঘবে তাব তক্তপোশখানা পূবদিকের জানালা ঘেঁষে পাতা। শীতে গ্রীষ্মে বিছানায় শুযেই সূর্যোদয় দেখবার সৌভাগ্য হয় তার। দেখে অবশ্য মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে না মণিময়। পাশ ফিরে ফের চোখ বুজে পড়ে থাকে। রুম মেট সবোজ নন্দী মার্চেণ্ট অফিসের কেরানী। কিন্তু অফিসেব মাইনেয় সংসার পুরোপুরি চলে না। সকালে বিকালে টুইশন করতে হয়। মণিময়ের মতো অত বেলা অবধি নিদ্রাবিলাস তার পক্ষে সম্ভব হয় না। মুখহাত ধুয়ে বেরিয়ে পড়বার আগে এক একদিন ডাক দিয়ে যায় 'ও মণিবাবু উঠুন, কত আর ঘুমোবেন। বেশ আছেন মশাই—সংসারের চিন্তা নেই ভাবনা নেই। নাকে তেল দিয়ে বেলা দুপুর পর্যন্ত ঘুমুলেও কেউ দেখতে আসবে না।'

মণিময় হেসে বলে, 'তা এত যদি আফসোস আপনিও দু' একদিন ঘুমিয়ে নিলেই পারেন। তেলের তো আর অভাব নেই।'

সরোজ জবাব দেয়, 'হুঁ, ও হলেই হয়েছে। টুইশনটি সঙ্গে সঙ্গে যাবে। ঘর সংসারের জ্বালা তো আর বুঝতে হলো না মণিবাবু, দিব্যি আছেন। বিয়ে-থা করতেন, ফলরূপে পুত্রকন্যা ডাল ভেঙে পড়ত তাহলে বুঝতেন মজা। সংসারকে দিব্যি ফাঁকি দিয়ে গেলেন মশাই। জীবনে কোন ঝামেলা-ঝক্কি পোয়াতে হল না।'

মণিময় চোখ বুঁজে বলে, 'তা ঠিক। সংসার বেটাকে আচ্ছা ফাঁকি

দিয়েছি। ও এখনো টের পায়নি কতখানি ফাঁকি দিলাম। যখন টের পাবে আফসোসে কপাল চাপড়ে মরবে।'

সরোজ বলে, 'ঘর সংসারের এত ঝামেলা আগে যদি টের পেতাম তাহলে কি আর এমন আহাম্মুকি করি।'

কিন্তু এই সরোজ নন্দীই যখন শনিবারের আধা অফিস শেষ ক'রে স্ত্রীর ফর্দ অনুযায়ী কাপড়কাচা আর গায়েমাখা সাবান, ছেলের জন্যে লজেন্স আর রঙীন পেনসিল কিনে বর্ধমানের লোক্যাল ট্রেন ধরবার জন্যে তৈরি হয়, তখন তার মুখের চেহারা অন্যরকম দেখায়, মুখের ভাষা অন্য রকম শোনায়। মণিময়ের পরিহাসের জবাবে সে বলে, 'তা যাই বলুন মশাই, সংসারের মরুভূমিতে ওইতো এক ফোঁটা ওয়েসিস। বউ ছেলেমেয়েভরা একখানা ঘর। সেই ঘরের মধ্যে থেকেই আমরা বিশ্বরূপ দেখি। স্যুটকেশ গুছাতে গুছাতে সরোজ গুন গুন ক'রে আবৃত্তি করতে থাকে, 'সহস্র বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।' কলেজে পড়বার সময় সেও কাব্যচর্চা করত।

'ও মণিমামা ওঠো। আবার ঘুমুচ্ছে। চা যে জুড়িয়ে গেল।' এবার হাত ধরে নাড়া দিল রীণা।

মণিময় আবার চোখ মেলে তাকাল। বছর সাত-আট বয়স হয়েছে রীণার। মাথার কোঁকড়ানো চুল কাঁধ অবধি নেমেছে। বেশ ফুটফাট চেহারা। মুখ তো নয় কথার তুবড়ি। হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টেনে নিল মণিময়, হেসে বলল, 'চাটা এখানে নিয়ে এসো লক্ষ্মীটি, শুয়ে শুয়ে খাব।'

রীণা বলল, 'এ রামো। বাসিমুখে চা খাবে নাকি। মুখ ধুলে না, দাঁত মাজলে না, ঘেন্না করে না তোমার। মাগো।'

মণিময় স্মিতমুখে বলল, 'তুমি যখন অত নিন্দা করছ বেড-টি খাওয়ার সুখ আমার আজ ভাগ্যে নেই।'

এবার বিছানা ছেড়ে সত্যিই উঠে পড়ল মণিময়। উঠানে বালতি করে জল তুলে রেখেছেন নির্মলা। সেখানে গেল মুখ ধোয়ার জন্যে। নির্মলা তা

দেখে হেসে বললেন, 'লক্ষীছাড়ী বুঝি তোমাকে না ভুলে' ছাড়ল না মণিময়। ওর জন্যে তোমাকে অক্ষরে অক্ষরে হাইজিন মেনে চলতে হবে দেখে নিয়ো।'

পুঁইগাছের মাচার নিচে বসে কুলকুচো করে মুখের জল ফেলতে ফেলতে মণিময় ভাবল এর নামই কি সহস্র বন্ধন? এই কি মুক্তির স্বাদ? এই স্বাদ-টুকুর জন্যেই সরোজ নন্দীর মতো সেও কি এই কীর্তিপুর কলোনীতে ছুটে আসে? বিশ্বাস করে না মণিময়। নিজের কাছে একথা সে নিজে স্বীকার করতে চায় না। তাই যদি হতো তাহলে তো সে বিয়ে করতেই পারত। ইচ্ছা করলে এখনো তো পারে। একবার টু শব্দ করলে দশজন কন্যাদায়গ্রস্ত বাপ আজও তার সামনে এসে দাঁড়াবে। কিন্তু বিয়ের প্রবৃত্তি নেই মণিময়ের। সেই প্রথম যৌবনে গার্হস্থ্য-জীবনের ওপর তার যে বিতৃষ্ণা ছিল তা আজও কাটেনি। সহস্র বন্ধন নয়, সাধারণ পারিবারিক মানুষ মাত্র একটি বন্ধনের কথাই জানে। সে বন্ধন দারাপুত্রের। তার বাইরে পৃথিবীর কোন অস্তিত্ব তাদের কাছে নেই। বিশ্বরূপ দেখবে এমন সাধ্য কি তাদের। বিশ্বকে তারা ছোট সংসারের মাপে ছোট করতে করতে একটি কূপ বানিয়ে ছাড়ে। বিয়ে করে অনেক প্রাক্তন সহকর্মীর এই দশা হয়েছে, নিজের চোখেই দেখেছে মণিময়।

নির্মলা আর একবার তাড়া লাগালেন। বারান্দায় বসে ছেলেমেয়েদের খেতে দিতে দিতে বললেন, 'ল' নায় যে আসে সেই রাবণ। এ বাড়িতে যে আসে আমার কপাল গুণে সেই ভাবুক হয়ে পড়ে। মুখ ধুতে ধুতে তো এক বালতি জল ফুরিয়ে ফেললে। আর এক বা'লতি জল দিয়ে আসব নাকি মণিময়?'

মণিময় মুখ ফিরিয়ে হেসে বলল, 'না, আমার আর দরকার হবে না। আপনার দু নম্বর বালতি নীলকান্তদাব জন্যে রিজার্ভ রাখুন।'

বারান্দায় লম্বালম্বিভাবে দড়ি টাঙানো, তাতে লালগামছা ঝুলছে। গামছা-খানা নিয়ে মুখ মুছতে মুছতে মণিময় বলল, 'কই দিন চা।'

বিশু যীশু আর রীণাকে প্রাতরাশ হিসাবে বাটিতে করে মুড়ি আর বাতাসা

সাজিয়ে দিয়েছেন নির্মলা। মণিময় সেই সারিতে বসে বলল, 'এ যে দেখছি শিবহীন যজ্ঞ। কর্তা কই।'

নির্মলা বললেন, 'তিনি কি তোমার আমার মত ভিড়ের মানুষ যে এখানে আসবেন ? তাঁর চা আর খাবার আলাদা করে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

মণিময় হেসে বলল, 'তাই নাকি ? দাঁড়ান, নীলকান্তদাকে আমি এবার দশজনের ভিড়ে টেনে নামিয়ে তবে ছাড়ব।'

নির্মলা বলল, 'ঈশ অতই ক্ষমতা ? তোমার হুকুমে বরং পূবের সূর্য পশ্চিম থেকে উঠবে ; কিন্তু ওঁকে ঘরের বাইরে কিছুতেই নিতে পারবে না।'

মণিময় চটুল স্বরে বলল, 'আচ্ছা, রাখুন বাজি। যদি ওঁকে বদলাতে পারি কি দেবেন বলুন।'

নির্মলা হেসে বললেন, 'কি আর দেব ? ওঁকেই নিয়ে যেয়ো। তোমার দেশের কাজে টাজে যদি লাগাতে পার মন্দ কি।'

মণিময় চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'বাপরে। এ যে একেবারে সর্বস্ব-দান। দিতে পারবেন প্রাণ ধরে ?'

নির্মলার মুখে কিসেব একটা ছায়া পডল। মৃদুস্বরে বললেন, 'অমন সর্বস্ব অনেকবার গেছে মণিময়। এখন আর কিছুতেই কিছু ভয় নেই।'

ছেলে মেয়েরা রয়েছে। বিশু সব কথাই আজকাল কিছু কিছু বুঝতে পারে। তাই তাড়াতাড়ি কথার মোড ঘুরিয়ে দিলেন নির্মলা, 'কই মালা তো এখনো এল না।'

বিশু বলল, 'নাইট ডিউটি থাকলে দিদি এত সকাল সকাল ফেরে নাকি মা, যে এখনই আসবে ? অন্য সিফটের লোকজন এলে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে তবে তো রওনা হবে। তার ফিরতে ফিরতে সেই ন'টা।'

মণিময় হেসে বলল, 'বিশু আপনার চেয়ে অনেক খোঁজখবর রাখে দেখেছেন ?'

তার মনে পড়ল মালা বলে গেছে সে এসে পৌছবার আগে যেন মণিময় চলে না যায়। আজ রবিবার। অফিসের তাড়া নেই। কিন্তু নারকেল-

ডাঙ্গায় নিমন্ত্রণ আছে বন্ধু প্রভাত দত্তের বাসায়। তাঁর ছেলের আজ অন্ন-প্রাশন; মণিময়দেরই দলের কর্মী প্রভাতদা। একই সঙ্গে জেল খেটেছে। তারপর পঞ্চাশ বছর বয়স পার হয়ে এসে বনে না গিয়ে কর্পোরেশন স্কুলের এক বিধবা মিষ্ট্রেসকে বিয়ে করেছেন। সেই বিয়ের ছেলে। সবাই ধরে পড়েছে জাঁকজমক ক'রে অন্নপ্রাশন করতে হবে। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে সেও নিমন্ত্রিত হয়েছে। গেলে অনেকেরই সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হবে। কিন্তু কীর্তিপুর থেকে যে আজ সহজে বেরোতে পারবে এমন ভরসা কম। মালার অনুরোধের জন্যে নয়। এখানকারই কাজের জন্যে। রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব এগিয়ে আসছে। তাই নিয়ে গুটি তিনেক দল হয়েছে। এক একটি কলোনী আলাদা আলাদা-ভাবে জয়ন্তী কমিটি গঠন করেছে। কমিটি ছোট হলেও প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারীরা কেউ ছোট নয়। মণিময় কাল কয়েকটি ছেলেকে ডেকে বলেছিল, 'তোমরা যদি একসঙ্গে কাজ কর, সবগুলি দল মিলে একজায়গায় ফাংশনের ব্যবস্থা কর আমি কলকাতা থেকে নামকরা একজন সাহিত্যিক এনে দেব। সভাপতি কি প্রধান অতিথি যা খুশি তোমরা তাঁকে করে নিতে পারবে।'

প্রস্তাবটা অনেকের কাছেই লোভনীয় মনে হয়েছে। তারাও মিলে মিশে কাজ করতে চায়। দায়িত্ব আর ব্যয় অনেকের মধ্যে ভাগ করে দিলে তাতে উৎসবের আড়ম্বর আয়োজনটা বাড়ে অথচ মাথাপিছু চাঁদাটা কম পড়ে। কিন্তু কোন কলোনীর দল আগে এগিয়ে আসবে, কে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারীর পদ নিঃস্বার্থভাবে আর একজনকে উৎসর্গ করবে সে মীমাংসা কাল হয়নি। কেউ কেউ বলেছে এর আগে সব কটি কলোনীর ছেলেরা মিলে যাতে সর্বজনীন সরস্বতী পুজার ব্যবস্থা করা যায় তার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু ফল হয়নি দুটোর জায়গায় তিনটে দল হয়ে গিয়েছিল। এবার রবীন্দ্র জয়ন্তীর বেলায়ও যে তার ব্যতিক্রম হবে এমন আশা করা যায় না। কিন্তু কলেজের গুটি তিনেক ছেলে নিশীথ, সুনীল আর শীতাংশু মণিময়ের সঙ্গ ছাড়েনি। তারা বার বার বলেছে, 'আপনি যদি চেষ্টা করেন তাহলে ব্যাপারটা হবে

যায়। একটা ব্যবস্থা না করে দিয়ে আপনি এখান থেকে যেতে পারবেন না।'

মণিময় হেসে বলেছে, 'ব্যবস্থা করবার ভার তো আমার ওপর নয় তোমাদের নিজেদের ওপর। আমি বাইরের মানুষ। আর তোমরা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। এখানকার লোকজনকে তোমরা যেমন চেন আমি তেমন ক'রে চিনতে পারব কেন। তবে তোমরা যদি কিছু করতে চাও আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব।'

এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে ওরা সবাই খুশি হয়ে উঠেছে। নিশীথ বলেছে, 'সঙ্গে সঙ্গে নয়, আপনি আমাদের আগে আগে যাবেন। আপনি যা বলবেন তাই করব আমরা।'

মণিময়ের মনে পড়ল এই রকম আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি ওই বয়সে সেও নিজের দলপতিকে দিয়েছে। ওদের আন্তরিকতাকে সন্দেহ করবার কোন কারণই নেই। ভাষার মধ্যে যদি কিছু অতিশয়োক্তি থকে তাকে উপহাস করা উচিত হবে না মণিময়ের। ঘৃণা দ্বেষের মত শ্রদ্ধা ভক্তিও মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি। বিশেষ করে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের। ওদের হৃদয় এখনো নরম। যেমন ওরা ভালোবাসতে চায়, তেমনি চায় শ্রদ্ধা দিয়ে ভক্তি দিয়ে কাছাকাছি একজনকে বড় করে তুলতে। যার কথামতো ওরা কাজ করবে, যাকে ওরা অনুসরণ করবে। কিন্তু মণিময় কি ওদের সেই আশা পূরণ করতে পারবে? বহু নৈরাশ্য আর ব্যর্থতার পর কিছুমাত্র উদ্যম উৎসাহ কি আর তার মধ্যে অবশিষ্ট আছে? বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে খাটবার শক্তি কমে আসছে। জীবনের বাকি দিনগুলি জীবিকার জন্যে অফিসের কাজে আর আনন্দের জন্যে পড়াশুনো নিয়ে কাটিয়ে দেবে ভেবেছিল মণিময়, কিন্তু আবার জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে কেন। এরই নাম কি সহস্র বন্ধন? এতে কি সত্যিই মুক্তির স্বাদ মিলবে?

চা খাওয়ার পাট চুকতে না চুকতেই নিশীথরা এসে পড়ল। 'মণিময়দা আছেন?' অল্পদিনের মধ্যেই মণিময়ের বাবুত্ব ঘুচিয়ে তাকে ওরা দাদা ডাকতে

আরম্ভ করেছে। সময়মতো বিয়ে করলে মণিময়ের ছেলের বয়সই ওদের মতো হতো। কিন্তু দাদা ডাকে কোন বাধা দেয় না মণিময়। ওরা যা ডেকে খুশি হয় ডাকুক না।

নিশীথদের সাড়া পেয়ে মণিময় উঠে দাঁড়াল।

নির্মলা বললেন, 'যাও, তোমার চেলা-চামুণ্ডারা এসে পড়েছে। ছেলেপুলে নিয়ে এত হৈ হৈও করতে পারো।'

মণিময় হেসে বলল, 'আইবুড়ো থাকার ওই সুবিধে। কোনদিন বুড়ো হ'তে হয় না।'

একটু বাদেই নিশীথরা উঠানে এসে দাঁড়াল। আরো গুটিকয়েক ছেলে জুটিয়ে ওরা দলে ভারি হয়ে এসেছে।

সুনীল বলল, 'চলুন মণিময়দা।'

মণিময় বলল, 'চলো। কোথায় যেতে হবে যেন।'

শীতাংশু বলল, 'কাল যে বললাম আপনাকে। বীরনগর কলোনীতে। জিতেনবাবু—জিতেন বিশ্বাস সেখানকার প্রেসিডেণ্ট। ওখানে তাঁর মত না নিয়ে কিছু করবার জো নেই। ওখানে সবাই তাঁর কথা মেনে চলে।'

নিশীথ বলল, 'তা চললই বা। তিনি সেখানকার প্রেসিডেণ্ট আছেন বেশ তো। তাই বলে আমাদের মণিময়দার সম্মান কি কারো চেয়ে কম নাকি? উনি কেন যাবেন? বরং তাঁকেই বুঝিয়ে শুঝিয়ে আমরা এখানে নিয়ে আসি।'

মণিময় বাধা দিয়ে বলল, 'না নিশীথ, সে কি কথা। আমিই যাব তাঁর কাছে। এখানে মানমর্যাদার কো· প্রশ্নই ওঠে না। কার্যোদ্ধার করাটাই আসল কথা।'

নীলকান্তের ঘরের সমুখ দিয়েই পথ। যেতে যেতে মণিময় একটু উঁকি দিয়ে দেখল। নীলকান্ত পুরোনো ডায়েরি আর চিঠিপত্রের স্তূপ খুলে বসেছেন। মণিময় তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে সেখানে একটু দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করল, 'কি করছেন।'

নীলকান্ত তাড়াতাড়ি চিঠিগুলিকে আড়াল করে বললেন, 'কিছু না।'

মণিময় বলল, 'হাতে যদি কোন কাজ না থাকে তাহলে চলুন না আমাদের সঙ্গে। ঘুরে আসবেন একটু।'

নীলকান্ত মৃদু হাসলেন, 'না না, কোথায় যাব ঘুরতে?'

মণিময় বললে, 'এই তো কাছেই। বীরনগর কলোনীতে।'

'কেন?' নীলকান্ত ফের জিজ্ঞাসা করলেন।

মণিময় বলল, 'রবীন্দ্র জয়ন্তীর ব্যাপার নিয়ে কলোনীর ছেলেদের মধ্যে গোলমাল বেধেছে জানেন বোধ হয়। চলুন না, মিটমাট করে দেওয়া যায় কি না চেষ্টা করে দেখি।'

নীলকান্ত একটু হাসলেন, 'ও কাজ তো আমার নয় মণিময়।'

ছেলেদের নিয়ে মণিময় পথে নেমে পড়ল। খানিকটা এগোবার পর নিশীথ বলল, 'মণিময়দা, আপনাকে একটা কথা বলব, রাগ করবেন না তো?'

মণিময় হেসে বলল, 'রাগের কথা হলে অবশ্যই রাগ করব। কিন্তু সেই ভয়ে তুমি যদি সত্যি কথাটা না বল তাহলে আরও বেশি রাগ করব নিশীথ।'

নিশীথ বলল, 'তাহলে কথাটা বলেই ফেলি। নীলকান্তবাবুকে এ সব কাজে আর ডাকবেন না মণিময়দা। আমরা অনেক ডাকাডাকি করে দেখেছি। উনি আসেন না, মেশেন না কারো সঙ্গে। বোধহয় মেশবার যোগ্য মনে করেন না আমাদের। শুধু আমরা কেন কলোনীর ছেলেবুড়ো কারো সঙ্গে ওঁর কোন আলাপ নেই। উনি কারো বাড়িতে যান না, কাউকে বাড়িতে ডাকেনও না। শামুকের মত নিজের খোলসটির মধ্যে দিব্যি গুটিয়ে রয়েছেন। এমন অসামাজিক মানুষ আমরা আর দুটি দেখিনি।'

সুনীল আরো কড়া কথা বলল, 'যেমন অসামাজিক, তেমনি দাম্ভিক।'

মণিময় সস্নেহে সুনীলের পিঠে হাত রেখে বলল, 'অত রাগ কোরো না সুনীল. অত রাগ ভালো নয়। সবাই কি আর এক রকম হয়, কি একরকম ক্ষমতা থাকে। নীলকান্তবাবুও সামাজিক হতে পারেন না বলেই

সামাজিক হতে চান না। সেই অক্ষমতাকে তোমরা অহংকার বলে ভুল করো না।

শীতাংশুরা আর কোন তর্ক করল না। মনে মনে ভাবল বন্ধু বলে, আত্মীয় বলে নীলকান্তবাবু সম্বন্ধে হয়তো মণিময়ের কিছু দুর্বলতা আছে। এ নিয়ে বেশি আলোচনা না করাই ভালো।

নিশীথ বলল, 'যাক গে। ওর কথা বাদ দিন মণিময়দা।'

মণিময় হেসে বলল, 'আমরা কারো কথাই বাদ দেব না নিশীথ। আমরা সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলব।'

একটু বাদেই পথের সেই গর্তটার দিকে চোখ পড়ল মণিময়ের। কাল এই গর্তে পা পড়ায় মালা হোঁচট খেয়েছিল। রাত্রে চলবার সময় মণিময় নিজেও বহুদিন অসুবিধা বোধ করেছে। হঠাৎ পথের মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

শীতাংশু পিছন ফিরে বিস্মিত হয়ে বলল, 'ওকি মণিময়দা, থেমে পড়লেন যে। আর কয়েক পা এগুলেই বীরনগর কলোনী। আমরা প্রায়ই এসে পড়েছি। আপনাকে কষ্ট ক'রে আর একটু হাঁটতে হবে।'

মণিময় বলল, 'একটু কেন, অনেকখানিই হাঁটতে রাজি আছি। কিন্তু তার আগে তোমাদের একটা কথা বলে নিই।'

শীতাংশু বলল, 'বলুন।'

মণিময় বলল, 'তোমরা এখানে কালীপূজো, সরস্বতীপূজো, রবীন্দ্রপূজো— অনেক পূজোই করছো, কিন্তু এই রাস্তাটার দিকে একবার তাকাচ্ছ না কেন?'

শীতাংশু একটু অবাক হলো। হঠাৎ এমন উল্টো সুর গাইতে শুরু করলেন কেন মণিময়দা। একি নীলকান্তবাবুকে নিন্দা করবার জের? আগে জানলে কে তাঁর কথা তুলে মণিময়দাকে চটাতে যেত?

শীতাংশু একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'সত্যি রাস্তাটা আমাদের খুবই খারাপ। খানা গর্তে ভরতি। এই বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে তবু কোনরকমে চলা যায়। আসুক আষাঢ় মাস তখন দেখবেন জলবৃষ্টিতে এ পথের কি হাল হয়। কাদা আর শুকোতে চায় না।'

সুনীল বলল, 'সত্যি, বর্ষার দিনেই সব চেয়ে কষ্ট বেশি। জুতো জামার আর কিছু থাকে না।'

মণিময় বলল, কষ্টটা যখন নিজেরা বোঝ হাত লাগাও না কেন।'

শীতাংশু বলল, 'আমরা হাত লাগিয়ে কি করব। একি কয়েকখানা হাতের কাজ? একবার আমরা ছেলেরা মিলে আমাদের এই নেতাজীনগরের সমুখ দিয়ে কিছু মাটি ফেলেছিলাম। কিন্তু বর্ষায় সব ধুয়ে গেছে।'

সুনীল বলল, শুধু বর্ষার দোষ দিয়ো না শীতাংশুদা। এই কাঁচা রাস্তাটা দিয়ে কি কম গাড়ি কম লরী চলাচল করে। ইট সুরকির লরী, কাঠ আর লোহা-লক্কড়ের লরী সব যায় এই পথ দিয়ে। অত লরীর ভার আমাদের কাঁচা রাস্তা সইতে পারবে কেন।'

মণিময় বলল, 'কোথায় যায় লরীগুলি?'

সুনীল আঙুল বাড়িয়ে দেখাল, 'কোথায় আবার। ওই কীর্তিনগরে? আগে ছিল কীর্তিপুর এখন আলাদা ক'রে নাম রাখা হয়েছে কীর্তিনগর যাতে আমাদের জবরদখল কলোনীগুলির সঙ্গে মিশে না যায় সেই জন্যেই এই চেষ্টা। ওখানে নিত্য নতুন পাকা বাড়ি উঠছে। কিছুদিন আগে একজন প্রফেসর এসে বাড়ি করলেন।'

শীতাংশু বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের কলেজেই তো পড়ান তিনি। ইংরেজীর প্রফেসর; এ বি এস। পুরো নাম অমিয়ভূষণ সেনগুপ্ত।'

নেতাজীনগর বীরনগর থেকে আধ মাইলখানেক দূরে বড় পাকা সড়ক পার হয়ে গাছপালার আড়ালে কীর্তিনগরের খানিকটা চোখে পড়ল মণিময়ের। সঙ্গে সঙ্গে সে নগরের একটি নাগরিকার নাম বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠল মনে। করুণা। করুণা এখন ওখানেই থাকে।

মুহূর্তের জন্যে বোধ হয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল মণিময়। শীতাংশুর ডাকে চমক ভাঙল, 'চলুন মণিময় দা; আমরা এসে পড়েছি। এই তো বীরনগর। এখানেই জিতেনদা—জিতেন বিশ্বাস মশাই থাকেন।'

ডান দিকে বীরনগর কলোনী। পাছে নামটা কেউ ভুলে যায়, কি কারো

চোখে না পড়ে তাই পাশাপাশি দুটো নারকেল গাছের সঙ্গে একখানি টিনের সাইনবোর্ড এঁটে কলোনীর নামটি বড বড় অক্ষবে লিখে রাখা হয়েছে। সেই গাছের পাশ দিয়ে শীতাংশুদেব পিছনে পিছনে কলোনীর মধ্যে ঢুকল মণিময়। প্রেসিডেণ্টেব বাড়ি ঠিক বাস্তাব পাশে নয়, আব একটু ভিতরের দিকে গিয়ে। কলোনীব মধ্যে নাবকেল তেঁতুল আব আমগাছেব অভাব নেই। উপনগর তো নয়, উপবন। আগে তাই-ই ছিল। জমিদাবদের ফলের বাগান আর বাগানবাড়ি। সেই সব পোড়োবাগান এবা জোব কবে দখল ক'বে বাড়ি তুলেছে। পথেব দুধারে সাবি সাবি ছোট ছোট ঘব। কাঁচা মাটির ভিত, কাঁচা বাঁশেব খুঁটি আব বেড়া। চালে হয় টালি, না হয় কবোগেটেড টিন। কিছু কিছু ছনেব ঘবও আছে। খাটো ধুতিপবা খালিগায়ে কয়েকজন অধিবাসীকে চোখে পড়ল। জন দুই অল্পবয়সী বউ মাথায় আঁচল টেনে পথ থেকে সরে গেল। কিন্তু বেড়াব আড়ালে গিয়ে খানিকটা ঘোমটা ফেব তুলে ফেলে মণিময়েব দিকে তাকিয়ে বইল। দীর্ঘকায় সুদর্শন এই পুরুষটি যে কলোনীর মানুষ নয়, তা বুঝতে তাদেব বাকি বইল না। একটি উঠানে তুলসীমঞ্চ চোখে পড়ল। দারুণ গ্রীষ্মে চাবা গাছটি শুকিয়ে গেছে। কিন্তু তাই বলে তাকে বাঁচাবাব চেষ্টাব ক্রটি নেই গৃহস্থেব। গাছেব দুপাশে কাঠি পুঁতে ছোট একটি ঘট ফুটো ক'বে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সেই ফুটোব মুখে ছনের কুচি। তুলসীতলায় জল পড়ছে চুইয়ে চুইয়ে। দেখবাব জন্যে একটুকাল থেমে থেমে দাঁড়াল মণিময়। মনে হ'ল যেন পূর্ববঙ্গেব আস্ত একখানি গ্রামকে মাথায় কবে এনে কেউ এই কলোনীব মধ্যে বসিয়ে দিয়েছে। না, ঠিক আস্ত গ্রাম বলা যায় না। গ্রামেব সেই সমৃদ্ধি নেই, স্বাচ্ছন্দ্য শান্তি নেই। কলোনীগুলিকে ঠিক গ্রাম বলা যায় না। গ্রামেব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। এখানকাব মানুষগুলিও বুঝি তাই। মানুষেব অণুপবমাণু। গ্রাম নয়, উপগ্রাম। কিন্তু কোন একটি কলোনীব নামই গ্রামেব সঙ্গে যুক্ত নয়। সব নগব। মহানগবের অধিবাসী না হ'লে কি হবে, ছোট একটু শহবেব সুখ-সুবিধাটুকু পর্যন্ত না থাকলে কি হবে, এবা কেউ আব নিজেদেব গ্রামবাসী বলতে রাজী নয়, সবাই

নাগরিক। কলোনীগুলিকে এরা নগরের নামে ডাকবে, নিজেদের বাসভূমিকে এরা নগরের ধাঁচে গড়বে, এই এদের স্বপ্ন, এই এদের প্রত্যাশা। যে গ্রাম এরা ছেড়ে এসেছে সেই গ্রামে আর ফিরে যাবে না। ঠিক অবিকল সেই গ্রাম আর তারা গড়ে তুলবে না।

আর একটু এগিয়ে যেতেই প্রেসিডেণ্ট জিতেন বিশ্বাসের বাড়িটি চোখে পড়ল। অবশ্য শীতাংশুই চিনিয়ে দিল মণিময়কে। বলল, 'ওই যে উঠানের ওপর তিনটি নারকেল গাছ দেখছেন, ওই বাড়ি। আমরা সংক্ষেপে বলি, তিননারকেলের বাড়ি। তিননারকেল আর এক তেঁতুল। ঘরের পিছনে কত বড় একটি ঝাপটানো তেঁতুল গাছ দেখেছেন? কেউ কেউ বলেছিল, গাছটা কেটে ফেলুন। অতবড় গাছ। বাড়ি অন্ধকার করে রেখেছে। কিন্তু জিতেনদা কিছুতেই কাটতে চাইলেন না। গাছের ওপর ওঁর ভারি মায়া।'

কথা শেষ করে শীতাংশু হাঁক দিল, 'জিতেনদা আছেন নাকি? ও জিতেনদা! আপনার সঙ্গে মণিময়বাবু দেখা কবতে এসেছেন।

সাড়া পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটি লোক বেরিয়ে এল। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। রোগা ছিপছিপে চেহারা। গায়ের রঙ বেশ ফর্সা। মাথায় একটু টাকের আভাস। গা-টা খোলাই ছিল। অপরিচিত লোককে সামনে দেখে কোঁচার খুঁট খুলে গায়ে একটু জড়িয়ে নিল জিতেন। তারপর স্মিতমুখে হাত জোড় করে বলল, 'নমস্কার। আসুন, ভিতরে আসুন।'

প্রেসিডেণ্ট কথার সঙ্গে একটি জাঁদরেল কালো মোটাসোটা মূর্তি কল্পনায় এসেছিল মণিময়ের। তার পরিবর্তে প্রায় সমবয়সী এবং সদৃশ আকৃতির এই মানুষটিকে দেখে মণিময়ের মন বেশ খুশী হয়ে উঠল। তার সাদরসম্ভাষণে স্মিতমুখে সাড়া দিয়ে বলল, 'চলুন।'

সারি সারি তিনটি নারকেল গাছের পিছনে টালির ঘর। তার সামনে ঢাকা বারান্দা। দুপাশে দুখানি তক্তপোশ পাতা। একটিতে মাদুর আছে, আর একটিতে নেই। এই বারান্দায় একই সঙ্গে সমিতির অফিস আর বৈঠকখানার কাজ চলে। পুবদিকের তক্তপোশে আরো কয়েকটি ছেলে একটু উত্তেজিতভাবে কিসব আলোচনা করছিল, মণিময়ের দলকে দেখে তারা চুপ করল, সরেও বসল খানিকটা।

জিতেন পশ্চিমদিকের তক্তপোশখানায় মণিময়কে বসবার অনুরোধ করে বলল, 'কি ব্যাপার বলুন তো। আপনি কাল নেতাজীনগরে এসেছেন আমি খবর পেয়েছি ; কিন্তু শরীরটা তেমন ভালো না থাকায় গিয়ে দেখা করতে পারিনি।'

শীতাংশু বলল, 'কাল বুঝি আপনার আবার হাঁপানির টান উঠেছিল জিতেনদা?'

সকলের সামনে বিশেষ করে অল্পপরিচিত মণিময়ের কাছে শীতাংশু তার রোগের কথাটা উল্লেখ করায় জিতেন খুব খুশী হল না। রোগটা যেন তার অগৌরব আর অপযশের ব্যাপার। সরাসরি প্রকাশ করবার মত বিষয় নয়। জিতেন প্রতিবাদের স্বরে বলল, 'না না, সে সব কিছু না। হাঁপানীর দোষ আমার আজকাল আর নেই। তবে অনিয়ম-টনিয়ম হলে শরীরটা একটু খারাপ হয়। যাকগে, কি ব্যাপার বলুন।'

ভূমিকা বাড়াবার ইচ্ছা মণিময়েরও নেই। তার এখনো আশা প্রভাতদার ছেলের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ রাখতে যাবে। না গেলে তিনিও ক্ষুণ্ন হবেন, মণিময়ও পুরোন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।

মণিময় বলল, 'ব্যাপারটা এই ছেলেদেরই। পাড়ায় পাড়ায় এক একটি করে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সব আয়োজন হচ্ছে। আমি তা শুনে বললাম, তোমরা একসঙ্গে মিলেমিশে যদি কর, জিনিসটা ভালো হয়।'

জিতেন বলল, 'সে তো সত্যি কথা। এতে কার কি আপত্তি থাকতে পারে।'

পূবদিকের তক্তপোশে যে কয়েকটি ছেলে বসেছিল, তাদের ভিতর থেকে একজন বলে উঠল, 'আমাদের আপত্তি আছে জিতেনদা। এর আগেও একবার নেতাজীনগরের সঙ্গে আমরা মিশতে গিয়েছিলাম। খুব শিক্ষা হয়ে গেছে আমাদের।'

বছর পনের-ষোল হবে ছেলেটির বয়স। গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। কালো রোগাটে চেহারা। তার কথার ভঙ্গি দেখে মণিময় কৌতুক বোধ করল। মৃদু হেসে বলল, 'কি শিক্ষা হয়েছে ভাই?'

ছেলেটি মণিময়ের কথার কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল। বেশ বোঝা গেল, মণিময়ের এই হস্তক্ষেপ সে পছন্দ করে নি। তাছাড়া মণিময় যে তাকে পরিহাস করছে, সেকথাও তার বুঝতে বাকি নেই।

জিতেন ছেলেটির দিকে চেয়ে বলল, 'ভন্টু, এ কি! ফার্স্ট ক্লাসে পড়ছ, সাধারণ একটা ভদ্রতা-জ্ঞান নেই তোমার? ওঁর কথার জবাব দাও।'

ভন্টু মণিময়ের দিকে চেয়ে বলল, 'কি আর জবাব দেব। ওই নিশীথদা, শীতাংশুদাকে জিজ্ঞাসা করুন। তারাই সব বলুক। বুকের পাটা থাকলে মিথ্যে কথা নিশ্চয়ই বলবে না আপনার কাছে।'

জিতেন তাকে আর একবার শিষ্টা-চারের কথা স্মরণ করিয়ে দিল, 'ছিঃ ভন্টু, ওইভাবে কি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে?'

শীতাংশু একটু হেসে বলল, 'গতবার ভন্টুর বোন মিণ্টুর একটি গান গাওয়ার কথা ছিল, আর ওর ভাই রণ্টু 'বীরপুরুষ' কবিতাটি আবৃত্তি করবে ঠিক ছিল। কিন্তু প্রোগ্রাম লেংদি হয়ে যাওয়ায় সভাপতি আপত্তি করতে লাগলেন। তাই প্রায় আধাআধি আইটেম বাদ দিতে হল। সেইজন্যেই ভন্টুর রাগ আমাদের ওপর।'

ভন্টু প্রতিবাদ করে উঠল, 'হুঁ, কই সভাপতি আপত্তি করলেন বলে আপনাদের লম্বা লম্বা প্রবন্ধ পাঠ, আপনাদের ভাইবোনদের গান আর আবৃত্তি

তো বাদ পড়ল না। বাদ গেল কেবল মিণ্টুর গান।' বলতে বলতে ভণ্টু মণিময়ের দিকে ফিরে তাকাল, 'জানেন, আমার ভাই বোন গান আবৃত্তি করবে বলে আমি নিজে কিছু করলাম না। নইলে আমারও তো ভালো তৈরি ছিল 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' আর 'এবার ফিরাও মোরে'। কিন্তু ভাবলাম, আমি তো স্কুলেই চান্স পাই। কলোনীর ফাংশনে রণ্টু মিণ্টুই করুক। কত কষ্ট করে ওদের শেখালাম। মিণ্টুটা টাইফয়েড থেকে উঠেছে। চুল উঠে যাওয়ায় মা মাথা ন্যাড়া করে দিয়েছে। তবু তার গাওয়ার খুব ইচ্ছে। কেবলই বলে, দাদা, আমি যদি ভালো করে গাইতে পারি তবু কি ন্যাড়া মাথা দেখে লোকে ঠাট্টা করবে?'

জিতেন বাধা দিয়ে বলল, 'যাক যাক, ওসব যেতে দাও। গত বছরের ব্যাপার তো হয়েই গেছে। গতস্য শোচনা নাস্তি।'

কিন্তু মণিময় সহানুভূতিমেশানো স্বরে বলল, 'না না, তুমি বল ভণ্টু, শুনি ব্যাপারটা। তার পর?'

ভণ্টু বলতে লাগল, 'আমি তাকে বললাম, লোকে তো তোর মাথা দেখতে যাবে না, গান শুনতেই যাবে। তুই ভাল করে তোর গানটা তৈরি কর। চমৎকার হবে। ছ' সপ্তাহ ধরে রিহার্সাল দিল মেয়েটা। ওই কীর্তিনগর কলোনীর একটি বউয়ের কাছে গিয়ে কত কষ্ট ক'রে, হাতে পায়ে ধরে গানটা তুলেছিল। তার কত আশা, কত সাধ। মার সেদিন জ্বর। মাথার যন্ত্রণায় উঠতে পারে না বিছানা থেকে। তবু নিজের হাতে ওকে শাড়ি পরিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে দিল। মিণ্টু আর রণ্টু গিয়ে বসে রইল প্যাণ্ডেলের পিছনে। এই বুঝি ডাক আসে, এই বুঝি মাইকে ওদের নাম এনাউন্স করা হয়। কিন্তু ওদের নাম কিছুতেই আর ডাকা হল না।'

মণিময় বলিল, 'সত্যি, ব্যাপারটা ভারি দুঃখেরই হয়েছে।'

ভণ্টু বলল, 'সেই থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, ওসব সর্বজনীন টর্বজনীনের মধ্যে আর যাব না। এ বছর আমরা বীরনগর কলোনীতে আলাদা করে রবীন্দ্রজয়ন্তী করব। বাইরে থেকে কাউকে না আনতে পারি আমাদের

জিতেনদাই সভাপতি হবেন। কোন নামকরা আর্টিস্টেরও ধার ধারবো না। কিন্তু আমাদের কলোনীতে গান-গাইতে-জানা যত অল্পবয়সী মেয়ে আছে তাদের প্রত্যেকের মুখে একটি করে গান আর যত ছেলে আছে তাদের প্রত্যেককে একটি ক'রে কবিতা আবৃত্তির সুযোগ আমরা দেবই। শেষরাত অবধি আমরা ফাংশন চালাব। কোন্ সভাপতি এসে বাধা দেয় দেখব আমরা।'

মণিময় তক্তপোশ থেকে উঠে এসে ভন্টুর পিঠে হাত রেখে বলল, 'নিশ্চয়ই! এইতো চাই ভন্টু। তোমার মত কয়েকজন ছেলে যদি জোটে, এখানে সব হবে।'

ভন্টু ঘাড় ফিরিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'আপনি ঠাট্টা করছেন?'

মণিময় বলল, 'না ভন্টু, ঠাট্টা করছি নে, আমি তোমার প্রশংসাই করছি। এই ধরনের রোখ না থাকলে কোন কাজ করা যায় না।'

শীতাংশুদের দল মণিময়ের কাণ্ড দেখে একটু বিস্মিত হ'ল। ভন্টুকে অবশ্য দলে তারা টানতে চায়, কিন্তু তাই বলে অত বেশি আস্কারা দেওয়া কি উচিত?

জিতেন মণিময়ের দিকে চেয়ে বলল, 'দেখুন, এইসব নিয়েই গোলমাল বাধে। সবাই চান্স পেতে চায়, সবাই একাজিকিউটিবের ভিতরে আসতে চায়, প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারীর পদের দিকে অনেকেরই লোভ। আমি শেষে ভেবেছি, কি দরকার এই নিয়ে বাদ-বিসংবাদ করে, তার চেয়ে আলাদা আলাদা ফাংশন ক'রে ওরা যদি খুশী হয় হোক, তাছাড়া এসব ছেলে-ছোকরাদের ব্যাপার নিয়ে আমাদের অত মাথা ঘামাতে যাওয়ার কি দরকার।'

মণিময় মাথা নেড়ে বলল, 'আপনার কথা আমি মানতে পারলাম না জিতেনবাবু। আমরা যদি মাথা না ঘামাই ওরা যে মাথা ফাটাফাটি করবে। তাছাড়া, ঝগড়া-ঝাটি হবে সেই ভয়ে ওদের আমরা আলাদা করে দিতে পারিনে। তাহলে তো এক একজন মানুষকে নিয়ে এক একটি দল গড়তে হয়।'

জিতেন বলল, 'তা ঠিক। আমাদের এই কলোনীর ইউনিটি নষ্ট হোক আমিও চাইনে। ছেলেদের ঝগড়া তো শুধু ছেলেদের মধ্যেই থাকে না, বাপ খুড়োদের মধ্যে চলে যায়। ওদের একজোট করতে পারলে আমাদেরই লাভ।'

মণিময় বলল, 'তাহলে আসুন, একবার চেষ্টা করা যাক।'

আস্তে আস্তে আলাপ জমে উঠল, আলোচনা চলতে লাগল। এক ফাঁকে জিতেনের আট ন' বছরের একটি মেয়ে চায়ের কাপ আর দুটি মুড়ির মোয়া নিয়ে এল ছোট একখানি রেকাবিতে করে।

মণিময় আপত্তি ক'রে বলল, 'এসব কি বলুন তো।'

জিতেন হেসে বলল, 'যা দেখছেন তাই। এক কাপ চা আর দুটি মোয়া। তার চেয়ে এক বিন্দুও বেশি কিছু নয়।'

একটি মোয়া জিতেনের মেয়েটিকে জোর করে গছিয়ে দিল মণিময়। বলল, 'তুমি না খেলে আমি কিছুতেই খাব না।'

স্থির হ'ল, বীরনগর, নেতাজীনগর আর বাপুজীনগর—এই তিনটি কলোনীর বাসিন্দারা মিলে এক সঙ্গে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব করবে এবার। কমিটিতে তিনটি কলোনীর লোকই থাকবে। তিনটি কলোনীর যোগ্য ছেলেমেয়েরাই গান আর আবৃত্তির প্রোগ্রাম পাবে। যদি সম্ভব হয় একটি নাটকের অভিনয়ও করানো হবে ছেলেমেয়েদের দিয়ে। দু'জন নামকরা সাহিত্যিককে কলকাতা থেকে নিয়ে আসবে মণিময়। একজন সভাপতি আর একজন প্রধান অতিথি। রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়ে যারা নাম করেছেন শহরে তাঁদেরও দু'একজনকে আনবার চেষ্টা করবে। তবে অনুষ্ঠানটা পঁচিশে বৈশাখ না ক'রে সপ্তাহখানেক পিছিয়ে দিলে ভালো হয়। না হ'লে খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের হয়তো কাউকে পাওয়া যাবে না। তাঁরা কলকাতার এবং অন্যান্য জায়গার বড় বড় অনুষ্ঠানগুলিতে নিশ্চয়ই এতদিনে কথা দিয়ে বসে আছেন।

অনুষ্ঠানের তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবে কয়েকটি ছেলে নিরুৎসাহ

হয়ে পড়ল। কিন্তু শীতাংশুরা বলল, 'কয়েকদিন দেরি ক'রে করলে যদি ফাংশনটা ভালো হয়, তাতে ক্ষতি কি। আমাদেরও তো তৈরি হ'তে সময় লাগবে। এখন পর্যন্ত একটি পয়সা চাঁদা আদায় হয়নি।'

আপাতত একটি অস্থায়ী কমিটি গঠন করা হল। প্রেসিডেণ্ট জিতেন আর সেক্রেটারী মণিময়। সে প্রথমে আপত্তি ক'রে বলল, 'আমি তো বাইরের লোক, তোমরা নিজেরা কেউ এ ভার নাও।'

শীতাংশু বলল, 'আপনাকে এখন আর আমরা বাইরের লোক বলে ভাবিনে। আপনি আমাদের ভিতরের মানুষ। এড়াতে চাইলেও আপনাকে আমরা কিছুতেই ছেড়ে দেব না।'

মণিময় হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, 'বেশ, আমার নামটা যদি রাখতেই চাও রাখো, কাজ কিন্তু তোমাদেরই করতে হবে।'

সুনীল বলল, 'আচ্ছা, সে দেখা যাবে।'

কমিটির সদস্য তালিকায় ভণ্টুর নামটাও রাখল মণিময়।

ভণ্টু লজ্জিত হয়ে বলল, 'না না, আমাকে কেন ধরছেন, আমাকে বাদ দিন, আমি এমনই সব কাজকর্ম করব।'

মণিময় হেসে বলল, 'আমরা তো কাজের লোকদের নামের লিস্টই করছি। অকেজো মানুষকে তো ডাকছিনে। তোমাকে থাকতেই হবে ভণ্টু। তুমি না থাকলে আমিও থাকব না।'

মেম্বারদের মধ্যে অল্পবয়সী ছেলেদের সংখ্যাই বেশি। ভণ্টুর বয়স তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম। জিতেন বিশ্বাস মণিময়ের কাণ্ড দেখে মনে মনে ভাবল, বয়স বাড়লেও অনেকে প্রবীণ হয় না। বয়স্কদের সঙ্গে মিশে সুবিধা পায় না। ছেলেছোকরাদের নিয়ে সময় কাটাতেই ভালবাসে বেশি। মণিময়ও নিশ্চয়ই সেই দলের। যতক্ষণ ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে, এ ধরনের বুড়ো শিশু ভোলানাথকে প্রশ্রয় দিয়ে বিনা খরচে মজা পাওয়া যায়।

মণিময় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'একটা কথা। আপনারা এই কীর্তিপুর কলোনীর লোকদের ডাকছেন না কেন? তাহ'লে তো দলটা আরো ভারি হয়।

জিতেন হাতজোড় ক'রে বলল, 'মাফ করবেন, ওইটে হবে না মশাই, ওইটে পারব না। ওইসব হাই-ব্রাউ উঁচকপালে লোকদের গিয়ে সাধাসাধি করতে পারব না। তাতে জয়ন্তী হয় হবে, না হয় না হবে।'

শীতাংশুও সায় দিয়ে বলল, 'ওদের সঙ্গে আমাদের মিশ খায় না মণিময়দা। আমরা অনেক এগোবার চেষ্টা ক'রে দেখেছি, ওঁরা মিশতে চান না, ওঁরা পিছিয়ে যান।'

মণিময় হেসে বলল, 'ব্যাপার কি? মাত্র একটি রাস্তার এপার-ওপার। কিন্তু তোমাদেব কথাবার্তা শুনে মনে হয় কীর্তিপুরের সঙ্গে তোমাদের যেন সাত সমুদ্দুরেব ব্যবধান।'

জিতেন বিশ্বাস বলল, 'তার চেয়েও বেশি।'

তারপর আস্তে আস্তে সবাই মিলে ব্যবধানের কারণটা ধরনটা বলতে লাগল।

কীর্তিপুব কলোনী জবরদখল কলোনী নয়। ওখানকার বাসিন্দারা কাঠা প্রতি পাঁচ সাত শ' টাকা দিয়ে জমি কিনে পাকা বাড়ি তুলেছে। ওখানে সবাই মোটামুটি অবস্থাপন্ন, সচ্ছল, শিক্ষিত। বীরনগর, নেতাজী-নগরের লোকদের মত দরিদ্র আর হাড়হাভাতে নয়। এই বৈষম্যের কথাটা কীর্তিনগরের লোকেরা সব সময় মনে রাখে। ওদের কলোনীর চারদিকে উঁচু পাকা দেয়াল, গেটের কাছে জমিদারের বন্দুকধারী দারোয়ান। প্রভাকর দত্তগুপ্ত যদিও ঠিক জমিদার নয়, তবুও সাধারণ লোকে তাঁকে জমিদার বলেই জানে, জমিদার বলেই ডাকে। কিন্তু জিতেন আর শীতাংশুরা জানে তাঁর যথার্থ স্বরূপ। প্রভাকর দত্তগুপ্ত কীর্তিপুব কোঅপারেটিভের চেয়ারম্যান। দত্তগুপ্ত এণ্ড সন্স নামে একটি ফার্ম আছে পোলক স্ট্রীটে। ইঞ্জিনীয়ার আর কনট্রাক্টর। ফার্মের অস্তিত্ব আগে অবশ্য কেউ জানত না। জেনেছে এই কীর্তিপুব কলোনী হওয়ার পর। দূরদৃষ্টি ছিল প্রভাকরবাবুর একথা স্বীকার করতেই হবে। পার্টিশন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিঘা চল্লিশেক পোড়ো জংলা জমি তিনি প্রায় জলের দরে কিনে নিয়েছিলেন। অবশ্য একা

কেনেননি, আরো দু' তিনজন বন্ধু ছিলেন সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত তাঁদের শেয়ার প্রভাকরবাবু কিনে রেখেছেন। বন্ধুরা ভেবেছেন, পুরোন বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ, মামলা-মোকদ্দমা করার চেয়ে আগে ভাগে সরে পড়াই ভালো। প্রভাকর জলের দরে জমি কিনে সোনার দরে বিক্রি করেছেন। প্রতি বিঘায় হাজার দশেক টাকা লাভ করেছেন অন্তত। বিঘা হিসাবে নয়, কাঠা হিসাবে বেচেছেন। শুধু জমি বিক্রি করেই যে লাভ করেছেন তাই নয়, বেশির ভাগ বাসিন্দার বাড়িও তাঁরই তুলে দেওয়া। ইট কাঠ সুরকি লোহা লক্কড় প্রত্যেকটি জিনিসে লাভ করেছেন প্রভাকর। কলোনীর মধ্যে নিজে বিঘা পাঁচেক জমি নিয়ে বাড়ি করেছেন। বড় দোতলা বাড়ি উঠেছে তাঁর। কলকাতায়ও জায়গা কিনেছেন। সেখানে বাড়ি তৈরি হচ্ছে। বড় ছেলে মৃগাঙ্ককে বিলাত ঘুরিয়ে এনেছেন। সে এখন নিজেদের ফার্মই দেখাশোনা করে। গাড়ি আছে নিজেদের। বাপ ছেলে একই সঙ্গে তাতে বেরোন।) এই উদ্বাস্তু কলোনীগুলির ওপরও প্রভাকরবাবুর লোভ আছে। দু'একটা কলোনী যদি কিনে নিতে পারেন তার সুবিধে হয়। এই নিয়ে জমিদারদের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁর আলাপ-আলোচনা চলে। মামলা-মোকদ্দমাও চলছে প্রত্যেকটি কলোনীর বাসিন্দাদের নামে। অনধিকার প্রবেশের মামলা। কিন্তু না জমিদার, না পুঁজিদার, কেউ এই কলোনীগুলির ওপর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি।

এই জন্যেই জবরদখলকারী উদ্বাস্তুদের সঙ্গে প্রভাকরবাবুর ঠিক প্রীতির সম্পর্ক নেই। আর কীর্তিপুর কলোনীর যাঁরা অভিজাত বাসিন্দা তাঁরা যদিও প্রভাকরবাবুর ওপর অপ্রসন্ন, তবু কলোনীর লোকজনদের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে উৎসুক নন। শিক্ষায় দীক্ষায় আর্থিক অবস্থায় তাঁরা অনেক কুলীন। তাঁরা জবরদখল কলোনীর বাসিন্দাদের সংসর্গ সভয়ে এড়িয়ে চলেন। কারণ তাঁদের ছেলেমেয়েরা এদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশলে উপকৃত হবে না, বরং অপকারের আশঙ্কা আছে। কলোনীতে যারা থাকে তারা সবাই সাধু নয়, তা বলাই বাহুল্য। নানারকম ফন্দি করে অনেককেই অন্ন জোটাতে

হয়। সিঁদেল চোর না থাকলেও পকেটমার যে শতকরা দুএকটি নেই তা বলা যায় না। কিন্তু কীর্তিপুরের ধারণা, এদের মধ্যে শুধু পকেটকাটা নয়, গলাকাটার দলও কম নেই। আলাপ-পরিচয় করতে গেলে এরা হয় ধার চাইবে, না হয় চাকরি চাইবে কিংবা অন্য কোন সুবিধা সুযোগের জন্যে ঘোরাফেরা শুরু করবে। তাই এই ধড়িবাজ কোম্পানীর ছায়া যত কম মাড়ানো যায় ততই ভাল। যারা জোর করে পরের জমি দখল ক'রে বাস করতে পারে, তারা না পারে কি?

কীর্তিপুরের এই মনোবৃত্তির কথা জানতে পেরে বীরনগর, নেতাজীনগর এবং আশেপাশের আরো অনেক উদ্বাস্তু নগরের লোকজন এইসব বড়লোকদের কাছে ঘেঁষে না। বিয়েতে শ্রাদ্ধে অন্নপ্রাশনে কি অন্য কোন উৎসব-অনুষ্ঠানে ডাকতে যায় না। তবে কি কীর্তিপুরে ভালো লোক, হৃদয়বান্ লোক কেউ নেই? আছে বইকি। তবে কি তাঁদের কারো সঙ্গেই উদ্বাস্তু কলোনীর কোন কোন লোকের ব্যক্তিগত আলাপ-পরিচয় হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি? উঠেছে বইকি। তেমন দু' চারটি পরিবার কীর্তিপুরেও আছে। যেমন অধ্যাপক অমিয়ভূষণ। তিনি নতুন এসেছেন কীর্তিনগরে। কিন্তু অনেক পুরোন বাসিন্দার চেয়ে উদ্বাস্তু কলোনীর লোকেরা তাঁকে বেশি চেনে। বাসে যেতে যেতে তিনি সহযাত্রীদের সঙ্গে নিজে থেকেই যেচে আলাপ করেন। তাদের সুখ-দুঃখ সুবিধা-অসুবিধার কথা জিজ্ঞাসা করেন। সবই যে 'বড়লোকী' কৌতূহল তা বলা যায় না। কারণ তাঁর কথাবার্তায় হৃদয়ের উত্তাপ অনুভব করা যায়। উদ্বাস্তু কলোনীতে তাঁদের কলেজের দু' তিনটি ছাত্রও আছে। শীতাংশু দত্তও ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ইংরেজী পড়েছে ওঁর কাছে। বি এস-সি'তে ইংরেজী আর পড়তে হয় না। কিন্তু তাই বলে এই দু' বছরে অমিয়ভূষণ শীতাংশুকে ভুলে যাননি। নামটা মনে না আনতে পারলেও মুখ ঠিক মনে রেখেছেন এবং চা খাওয়ার জন্যে একদিন নিমন্ত্রণও করেছেন বাড়ীতে। শীতাংশু গিয়েছিল সেখানে। অমিয়বাবুর ছেলেমেয়েরা অবশ্য তেমন সামাজিক নয়। তবে ছেলে খুব ভালো সেতারী। নিজের

গান-বাজনা নিয়েই আছে। মেয়েও উচ্চশিক্ষিতা। তাছাড়া, চমৎকার রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারে। শীতাংশু ভেবেছে, জয়ন্তী উৎসবে তারা এই অধ্যাপক পরিবারটিকে নিমন্ত্রণ করবে। তাঁদের শুধু যে দর্শক হিসাবে আসতে বলবে তাই নয়, শিল্পী হিসাবেই আমন্ত্রণ জানাবে। কমলাক্ষবাবু বাজাবেন, এনাক্ষী দেবী গাইবেন। অমিয়বাবু অধ্যাপক মানুষ। অনুরোধ করলে অবশ্যই বক্তৃতা করবেন। তাছাড়া, আরো একজন বিদুষী মহিলা আছেন ওবাড়িতে। না, অমিয়বাবুর স্ত্রী নন তিনি, বোন। শ্যামবাজার স্কুলে টিচারি করেন। তাঁর সঙ্গেও শীতাংশুর আলাপ হয়েছে। চমৎকার মহিলা। সত্যিই ভদ্র। তাঁকে শীতাংশু অনুরোধ করবে রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাসের নারীচরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলতে। যদি মুখে বলতে অসুবিধা হয়, তিনি না হয় লিখেই আনবেন। এম. এ. পাশ যখন করেছেন, নিশ্চয়ই ছোট-খাট রকমের প্রবন্ধ লেখা তাঁর অভ্যাস আছে।

শীতাংশু তার কথার শেষে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'অমিয়বাবু যদি সপরিবারে আমাদের ফাংশনে সত্যিই যোগ দেন তাহলে বাইরের আর কাউকে না পেলেও আমাদের চলবে মশমশিয়ে।'

এতটা উচ্ছ্বাস ভালো লাগল না জিতেন বিশ্বাসের। সে একটু ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, 'কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ শীতাংশু, অমিয়বাবুরাই এখানে বাইরের লোক। আমরাই বা অত সাধাসাধি, অত আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ করতে যাব কেন তাঁদের? তারপর দিন যাবে ওই কীর্তিপুরের লোকেরাই বলবে, আমরা গেলাম তবে তোমাদের ফাংশন হ'ল। খরচ করব আমরা, খেটে মরবে আমাদের এইসব কলোনীর ছেলেরা, অথচ নাম কিনবেন, হাততালি পাবেন তোমাদের ওই অমিয়বাবুর দল। কলকাতা থেকে যদি ভালো আর্টিস্ট না আনতে পার, নাই বা পারলে, তবু ওই কীর্তিপুরে গিয়ে কাজ নেই। ভণ্টু যা বলেছে তাই হবে। এখানকার ছেলেমেয়েরাই সন্ধ্যা থেকে সারারাত গান আবৃত্তি বক্তৃতা চালাবে। কিন্তু ধার করবার জন্যে আমরা কিছুতেই কীর্তিপুরে যাব না।'

শীতাংশু বলল, 'তাতে দোষ কি জিতেনদা? আর্টের কি জাত আছে? আর্টিস্টের কি জাত আছে?'

জিতেন বলল, 'ওসব বড় বড় বুলি রাখ। জাত আর্টিস্টদের কথা জানিনে, কিন্তু ক্ষুদে আর্টিস্টদের জাতের গুমরই তো সবচেয়ে বেশি। আমার কথা হল এই, কীর্তিপুরের মানুষ আমাদের সঙ্গে যখন কোন সামাজিক সম্বন্ধ রাখতে চায় না, তখন আমরাই বা আগ বাড়িয়ে তাদের ডাকতে যাব কেন? এতকাল যদি ওদের ছাড়া আমাদের চলতে পেরে থাকে, এবারকার রবীন্দ্র-জয়ন্তীতেও চলবে। অমিয়বাবু তোমার প্রফেসর। বেশ, তাঁর সঙ্গে তুমি নিজে গিয়ে দেখা-সাক্ষাৎ কর, নিজের বাড়িতে ডেকে এনে চা খাওয়াও ভালো কথা। কিন্তু সামাজিক নিমন্ত্রণ তাঁকে আমরা করতে পারিনে। তাহলে কীর্তিপুরের যে সব পরিবারের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে, কি ওই সুনীলের জানাশোনা আছে তাদেরও তো বলতে হয়।'

শীতাংশু রাগ ক'রে বলল, 'বেশ তো, বলুন না। বাধা দিচ্ছে কে?'

জিতেন জেদের সঙ্গে বলল, 'না, বাধা না দিলেও আমরা তা বলব না।'

শীতাংশু উদ্ধতভাবে বলল, 'বেশ, তাহলে আমি আর নেই এ সবের মধ্যে।'

এই ব্যাপার নিয়ে আবার ছাড়াছাড়ি দলাদলি হয়ে যায় আর কি। মণিময় ফের মীমাংসার জন্যে এগিয়ে এল। সে হেসে বলল, 'আচ্ছা, অমিয়বাবুদের সম্বন্ধে আমরা পরে বিবেচনা করব। এখনও তো তার যথেষ্ট সময় আছে। তাছাড়া, বললেও যে অমিয়বাবুরা আসবেন আমার তো মনে হয় না। কাদের নিমন্ত্রণ করব, না করব, সে-সব পরে ভাবব আমরা। তার আগে আমাদের অনেক কাজ করবার আছে। চাঁদা তোলা, প্যাণ্ডেলের জন্যে জায়গা ঠিক করা—বহু কাজ রয়েছে।'

জিতেন হাত জোড় ক'রে বলল, 'আজ থাক মণিময়বাবু, ওসব আলোচনার জন্যে আমরা ফের আর একদিন বসব। আজ বড়ই বেলা হয়ে গেছে। আমাকে আবার খেয়ে দেয়ে বেরোতে হবে।'

এতক্ষণে মণিময়ের খেয়াল হ'ল তাঁকেও নিমন্ত্রণ রাখতে যেতে হবে। সে সময়ও পার হয়ে গেছে প্রায়। কিন্তু ওঠবার আগে মণিময় তাড়াতাড়ি বলল. আর একটা কথা। আর এক মিনিট জিতেনবাবু।'

জিতেন বলল, 'বলুন।'

মণিময় বলল, 'আসতে আসতে কথাটা আমি এই শীতাংশু আর সুনীলদেরও বলেছিলাম। আপনাদের এই রাস্তাটার কথা।'

জিতেন বলল, 'তাই কি ?'

এতগুলি কলোনীর সর্বসাধারণের ব্যবহারের পথটির অব্যবহার্যতা সম্বন্ধে মণিময় ফের ছোটখাট একটি বক্তৃতা দিল। পদে পদে হোঁচট খেতে হয়, খানায় গর্তে পড়তে হয়, বর্ষাকালে কাদাজল ভাঙতে ভাঙতে পা পচে যাওয়ার জো হয়, অসুবিধাটা সবাই অনুভব করে, কিন্তু কেউ এই রাস্তাটির সংস্কারের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি দেয় না—একথা বলে মণিময় কলোনীবাসীদের বিরুদ্ধে একটু অনুযোগ করল। সেই সঙ্গে জিতেনকে খুশি করতে হবে একথাও ভুলে গেল না। মণিময় অবশেষে বলল, 'আপনারা এখানকার নেতৃস্থানীয়. আপনারা যদি এসব কাজে এগিয়ে না আসেন কে এগোবে ?'

জিতেন বলল, 'এগিয়ে কি করব বলুন ? এ কি দু' চারজনের কাজ ? না কি দু' চার টাকার কাজ ? তাছাড়া, আমাদের তো মশাই পথের ওপরই বাস। পথের কথা আলাদা ক'রে ভাবব কি, ঘরই আমাদের পথ। জবরদখল কলোনীগুলি গভর্নমেন্ট স্বীকার করে নেবে কিনা, নিলেও কবে নেবে, তার কিছু ঠিক নেই। এই আনসার্টেন অবস্থার মধ্যে নিজেদের ঘরদোরই মানুষ ভালো ক'রে বাঁধেনি, আর পথ বাঁধবে।'

মণিময় বলল, 'কিন্তু ঘর যেমন দরকারী, পথটাও তো তেমনি দরকারী। ঘরে আর কতক্ষণ থাকতে পারেন বলুন, এই পথ দিয়েই তো বেরুতে হয়, ফিরতে হয়। মেয়েছেলে নিয়ে ওই রাস্তা দিয়েই চলাফেরা করেন।'

জিতেন বলল, 'ও রাস্তায় মেয়েদের অবশ্য বেশি বেরোবার দরকার হয় না। তবে হ্যাঁ, কোন কোন বাড়ির মেয়ে চলাচল করে বটে।'

মালার কথাটা মনে পড়ে গেল জিতেনের। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল মুখ। মালা ঐ পথ দিয়ে যাতায়াত করে বটে। তার সকাল নেই, দুপুর নেই; সন্ধ্যা নেই, রাতদুপুর নেই। সে হয় বেরোয়, না হয় ঢোকে। জিতেন খোঁজ নিয়ে দেখেছে মেয়েটি হাসপাতালে নার্সের কাজ করে, একথা মিথ্যা নয়। কিন্তু তারপর আর কি করে না করে ভগবান জানেন। তার চলাফেরা অনেকের চোখেই আপত্তিকর লেগেছে, রহস্যময় মনে হয়েছে জিতেনের কাছেও। সিফ্‌ট ডিউটি থাকলে চাকরির সময় ঠিক থাকে না, সেকথা ঠিক। কিন্তু তাই বলে কি অন্ধকার রাত্রে একজন সঙ্গী নিয়ে হাসিগল্প করতে করতে যেতে হবে? মণিময়ের সঙ্গে ওই নার্স মেয়েটির একটু বেশিরকম ঘেঁষাঘেঁষিটা অনেকেরই চোখে লেগেছে। নেতাজীনগরের একটি ঘরের ওপর অতিরিক্ত মাত্রায় আকর্ষণ আছে বলেই কি মণিময় অত পথ পথ করছে? ওই পথটা বিশেষ একটি বাড়ির সমুখ দিয়ে গেছে বলেই কি সে তাকে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখতে চায়?

মণিময় জিতেনকে নীরব আর অন্যমনস্ক দেখে বলল, 'আপনি কি ভাবছেন জিতেনবাবু? কোন কোন বাড়ি কেন, আমি তো দেখছি সব বাড়ির মেয়েদের ওইটাই বেরোবার রাস্তা। সব বাড়ির মেয়েদের বেরোতে হয় না একথা ঠিক। কিন্তু সব বাড়ির কচি কাচ ছেলেমেয়েরা তো ওই রাস্তা দিয়েই স্কুলে যায়, বাজারে যায়। বিপদ আপদ হ'তে বেশি সময় লাগে না।'

জিতেন বলল, 'সেকথা ঠিক মণিময়বাবু। বিপদ-আপদ সম্বন্ধে আমাদের সবারই সাবধান হওয়া উচিত।'

মণিময় বলল, 'তাহলে আসুন কিছু একটা করা যাক।'

জিতেন বলল, 'কি করতে চান বলুন?'

মণিময় বলল, 'প্রথমে আসুন একটা কমিটির মত করি।'

জিতেন হেসে বলল, 'বেশ বেশ। কি নাম দেবেন বলুন তো? রয়াল রোড কমিটি?'

মণিময় বলল, 'ধরুন তাই না হয় নাম দেওয়া গেল। এ কমিটিরও আপনিই প্রেসিডেণ্ট থাকবেন।'

জিতেন ফের হাত জোড় করল, 'মাফ করবেন। এই কলোনী কমিটির প্রেসিডেণ্ট আছি তাতেই রক্ষা নেই। আর ঝামেলা বাড়াতে চাইনে সংসার আছে, চাকরি-বাকরি আছে। কলকাতার একটা প্রেসের দেখাশোনা করি। নামেই ম্যানেজার। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই দেখতে হয়। আপনাদের তো ঝক্কি-ঝামেলা কম। আপনারা করুন।'

মণিময় বলল, 'বেশ, আপনি প্রেসিডেণ্ট না থাকতে চান কমিটির মধ্যে মেম্বার হিসাবে আসুন, তাতেও সবাই উৎসাহ পাবে।'

জিতেন বলল, 'এখন থাক। আমার সময় বড় কম।'

মণিময় এবার গম্ভীর মুখে উঠে পড়ল। জিতেনের কাছে বিদায় নিয়ে বলল, 'আচ্ছা, নমস্কার।'

বীরনগর কলোনী ছাড়িয়ে তারা আবার পথে নামল। সঙ্কীর্ণ অসমান, খানাখন্দ-ভরা সেই পথ। উত্তরে দক্ষিণে দুদিকেই যেতে যেতে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে।

শীতাংশু বলল, 'পথের কথাটা ওঁর কাছে পাড়াই আপনার উচিত হয়নি। আচ্ছা, জিতেন বিশ্বাসই তো কলোনীগুলির একমাত্র হর্তাকর্তা নয়। ওঁকে বাদ দিয়েও আমরা চলতে পারব। রবীন্দ্র-জয়ন্তীর ব্যাপারটা মিটে যাক। তারপর রোড কমিটির কথা আমরা আর একদিন ভেবে দেখব।'

'আবার আর একদিন কেন শীতাংশুদা। আজই তো ভেবে দেখা যায়। আসুন মণিময়দা, এই রাস্তায় দাঁড়িয়েই রোড কমিটি আজ আমরা ফর্ম করে ফেলি।'

'সবাই অবাক হয়ে পিছন ফিরে তাকাল। দেখল ভণ্টু। বীরনগরের প্রতিনিধি হিসাবে একমাত্র সেই তাদের এতদূর অবধি এগিয়ে দিতে এসেছে।

এই শ্যামবর্ণ কিশোরবয়সী ছেলেটির দিকে তাকিয়ে মণিময় ফের খুব খুশী হয়ে উঠল। তাকে কাছে ডেকে হাত রাখল তার কাঁধে। হেসে বলল,

'ঠিক বলেছ ভন্টু। রোড কমিটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফর্ম করাই ভালো।
আর কেউ না আসুক, আমরা পাঁচজন তো আছি। তুমি, আমি, শীতাংশু, সুনীল আর নিশীথ। এ কমিটির নাম দেওয়া যাক বীরনগর রোড কমিটি। প্রথম সদস্য তুমি। তোমার ভালো নামটা যেন কি?'

পকেট থেকে ফাউন্টেন পেনটা তুলে নিয়ে, এক টুকরো কাগজ হাতের তেলোয় রেখে সত্যিই মণিময় ছেলেদের নামগুলি লিখতে শুরু করল।

ভন্টু লজ্জিত হয়ে বলল, 'আমাকে কেন ধরছেন? আমাকে বাদ দিন মণিময়দা। আমি কি আর কমিটিতে থাকবার যোগ্য?'

মণিময় বলল, 'নিশ্চয়ই যোগ্য। বল তোমার ভালো নামটা।'

ভন্টু কুণ্ঠিত হয়ে বলল, 'আমার ভালো নামটা আরও খারাপ মণিময়দা— ভজহরি। লিখতে হয়তো ভন্টু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেই লিখুন। আমি তাই লিখি।'

নামগুলি লেখা শেষ করে মণিময় ছেলেদের কাছ থেকে বিদায় নিল। মালাদের বাড়িতেই ফিরে যেতে হ'ল। ব্যাগটা সেখানে ফেলে এসেছে। শীতাংশুরা তাকে খানিকদূর এগিয়ে দিয়ে যে যার বাড়ির দিকে চলল। যেতে যেতে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, মণিময়দা শুধু যে কাজের মানুষ তাই নয়, রসিকতাও কম জানেন না। দেখলে তো, ভন্টু আর রোড কমিটি নিয়ে কেমন তামাসাটা করলেন।'

বাকিটা পথ একা একা এগোতে লাগল মণিময়। মাথার ওপর বৈশাখের কড়া রোদ। রোড কমিটি আব জয়ন্তী কমিটির কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা মণিময়র মনে পড়ল। ধারে-কাছে কেউ নেই। পংক্তি ক'টি এবার তাই সশব্দে আবৃত্তি করতে করতে চলল মণিময়—

"হে ভবেশ, হে শঙ্কর
সবারে দিয়েছ ঘর
আমারে দিয়েছ শুধু পথ।"

৯

শহর থেকে এত দূরে কীর্তিপুর কলোনীতে বসবাসের অসুবিধাগুলি অমিয়ভূষণের বাড়ির সকলেরই আস্তে আস্তে গা-সওয়া হয়ে এল। অসুবিধা যথেষ্টই। যাতায়াতের অসুবিধা। বাসেই হোক আর ট্রেনেই হোক, কলকাতায় যেতে প্রায়ই ঘণ্টাখানেক লেগে যায়। ভালো স্কুল-কলেজ নেই, বাজার একটি আছে, তাতে দুধমাছটা পাওয়া যায়, কিন্তু ভালো সাবান, কি ব্লাউজের পছন্দমত ছিট মাথা কুটলেও মেলে না। রাস্তার দু দিকে উদ্বাস্তুদের দোকানপাট যা বসেছে খুবই সাধারণ রকমের। আমোদ-প্রমোদ, থিয়েটার-সিনেমার কথা বাদই দেওয়া গেল। কিন্তু মানুষ তো মনের মত দু-চারজন প্রতিবেশী চায়। অমিয়ভূষণের স্ত্রী কল্যাণী সেই পছন্দমত মানুষের সান্নিধ্য-সাহচর্যের একান্তই অভাব বোধ করেন। আর অভাব বিদ্যুতের। ইলেকট্রি-সিটি এতদূর পর্যন্ত আসেনি। বড় রাস্তাটায় সন্ধ্যার পর মিউনিসিপ্যালিটির গ্যাসের আলো জ্বলে, তা-ও সবদিন জ্বলে না, সবগুলি আলো জ্বলে না। তা না জ্বলে না জ্বলুক। রাস্তা অন্ধকার থাকলে কোন ক্ষতি নেই কল্যাণীর। ঘরের মধ্যে আলো পেলেই হল, কিন্তু কোথায় সেই আলো। কতকগুলি হ্যারিকেন লণ্ঠন কিনে আনা হয়েছে। সন্ধ্যার পর ঘরে ঘরে সেগুলি জ্বেলে দিতে হয়। কিন্তু সে-আলোয় কল্যাণী দুচোখে কিছু দেখতে পান না। সারা বাড়ি থেকে কেমন একটা ছায়া-ছায়া, আঁধার-আঁধার ভাব কিছুতেই কাটতে চায় না যেন।

অমিয়ভূষণ মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলেন, 'ও তোমার মনের অন্ধকার। এই হ্যারিকেনের আলোয় আমাদের কাজ তো বেশ চলে যাচ্ছে। পড়াশুনারও তেমন কোন অসুবিধা হচ্ছে না। অবশ্য প্রথম প্রথম দিনকয়েক হয়েছিল।'

কল্যাণী জবাব দেন, 'তোমার কি! তুমি মহাপুরুষ! তোমার কিছুতেই কিছু অসুবিধে নেই। হ্যারিকেনের বদলে যদি মাটির দীপ আর রেড়ীর

তেলের আলোও জ্বলে, তুমি দিব্যি দেখতে পাবে। তোমরা তো আর শুধু দুটি চর্মচোখে দেখ না। দিব্যনয়নে দেখে নাও। তুমি আর তোমার বোন দুজনেই মহাপুরুষ।'

করুণা কাছে থাকলে প্রতিবাদ করে। হেসে বলে, 'বউদি, দাদাকে মহাপুরুষ কি পুরুষোত্তম, যা বলে খুশী হও, বলো। কিন্তু আমার বেলায় ব্যাকরণ ভুল কোরো না।'

অমিয়ভূষণও হাসেন, 'সত্যি স্কুলে পড়াতে পড়াতে করুণা নিজেই একখানা ব্যাকরণ-প্রবেশিকা হয়ে রয়েছে। ওর কানে ভুলভ্রান্তি সইবে কেন?'

কল্যাণী সহজ রসিকতার ধার দিয়েও যান না। মুখখানা একটু বিকৃত করে বলেন, 'তোমাদের কিছুই সয় না, সইবেও না। সয়ে যাওয়ার পালা শুধু আমারই।'

সুর কেটে যায়। গম্ভীর হয়ে ওঠে করুণার মুখ। অমিয়ভূষণও ভ্রূকুঞ্চিত করে সেখান থেকে উঠে যান। নিজের স্ত্রীকে ভারি ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণচিত্ত বলে মনে হয় তাঁর। দিনরাত করুণাকে হিংসা করে কল্যাণী। অল্পবয়সে যেমন করত, এখনও ঠিক তেমনি খোঁচা দিয়ে কথা বলে। রাগ হলে আগে এমন সব কুৎসিত ইঙ্গিত করত, যা মুখে পর্যন্ত আনা যায় না। করুণা নেহাৎই অমিয়ভূষণের আপন বোন। তাই কল্যাণীর কোন গালাগালই তাঁর গায়ে লাগে না। মাসতুতো-পিসতুতো বোন হলে না-জানি কি হতো। বাইরের লোকেও অন্য রকম কিছু ভাবতে পারত। করুণাও কি টিঁকতে পারত এখানে? কিন্তু তার সহ্য করবার ক্ষমতা অনেক বেশি। বউদির প্রচণ্ড রাগ আর ঈর্ষাকে সে এক ধরনের সাময়িক বিকৃতি বলেই মনে করে। কথা কাটাকাটি, ঝগড়া-ঝাঁটির মধ্যে যায় না। তবে বউদিকে সে ভালোও বাসে না, একথা অমিয়ভূষণ বেশ বুঝতে পারেন। প্রীতি দূরে থাক, তার সম্বন্ধে সাধারণ একটা অনুকম্পা ছাড়া আর কোন অনুভূতি করুণার মনে নেই। নিজের স্ত্রীকে আর একজন দিনরাত এমন ঘৃণা করবে, ছোট মনে করবে, তাও যেন অমিয়ভূষণের সহ্য হয় না। কারণ কল্যাণী তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলে-

মেয়ের মা, তাঁর সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী। দীর্ঘকাল ধরে উচ্চারিত হতে হতে অর্ধাঙ্গিনী কথাটার ধার কমে গেছে। যে স্ত্রীকে তিনি অযোগ্য মনে করেন, নিজের বোন যখন তার সম্বন্ধেই অবজ্ঞা কি অনুকম্পা জানায়, অমিয়ভূষণ যেন কথাটার মানে নতুন করে টের পান ; কল্যাণী শুধু তাঁর দেহ নয়, মনেরও যে একাংশ, তা যেন বেদনা আর বিস্ময়ের ভিতর দিয়ে অনুভব করেন। স্ত্রীর সঙ্কীর্ণতাকে শোধরাতে যান অমিয়ভূষণ, বোনের ওপর আরও সদয় আরও স্নেহশীল হয়ে, করুণার মনোভাবটা বদলে দিতে চান, কিন্তু সফল হন খুব কম ক্ষেত্রেই। তাঁর স্ত্রী আর বোনের মধ্যে ব্যবধানটা বেড়েই চলে। তারপর এক-একদিন দুই পক্ষেরই শ্রদ্ধা-প্রীতির অসদ্ভাবটা হঠাৎ ঝগড়ার মধ্যে রূপ নেয়। সেদিন কেলেঙ্কারির আর শেষ থাকে না। শোভনতার সীমা দুজনেই ছাড়িয়ে যায়। এমন দুর্ঘটনা অবশ্য ছ' মাসে ন' মাসে ঘটে। কিন্তু তার জের চলে অনেকদিন পর্যন্ত। ঝগড়ার সময় অমিয়ভূষণের মা শতদলবাসিনী প্রায়বারই মেয়ের পক্ষ নেন। করুণাকে ডেকে ধমকাতে থাকেন, 'তুই কেন অন্যের লাথি-ঝাঁটা খাওয়ার জন্যে পড়ে আছিস এখানে? তুই কি কারো রোজগারে খাস না পরিস? নাকি পেটে বিদ্যেবুদ্ধি কারো চেয়ে কম আছে? শহরে বোর্ডিং হস্টেল দেখতে পাসনে চোখে? তার একটায় চলে যা। না হয় কোন আশ্রমে-টাশ্রমে গিয়ে থাক। রাতদিন এই জ্বালা আমি আর সইতে পারিনে।

করুণা কোন কোনদিন সত্যিই চলে যাওয়ার উদ্যোগ করে। বাক্স-স্যুটকেস, বইপত্র গুছিয়ে তোলে। কিন্তু অমিয়ভূষণ তাঁকে কিছুতেই যেতে দেন না। হয় নিজে গিয়ে বোনের হাত ধরে তাঁকে টেনে নিয়ে আসেন। না হয় ছেলেমেয়েকে ইশারা করেন। তারা গিয়ে পিসীর পথ আগলে রাখে। এই পারিবারিক কলহে সবচেয়ে অসুবিধা বোধ করে এবং বিব্রত হয় কমল আর এনাক্ষী। তারা চুলচেরা ন্যায়বিচার করতে চায়। কোন কোন ব্যাপারে পিসীকে সমর্থন করে, কোন কোন ক্ষেত্রে মাকে। ধমকটা অবশ্য কখন মাকেই বেশি দেয়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে টান মার ওপরই তাদের বেশি।

খাওয়া-পরার তেমন কোন অভাব না থাকলেও মার মনে যে বড় রকমের একটা অভাব আছে, তা কমল অল্প বয়স থেকেই অনুমান করতে শিখেছে। বাবার কাছ থেকে মা যে ঠিক যোগ্য সম্মান-সমাদর পায় না, আদর-ভালোবাসা পায় না, তা কমলের কাছে অস্পষ্ট নয়। এজন্যে দরদ আর সহানুভূতি তার মার ওপরই বেশি। কমল ভাবে মার কি দোষ। অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে গেছে। বাবা তাঁকে কেন নিজের পছন্দমত করে গড়ে নিতে পারেননি? লেখাপড়া বাবা যদি এত বেশি ভালোবাসেন, কেন নিজের স্ত্রীকে তা যত্ন করে শিখিয়ে নেননি? সেই দোষ আর অক্ষমতার জন্যে কমল বাবাকেই দায়ী করে। মার ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতার জন্যেও অবশ্য সে লজ্জিত হয়। কিন্তু তাব জন্যেও দায়ী যেন বাবাই। যে ভালোবাসায় মানুষের হৃদয়ের উদারতা প্রসারতা বাড়ে, কমলের সন্দেহ হয়, সেই প্রেমের স্বাদ মা বাবার কাছ থেকে পাননি। বাবা শুধু তাঁকে জীবনভর সহ্য করে গেছেন। যাতে জীবন ভরে ওঠে তেমন কিছু দিতে পারেন নি।

যখন ঝগড়া-ঝাঁটি থাকে না, বাড়িতে খানিকটা শান্তির হাওয়া বয়, কমল বোনের সঙ্গে এই নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করে। হেসে বলে, 'পুনটুরি, তোকে যত শিগগিব পারি পার করে দিতে হবে। নইলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বিয়ে করতে পারব না। তুইও আমার বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করবি।'

এনাক্ষী মুখ টিপে হাসে, 'দাঁড়াও, আমি বলে দিচ্ছি পিসীমাকে। তাঁর ওপর এত অচলা শ্রদ্ধা ভক্তি তোমার! কানে গেলে তিনি তোমার মুখও দেখবেন না দাদা।'

কমল জবাব দেয়, 'পিসীমার ওপর মোটেই আমার অশ্রদ্ধা নেই। আমি শুধু নিজের সাবধান হওয়ার কথা বলছি।'

এনাক্ষী বলে, 'সাবধান হয়ে তুমি কি করতে পারবে শুনি। আমি যেখানেই যাই না কেন এসে এসে তোমার বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে যাব।'

কমল বলে, 'যদি সাত সমুদ্দুর তের নদীর পার করে দিই?'

এনাক্ষী বলে, 'ইস, দেওয়া না দেওয়াটা বুঝি তোমার ইচ্ছে? আমি যদি

বলি আমি ঘরের কাছে বিয়ে করব, শ্বশুরপুত্র আর শ্বশুর ঘর আমি নিজের পছন্দমত বেছে নেব, তাহলে ?'

কমল বলে, 'তাই নেনা। তাহলে তো বেঁচে যাই। বাবাকে পণ যৌতুক কিছু দিতে হয় না। এতকাল কলেজে আর ইউনিভার্সিটিতে পড়লি, ভজন ভজন তো দূরের কথা দু'একজন ছেলের সঙ্গেও যে প্রেমে ট্রেমে পড়বি তা পারলিনে। সেই একেবারে বিয়ের পিঁড়ির জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে আছিস।'

পরিহাসের সুরে হলেও দাদার এমন সরাসরি কথায় প্রথমে একটু লজ্জিত হয় এনাক্ষী। তারপর উল্টো অভিযোগের মধ্যে সেই লজ্জাকে গোপন করে।

এনাক্ষী বলে, 'ও ব্যাপারে তুমিই বা এমন কোন কৃতিত্ব দেখিয়েছ দাদা। তুমিও তো কত গানবাজনার আসরে যাও, কত গাইয়ে বাজিয়ে মেয়ের সঙ্গে তোমার নাকি আলাপও হয়েছে, কিন্তু কই, বরণমালা হাতে কেউ তো তোমার পিছনে পিছনে ছুটে এল না। আসলে গল্প-উপন্যাসের নায়িকাদের ছাড়া রক্তমাংসে-গড়া কোন মেয়ের কাছাকাছি যাওয়ার সাধ্য তোমার নেই।'

কমলাক্ষ বলে, 'বয়ে গেছে আমার নভেলের নায়িকাদের নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করতে। তাদের জন্যে তো নভেলের নায়কবাই আছে। আমি কি তোর মত যে রোজ একখানা করে নভেল শেষ করতে না পারলে পেটের ভাত হজম হব না? আমার অনেক কাজকর্ম আছে। আসলে তুই নিজে যেটা করিস, নভেলের নায়কদের নিয়ে দিনরাত যে স্বপ্ন দেখিস তাই আমার ওপর চাপাতে চাস। লক্ষণ-টক্ষণ মোটেই ভালো দেখছিনে পুনটুনি, মাকে বলতে হবে ব্যাপারটা।'

খোঁটাটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারে না এনাক্ষী। এই কীর্তিপুরে আসবার পর থেকে বেশির ভাগ সময় সত্যিই তার বই নিয়েই কাটাতে হয়। বাবা, দাদা, পিসীমা যে যার চাকরিতে বেরিয়ে যান। বাড়িতে থাকে শুধু সে, মা আর ঠাকুরমা। তাঁদের সঙ্গে বেশিক্ষণ আলাপ চলে না। ঘর-সংসারের কথা ছাড়া আর তো কোন কথা নেই তাঁদের। এনাক্ষী উঠে এসে ফের

নভেল কি গল্পের বই নিয়ে বসে। তাতেও ঘর-সংসারের কথাই বলা হয়। তবে মা আর ঠাকুরমার মুখ দিয়ে নয়। সত্যিকারের ঘর সংসার থেকে তার স্বাদ আলাদা। সত্যি হয়েও যা সত্যি নয়। কিছুটা স্বপ্ন কিছুটা কল্পনায় গড়া। অবশ্য যতক্ষণ পড়া যায় ততক্ষণ মনে হয় এর প্রত্যেকটি বর্ণ সত্য। এই বিভ্রম জন্মাবার জন্যে কখনো লেখক তাকে সাহায্য করেন, কখনো লেখককে এনাক্ষী সাহায্য করে। সেই কল্পনালোকে না ঢুকতে পারলে গল্পপাঠের আনন্দ পাওয়া যায় না।

কিন্তু মাঝে মাঝে বইও বড একঘেয়ে লাগে। মন বসে না। বাবার কাছে কয়েকদিন চাকরির দরবার করে দেখেছে এনাক্ষী। কিন্তু অমিয়ভূষণ কিছুতেই রাজী হয়নি, বলেছেন, 'কাজকর্ম করবে বই কি। তবে এই তো সবে পাশ-টাশ করে বেরোলে। যা শিখেছ তা কিছুদিন মনে মনে ঝালাই করে নাও। বিদ্যাটা হজম হোক আগে।'

এনাক্ষী আপত্তি করেছে, 'কিন্তু বাবা, চর্চা না থাকলে সবই যে ভুলে যাব।'

অমিয়ভূষণ বলেছেন, 'কোন অফিসে কি কোন কলেজের লেকচারার হয়ে ঢুকলে বিদ্যার খুব চর্চা থাকবে ভেবেছিস বুঝি? যারা কেরানিগিরি করে তারা পড়াশুনোটা আরো তাড়াতাড়ি ভোলে। অফিসের ফাইলপত্রের সঙ্গে গোটা জগৎটাকে তারা ফিতে দিয়ে বেঁধে ফেলে। বিদ্যাচর্চা করতে চাও, বই কেন, বই পড়, ভালো ভালো লাইব্রেরীর সাহায্য নাও। শুধু জ্ঞান, নিষ্কাম জ্ঞান, অবিরাম জ্ঞানের অন্বেষণ তার সঙ্গে অর্থচিন্তাকে জড়িয়ো না।'

এনাক্ষী বিনা প্রতিবাদে বাবার দীর্ঘ প্রতিবাদ শোনে। বেশ বুঝতে পারে যে নিষ্কাম জ্ঞানচর্চার আদর্শ বাবার নিজের আছে, অথচ যা তিনি নিজে কোনদিন অনুসরণ করতে পারেননি সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাই তিনি মেয়ের ওপর চাপিয়ে দিতে চান। এনাক্ষী মুখে তেমন বাদ-প্রতিবাদ করে না, কিন্তু মনে মনে বিদ্রোহ করে। বাবার কোন কথাই সে অন্তরের সঙ্গে মেনে নেয় না। তার মনে হয় এ হ'ল বাবার আধুনিক রক্ষণশীলতা। যৌবন

ছাড়িয়ে প্রৌঢ়ত্বে পা দিলে মানুষের যেমন চুল পাকে, দাড়ি পাকে, তেমনি পুরোন রক্ষণশীলতাও ছদ্মনামে ছদ্মবেশে তাকে পাকে পাকে জড়াতে থাকে। মানুষ তারই নাম দেয়, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধির পরিপক্কতা। সেই রক্ষণশীলতাকে সমর্থনের জন্যে তার যুক্তির অভাব হয় না। যুক্তি হল পেশাদার উকিল। পয়সা পেলে সে ফরিয়াদীর পক্ষেও দাঁড়ায় আসামীর পক্ষেও খাড়া হয়ে বক্তৃতা করে। এনাক্ষী বেশ জানে বাবা তাকে চাকরি করতে দিতে চান না। মা ঠাকুরমার সঙ্গে এই নিয়ে বাবার যে মাঝে মাঝে আলোচনা হয়েছে তা কানে গেছে এনাক্ষীর। আশ্চর্য, শেষ পর্যন্ত তাঁদের মতের সঙ্গেই বাবার মত মিলে গেছে। বিয়ের আগে চাকরি করলে এনাক্ষীর চেহারা খারাপ হয়ে যাবে একথা পর্যন্ত উঠেছে। তাছাড়া ঠাকুরমা বলেছেন, 'চুন খেয়ে মুখ পোড়ে,, দই দেখে ভয় করে। করুণার বেলায় খুব শিক্ষা হয়ে গেছে আমার। পুনটুরীর চাকরিবাকরির নাম মুখে এনেও দরকার নেই। কার সঙ্গে কোন ক্ষণে দেখা হয়ে যাবে তার ঠিক কি! সারা জীবন তাই নিয়ে ভুগে মরতে হবে।

শুনে এনাক্ষী মনে মনে হাসে। পিসীমার ব্যাপারটা সে মোটামুটি শুনেছে। স্কুলে কাজ করতে গিয়েই মণিময় বাবুর সঙ্গে তাঁর আলাপ। নেবুতলা অঞ্চলে মেয়েদের সেই নতুন স্কুলটা যাঁরা গড়ে তোলেন তাঁদের মধ্যে মণিময়বাবু ছিলেন একজন উৎসাহী সদস্য। সেক্রেটারী নামে একজন ছিলেন, কিন্তু মণিময়বাবুই কাজকর্ম চালাতেন। সেই উপলক্ষেই পিসীমার সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় ঘনিষ্ঠতা হয়। কিন্তু বিয়ে হয় না। মণিময়ের বাবা ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ। তিনি অব্রাহ্মণের মেয়েকে পুত্রবধূ করতে রাজী হন না। মণিময়বাবু বলেন, 'ব্যস্ত হবার দরকার কি। বিয়ে যে এখনই করতে হবে তার কোন মানে আছে?' পিসীমা বলেন, 'কে বলছে তোমাকে ব্যস্ত হতে? আমি খুব সুস্থ আছি।'

মণিময়বাবুর বাবার মৃত্যুর পরেও বিয়েতে বাধা ঘটে। আগস্ট আন্দোলনে জেলে যান মণিময়বাবু। যাওয়ার আগে পিসীমার কাছে নাকি আবৃত্তি

করেছিলেন, 'ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে মোর তরে।' মাস ছয়েক পিসীমারও জেল হয়েছিল। ছাড়া পেয়ে তিনি ফের চাকরিতে ঢুকলেন। চার বছর পরে বেরিয়ে এলেন মণিময়বাবু। বেরিয়ে এসে তিনি নিজেই একবার বিয়ের প্রস্তাব করলেন। কিন্তু পিসীমা তখন মাথা নেড়ে বললেন, 'ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে মোর তরে।'

কে জানে পিসীমা কেন অরাজী হলেন বিয়েতে। এতকাল যার জন্যে অপেক্ষা করলেন তাকে শেষপর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করলেন কেন? মনে মনে আত্মাভিমানের সঙ্গেই কি মালাবদল করলেন তিনি? নাকি আর কিছুর সঙ্গে? আর কারো সঙ্গে? এনাক্ষীকে তিনি আর কোন কথা খুলে বলেননি।

কিন্তু পিসিমার স্বভাবের সঙ্গে, তাঁর জীবনদর্শনের সঙ্গে এনাক্ষীর কোন মিল নেই। তাই দই দেখে ঠাকুরমার ভয় না করলেও চলে। এনাক্ষী না করেছে রাজনীতির চর্চা, না প্রণয়রীতির। কলেজে ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সময় দু'চারটি ছেলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় যা হয়েছে তা ঘনিষ্ঠতায় গিয়ে পৌছায়নি, বন্ধুত্বে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ায়নি। আলাপ-পরিচয়ের পর কোন সহপাঠী লেকচার নোট কি কোন বই ধার চাইলে এনাক্ষী অসংকোচে ধার দিয়েছে। আবার ফেবৎ নেওয়ার সময় খাতা কি বইই শুধু ফেরৎ নিয়েছে। কোনরকম সুদের জন্যে হাত বাড়ায়নি। কেউ চা খেতে ডাকলে সাড়া দিয়েছে, রাজনীতি আ সাহিত্যের ডাইনে বাঁয়ের দলাদলি নিয়ে আলাপ-আলোচনাও করেছে কিন্তু আর কোন ইশারা-ইঙ্গিতে সায় দেয়নি, বাড়াবাড়ির সূচনাতেই পিছিয়ে সেছে। ছেলেরা কেউ তার নাম দিয়েছে আইসব্যাগ, কেউ চোরাবালি। এনাক্ষী মুখ টিপে হেসেছে। মনে মনে বলেছে, 'তোমরা সবাই ফেল করলে। পিছন থেকে যত হুলই তোমরা ফোটাও না, সবাই বোলতা আর মৌমাছিরজাত, কেউ তার চেয়ে বড় নও। শুধু রূপে নয়, বিদ্যা-বুদ্ধির অসামান্যতায় নয়, ধৈযবীর্য পৌরুষের পরীক্ষাতেও কেউ তোমরা পাসমার্ক পেতে পার না।'

ছেলেদের তরলচিত্ততা, প্রগলভতা নিয়ে সহপাঠিনী তপতী সোমের সঙ্গেও তার খুব আলাপ-আলোচনা হয়েছে। তপতী বেথুনের থার্ড ইয়ার থেকে এনাক্ষীর সঙ্গে পড়ে। এত মেয়ের সঙ্গে এনাক্ষীর আলাপ-পরিচয় হল, কিন্তু তপতীর মত বন্ধুত্ব কারো সঙ্গেই হল না। কফি হাউসে, কি কলেজ স্ট্রীটের ওয়াই এম সি এর রেস্টুরেণ্টের গাঢ় নীল পর্দা ঢাকা কেবিনে বসে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করেছে—কেউ কারো কাছে একঘেয়ে হয়ে ওঠেনি।

তপতী বলেছে, 'তোর কথাই ঠিক। আসলে আমরা আইসব্যাগ নই, ওরাই হালকা সোলা, কি রঙীন ফানুস। খানিকক্ষণের জন্যে আকাশে ওঠে, খানিকক্ষণ বেশ জ্বলে কিন্তু তারপর ধপ করে মাটিতে পড়তে তর সয় না। এমন পুরুষের দেখা পেলাম না ভাই এনা, যে চিরকাল ধরে জ্বলতে জানে। চিরকালের কথা দূরে থাক, অন্তত দু'চার বছরে যার প্রাণের আগুন নেবে না। আজকালকার দিনে প্রেমকে যারা সত্যিই সিরিয়াসলি নেয়, তাদের সবাই হয় বোকা বলে, নয় সেণ্টিমেণ্টাল। তাদের ভাগ্যে অবজ্ঞা, উপহাস ছাড়া আর কিছু জোটে না এনা। আর যারা ভালোবাসাকে লুডো, ক্যারম কি ব্রীজ খেলার চেয়ে বেশি বড় করে দেখে না তারাই শেষ পর্যন্ত জিতে যায়।'

নিজের চারদিকের স্থানকালপাত্র সম্বন্ধে এনাক্ষী অবশ্য অতখানি নৈরাশ্য-বাদী নয়। কি করে হবে? তপতীর মত অপমানের জ্বালা তো তাকে সইতে হয়নি, তপতীর মত প্রত্যাখ্যানের দুঃখও তাকে পেতে হয়নি। ও যাকে ভালোবেসেছিল, যার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল, সেই কবি বিনয় রায় শেষ পর্যন্ত সুনীতা নন্দীকে বিয়ে করেছে। সুনীতা তপতীর চেয়ে গুণে বড় নয়, কিন্তু রূপে উজ্জ্বলতর। আর পুরুষের চোখে মেয়েদের রূপটাই বোধ হয় সব চেয়ে বড় গুণ। It is not for all

তপতীর সঙ্গে এনাক্ষীর বন্ধুত্ব খুবই। তপতী ভাবে। সে পড়াশুনা করে, কাজকর্মও করে। তপতী জীবনকে লঘুভাবে নেয়নি। শুধু শাড়ি গয়না থিয়েটার সিনেমা আর বন্ধুবান্ধবদের প্রেমের গল্প নিয়ে সময় নষ্ট

করে না। বরং বাপ মা ভাইবোনদের জন্যে চাকরি করে। চাকরি হয়তো নিজের জন্যেই করে। কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চায়। কিন্তু কাজের ফলটা একা ভোগ করে না। মায়ের হাতে মাইনের প্রাপ্য সব টাকাটাই ধরে দেয় তপতী। তাই বলে নীরব কর্তব্যে একেবারে কাঠ হয়ে যায়নি। নীতিকথার আদর্শের ইস্পাতে গড়ে তোলেনি নিজেকে। এখনো আগের মতই তপতী এনাক্ষীর সঙ্গে রেস্টুরেন্টে চা খেতে খেতে গল্প করে, ভালো ছবিটবি এলে দুজনে মিলে দেখতেও যায়। ছুটিছাটা পেলে কলকাতার বাইরে থেকে ঘুরে আসে। বেশ সহজ স্বাভাবিক জীবন। কোন যে অভাব আছে, কোন যে বিশেষ ব্যথা আছে, দুঃখ আছে তা সহসা টের পাওয়া যায় না। শুধু এনাক্ষীই ওর সব কথা জানে, সব ব্যথা বোঝে। তপতীকে খুবই ভালোবাসে এনাক্ষী। তবু সে তপতীর মত হতে চায় না, করুণা পিসীমার মতোও না। ওদের দুজনের মধ্যে খানিকটা মিল আছে। কিন্তু ওদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে, জীবন সম্বন্ধে ওদের মনোভঙ্গির সঙ্গে এনাক্ষীর কোন মিল নেই। দাদার ধারণা পিসীমা আর তপতীর তাপেই এনাক্ষীর এই দশা হয়েছে। আমোদ-আহ্লাদ সম্বন্ধে নিস্পৃহতা এসেছে। যৌবনে যোগিনী হয়ে উঠেছে এনাক্ষী। কিন্তু দাদার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। যোগিনী মানে বিয়োগিনী মোটেই হয়নি এনাক্ষী। সমাজ-সংসারের সঙ্গে পুরোপুরি সংযোগই তার রয়েছে। কারো সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করতে না পারলে কি হবে, তার মন খুবই সজাগ। পিসীমা আর তপতীকে পছন্দ করলে কি হবে ওদের মতো জীবনে কোনদিন বিয়ে করবে না এমন পণ করে বসেনি। তপতীর মতো পুরুষদের সম্বন্ধে খুব যে একটা খারাপ ধারণা আছে তাও নয়। হয়তো তেমন উপযুক্ত ছেলের সঙ্গে এনাক্ষীর আলাপ-পরিচয় হয়নি। কিন্তু সে আছে। সে রূপকথার রাজপুত্র নয়, রামায়ণের রাম নয়, মহাভারতের অর্জুন নয়। এনাক্ষী তাকে তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে আসতে বলে না, ধনুর্ভঙ্গ কি লক্ষ্যভেদের পরীক্ষা তার কাছে চায় না। তবে কি চায় এনাক্ষী? নেতি নেতি করে ব্রহ্ম মিলতে পারে, কিন্তু বর মেলে না। মনের

মানুষ মেলানো যায় না। একেক সময় নিজের ওপরই নিজের বিরক্তি আসে এনাক্ষীর। শেষ পর্যন্ত নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া করে। পাত্র চাই বলে সত্যিই যদি সে কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় তার ভাষাটা কি হবে ঠিক করে রাখে মনে মনে। রাম কি অর্জুন যেমন তার জীবনে অপরিহার্য নয়, তেমনি জজ ম্যাজিস্ট্রেট কি পসারওয়ালা উকিল ব্যারিস্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ারকেও সে আবশ্যিক মনে করে না। লেখক, গায়ক, শিল্পীকে বরং অপছন্দই করে। কোন আর্টিস্টকে বন্ধু হিসাবে পাওয়াই ভালো, স্বামী হিসাবে পাওয়া সুখের নয়, এ জনশ্রুতি শুধু কানেই যায়নি এনাক্ষীর দু তিনজন বান্ধবীর ঘর-সংসার আব দাম্পত্যজীবন চোখেও পড়েছে। তপতীকে যে ভালোবাসত সেও তো কবিই ছিল। তার অনেক কবিতা, অনেক চিঠি, গদ্যে পদ্যে মেশানো চম্পূকাব্য এখনো তপতীর বাক্সে আছে। তপতী ঠিকই বলে, লেখকরা স্বয়ং তাদের নিজেদেব রচনার পাণ্ডুলিপি। অনেক কাটা ছেঁড়া, অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্যে ভরা। তবু এনাক্ষীর মনে হয় কিসের একটা রহস্য আছে দুর্বোধ্যত: আছে ওই সব পাণ্ডুলিপির মধ্যে যা ঝকঝকে ছাপা আর শক্ত মলাটে বাঁধানো বইয়ের মধ্যে নেই।

আসলে একজনের অভিজ্ঞতা আর একজনের কাজে লাগে না। কারণ একজন অবিকল আর একজন নয়। পিসীমা আর তপতীর অভিজ্ঞতাও এনাক্ষীর কাজে আসবে না। জীবনের কাছে প্রত্যেককেই অ আ ক খ থেকে পাঠ শুরু করতে হয়। এনাক্ষীও তাই করেছে, তাই করবে। ভুল ভ্রান্তি যদি হয় হবে, বকুনি কানমলা যদি জোটে জুটবে। তবু অন্যের অভিজ্ঞতার মূলধনে বড়লোক হবে না। সে যেন অন্যের শাড়িখানা ধার করে পরে নিমন্ত্রণ খেতে যাওয়া। অন্যের কোন জিনিস পরতে এনাক্ষীর গা ঘিন ঘিন করে। এমন কি পারতপক্ষে মার শাড়ি-গয়নাও সে পরে না। নিজের জীবনে অন্যেব অভিজ্ঞতার সাহায্য নিতেও এনাক্ষীর তেমনি প্রবৃত্তি নেই।

বিয়ে করবে না এমন ধনুর্ভাঙা পণ নেই এনাক্ষীর। যোগ্য ছেলে এলেই বিয়ে করবে। সেই যোগ্যতা মানে আকাশের চাঁদ হওয়া নয়, সুস্থ সবল

বুদ্ধিমান হৃদয়বান হওয়া। এই ন্যূনতম দাবিও এপর্যন্ত মেটেনি। তাই যে কটি সম্বন্ধ এসেছে তার কোনটি বাবা, কোনটি মা, আর এনাক্ষী নিজে সব কটি নাকোচ করেছে।

মার মতামতের সঙ্গে অনেকটা মিল আছে এনাক্ষীর। লেখাপড়া বেশি না শিখলেও অভিমান কিছু বেশি মাত্রায় থাকলেও মার যে সাংসারিক কাণ্ডজ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা যথেষ্ট আছে সে-কথা এনাক্ষী স্বীকার করে। কলকাতা থেকে এত দূরে এসে বাড়ি করা সেও পছন্দ করেনি। আর মার মত এনাক্ষীকেও সারা-দিন বাড়িতে পড়ে থাকতে হয় বলে অসুবিধাটা সেও হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। সব চেয়ে বড় অভাব এসোসিয়েশনের। এখানে আসবার পর থেকে তপতীর সঙ্গে এনাক্ষীর যোগাযোগ ছিন্ন হবার জো হয়েছে। ভারি কুঁড়ে মেয়ে তপতী। চিঠি লিখলে জবাব দেয় না। অন্য বন্ধুবান্ধবের সঙ্গেও এনাক্ষীর যোগ নেই। এই কীর্তিপুরে এপর্যন্ত শ' দেড়েক বাড়ি উঠেছে। সব বাড়িতে অবশ্য বাসিন্দা নেই। মানে আলাপ করবার মতো লোক নেই। হয়তো বুড়ো বুড়ি বাড়ি পাহারা দিচ্ছেন। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলেরা দূরে চাকরি বাকরি করে। এমন দু একটি পারবারের সঙ্গে আলাপ হয়েছে এনাক্ষীদের। সে আলাপের কোন মানে হয় না। আরো দু'চারটি বাড়ির কয়েকটি বউ ঝি-এর সঙ্গে মুখচেনা হয়েছে। কিন্তু তারা স্বামী সংসার ছেলেপুলে নিয়ে দারুণ ব্যস্ত। আলাপ-পরিচয়কে আর একটু অন্তরঙ্গতায় নিয়ে যাবার কোন গরজও তারা দেখায়নি। অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ি উঠেছে, নানা বয়সী, নানা ধরনের লোকজনও সে-সব বাড়িতে বাস করে, কিন্তু প্রত্যেকেই যেন নিজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ, নিজের গণ্ডীর মধ্যে সন্তুষ্ট। কেউ কারো খোঁজ নেয় না, কেউ কারো সঙ্গে আলাপের জন্য গরজ দেখায় না। এদিক থেকে কীর্তিপুর সত্যিই কলকাতার অভিজাত পাড়ার অনুকরণ করেছে। যে-কোন রকমের কৌতূহলের পরিচয় দেওয়াটাই যেন অনাগরিক। অপ্রয়োজনে আলাপ করতে যাওয়া অশিষ্টতা। অপমানের সামিল। কীর্তিপুর বেশির ভাগ বাড়িরই চার দিকে কোন প্রাচীর নেই। কিন্তু প্রত্যেকটি বাড়ির বাসিন্দারা যেন

নিজেদের চারদিকে অসহযোগ ঔদাসীন্য আর আত্মম্ভরিতার অদৃশ্য প্রাচীর তুলে রেখেছে। তা ভেদ করবার জো নেই। কারণ সে-ধরনের প্রাচীর এনাক্ষীদেরও তো আছে। তারাও ভদ্র, শিষ্ট, সভ্য আত্মমর্যাদাবিশিষ্ট নাগরিক। আত্মকেন্দ্রিক হওয়াকে আভিজাত্যের লক্ষণ বলে তারাও স্বীকার করে নিয়েছে।

এত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও কিন্তু একটি বাড়ির সঙ্গে এনাক্ষীদের আলাপ হয়ে গেল।

আর হোল এখানকার সব চেয়ে বড়লোক চারিদিকে উঁচু প্রাচীর তোলা দোতলা বাড়ির প্রভাকর দত্তগুপ্তদের সঙ্গেই। এই পরিচয়ের যোগসূত্র শতদলবাসিনী।

শুধু দোতলা বাড়ির সঙ্গে নয়, আশেপাশের আরো অনেকগুলি বাড়ির লোকজনের সঙ্গেও তিনি নিজে নিজে যেচে আলাপ করেছেন। বেছে বেছে শুধু সম-বয়সী বুড়ো-বুড়ীর সঙ্গেই কথা বলেননি, তাঁদের ছেলে-বউ, নাতি-নাতনীদের সঙ্গেও সমানে গল্প করে এসেছেন। পাশের বাড়ি সরকাররা কি ব্যানার্জীরা ক'ভাই, কে কি চাকরি করে, কার কটি ছেলেমেয়ে, কারা কি বাজার করে, সব শতদলবাসিনীর জানা। সেইসব গল্প তিনি আবার নিজের ছেলে-মেয়ে বউ আর নাতিনাতনীর কাছে এসে করেন। এনাক্ষীরা সবাই মিলে তাঁকে ধমকায়, 'যেচে যেচে তুমি যাও কেন ওদের বাড়িতে। তোমার জন্যে মান-মর্যাদা আর কিছু রইল না।'

শতদলবাসিনী বলেন, 'মানুষের কাছেই মানুষ যায়। আমি কি তাদের খেতে যাই, না পরতে যাই যে, তোদের মান যাবে?'

প্রভাকর বাবুদের চাকর দরোয়ানদের সঙ্গেও এমনি শতদলবাসিনীদের আলাপ। সেই আলাপ কাজে লাগল কমলাক্ষের রেডিও প্রোগ্রামের সময়। দামী রেডিও সেট এনাক্ষীদেরও আছে। হিটার ইস্ত্রি কোন কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু ইলেকট্রিসিটির অভাবে সব অচল হয়ে পড়ে আছে। বিদ্যুৎ-বর্জিত জায়গায় বাস করার জ্বালা কি একটা?

কিন্তু শতদলবাসিনী বললেন, 'চল আমার সঙ্গে। দত্তদের বাড়িতে রেডিও আছে। ব্যাটরি দিয়ে চালায়। সেখানে গিয়ে কমলের বাজনা শুনে আসি। আমি আগে থেকেই সব বলে রেখেছি। কোন অসুবিধা হবে না।'

খানিকক্ষণ ইতস্তত করার পর এনাক্ষী ঠাকুরমার সঙ্গে গিয়েছিল ও বাড়িতে। কি আর হবে।, লোকে তো রাস্তায় দাঁড়িয়েও রেডিও শোনে। যে জায়গার যে আচার। কীর্তিপুরে আসবার পর অনেক অভ্যাস অনেক ব্যবস্থাই তো বদলাতে হয়েছে। নিজের দাদার প্রোগ্রাম শোনার জন্যে না হয় অনাহূতভাবে গিয়ে একটু দাঁড়ালই ও-বাড়ির দোরগোড়ায়। নিজে যেচে কারো সঙ্গে কথা না বললেই হল।

এনাক্ষীর বাবা মা মৃদু আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু শতদলবাসিনী কিছুতেই শুনলেন না—'আমি আমার নাতনীকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, তাতেও তোদের অত চিন্তাভাবনা? তাছাড়া আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়ে গেছে, তারাও যেতে বলেছে, তবু তোদের এত লজ্জাটজ্জা কিসের আমি বুঝিনে বাপু।'

অমিয়ভূষণ শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বলেছিলেন—'আচ্ছা তাহলে যাও, এসো গিয়ে শুনে।'

দোরগোড়ায় দাঁড়াতে হয়নি এনাক্ষীদের। বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই তার মার বয়সী এবং মার চেয়েও মোটাসোটা একটি ভদ্রমহিলা এসে তাদের ডেকে নিয়ে গেলেন। শতদলবাসিনী পরিচয় করিয়ে দিলেন। 'মৃগাঙ্কের মা। আর এই আমার নাতনী। যার কথা আপনাকে বলেছিলাম, এম-এ পাশ।'

ঠাকুরমার ইঙ্গিতে এনাক্ষী তাঁর পা ছুঁয়েই প্রণাম করল।

বড় একখানি হলঘরে রেডিও রয়েছে। সোফা-কৌচে ঘরটি সাজানো। সেখানে বসে দাদার বাজনা শুনে এল। ভৈরবী আলাপ করল কমলাক্ষ। পনের মিনিটের প্রোগ্রাম, ভালোই বাজাল। প্রভাকরবাবুর স্ত্রী বিভাবতী প্রশংসা করে বললেন, 'বাঃ চমৎকার! খুব গুণী ছেলে তো। এতদিন কিচ্ছু জানি নি আমরা।'

বাজনা শেষ হয়ে গেলে তিনি এনাক্ষীকে চা-টা খেতে অনুরোধ করলেন ; কিন্তু সে কিছুতেই রাজী হল না। সবিনয়ে বলল, 'আমি এই মাত্র খেয়ে এলাম। মাফ করবেন।'

বিভাবতী বললেন, 'কর্তা ঘুমোচ্ছেন। মৃগাঙ্কও বড় দেরিতে ওঠে। অনেক রাত পর্যন্ত জাগে কিনা। ওদের কারো সঙ্গেই তো তোমার আলাপ হল না।'

এনাক্ষীকে বাধ্য হয়ে বলতে হল, 'আচ্ছা, আর একদিন এসে আলাপ করব।'

তারপর ঠাকুরমাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এল।

ভেবেছিল সেই আলাপের ক্ষীণসূত্র আপনিই ছিঁড়ে যাবে। কিন্তু দেখা গেল ওঁরা তাতে রাজী নন।

সপ্তাহখানেক যেতে না যেতেই ওঁরা চায়ের নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন।

॥ ১১ ॥

শনিবারের বিকাল। বারান্দায় বেতের চেয়ার পেতে অমিয়ভূষণ বোন আর মেয়ের সঙ্গে গল্প করছিলেন। পরিবারের সবাইকে ডেকে তাদের সঙ্গে গল্পগুজব করবার সময় তিনি খুব কমই পান। বাড়িতে যতক্ষণ থাকেন তার বেশির ভাগ সময়ই অর্থচিন্তায় কি অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়। নোট লেখা, রীডার লেখা, ইয়ার বুকেব কাজ যখন যা হাতে আসে তাই নেন। বাড়ি করতে গিয়ে হাজাব দশেক টাকা দেনা হয়েছে। তা শোধ করতে হবে। সম্প্রতি একটি ইংরাজী সাপ্তাহিক কাগজে ফিচার লেখবার কাজ নিয়েছেন। মাসে শ'খানেক টাকার বেশি তারা দেবে না। তবু সেই কটা টাকার মায়াও ছাড়তে পাবেনান অমিয়ভূষণ। টাকা তো তাঁকে তিল তিল করেই সংগ্রহ করতে হবে। তিনি তো আর ব্যবসায়ী নন। তিনি তো আর লাখ টাকাব মূলধন নিয়ে কাববার করতে বসেননি। তাঁর মূলধন অর্জিত বিদ্যা আর পবিশ্রম করবাব শক্তি। পরিবারের সকলের জন্যেই তাঁর এই কাজ এত পবিশ্রম। আবার এই কাজই তাঁকে সকলের কাছ থেকে যেন আলাদা করে বেখেছে। এমনকি সকলের ওপর বিদ্বিষ্ট করে তুলেছে। স্ত্রী, ছেলেমেয়ে সবাই তাঁকে এড়িয়ে চলে। তাঁর সঙ্গ সান্নিধ্যে তারা আনন্দ পায় না একথা তিনি বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারেন। আর বুঝতে পেরে অপ্রসন্ন হয়ে ওঠেন। মনে মনে ভাবেন, কী অকৃতজ্ঞ তাঁর পরিবারের লোকগুলি। তিনি এদের জন্যেই খেটে খেটে মরে যাচ্ছেন, অথচ এদের মনে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই। এরা কি তাঁকে শুধু অর্থ উপার্জনের যন্ত্র বলে মনে করে? তাঁর যন্ত্রণা টের পায় না? অমিয়ভূষণ নিজে যখন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, পরিজনদেব অসহযোগ অমনোযোগের কথা তাঁর মনে থাকে না। কিন্তু হঠাৎ যখন এক এক সময় কাজে ক্লান্তি আসে,

কিছুতেই কোন কিছু মনঃপূত হয় না, অমিয়ভূষণ যেন হঠাৎ নিজের সংসার সম্বন্ধে বড় বেশি সচেতন হয়ে ওঠেন। নিজেকে পরিত্যক্ত, অবজ্ঞাত, এমনকি অসহায় বলে মনে হয় তাঁর। স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, মা, বোন প্রত্যেককে ডাকাডাকি শুরু করেন। যাকে ডেকে পান না তাঁর উদ্দেশ্যে রূঢ়, কটু মন্তব্য করতে থাকেন। তাঁর চেঁচামেচি শোরগোলে বাড়িটা যেন কিছুক্ষণের জন্যে মুখর হয়ে ওঠে। যারা স্বেচ্ছায় শ্রদ্ধাভক্তি প্রীতি ভালোবাসা দিল না তাদের কাছ থেকে যেন জোর করে ভয় আর সমীহ আদায় করতে চান অমিয়ভূষণ। করুক ওরা তাঁকে ভয়ই করুক। ভয় করুক, ঘৃণা করুক, তবু তাঁর অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিক।

আজও কাজে বসতে যাচ্ছিলেন অমিয়ভূষণ কিন্তু করুণা এসে বাধা দিল। বলল, 'দাদু, চল আজ আমরা তাস খেলি।'

অমিয়ভূষণ বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তাস!'

করুণা বললে, 'হ্যাঁ তাস। হাসছ কেন? আমরা কি এমনই বুড়ো হয়ে গেছি?'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'তা নয়। বরং তাস খেলার মত বুড়ো এখনো হইনি। আজকাল আর পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাওয়া যায় না। সংসার আশ্রমেরই ঘানি টানতে হয়।'

করুণা বলল, 'বনে গিয়ে কেউ তাস খেলে না। ঘরে বসেই খেলে। সবাই বলছে, খেটে খেটে ভেবে ভেবে তোমার সব রসকস শুকিয়ে গেছে। তোমাকে আর কিছুতেই অত খাটতে দেওয়া হবে না। আজকে তাসের আসরে তোমাকে বসতেই হবে।'

অনেকদিন পরে করুণাকে এমন তরল আর প্রগলভ হয়ে উঠতে দেখলেন অমিয়ভূষণ। ভালোই লাগল। হেসে বললেন, 'বেশ, আমার আপত্তি নেই।'

কমল এখনো কলকাতা থেকে ফিরে আসেনি। কখন আসবে তার কিছু নিশ্চয়তাও নেই। পরিবারের মধ্যে থেকেও খাওয়া ঘুমোনো সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম সে মেনে চলে না। যেদিন বেশি রাত হয়ে যায় ওর সেতারী

বন্ধু অজয়ের বাড়িতে থাকে, না হয় বেলগাছিয়ায় দাদুর বাড়িতে কাটায়। বাড়ির সবাই জানে, রাত হওয়ার দোহাইটা কৈফিয়ৎ হিসাবেই খাড়া করে কমলাক্ষ, আসলে রাত ও ইচ্ছা করেই করে, বাড়িতে আসবে না বলেই করে। বলে বলে হয়রাণ হয়ে গেছেন অমিয়ভূষণ। কিন্তু ছেলের একটিমাত্র অভ্যাসও বদলাতে পারেননি। মাঝে মাঝে ক্ষুণ্ণ হয়ে বলেন, 'ও আমাদের চেয়ে ওর বন্ধুদের বেশি ভালোবাসে। নিজেদেব বাড়িতে ওর মন টেঁকে না, পরের বাড়িতে বেশ কাটাতে পারে।'

করুণা হেসে বলে, 'দাদা, ওটা বয়সেব ধর্ম। ও বয়সে বন্ধুপ্রীতি তোমারও কিছু কম ছিল না। পবকে আপন আব আপনকে পর করার ইচ্ছাটা এক এক বয়সে মানুষের বেশি হয়। ওতে বাধা দিতে নেই।'

জবাব দিতে দিতে হঠাৎ থেমে যান অমিয়ভূষণ। মনে পড়ে পরকে আপন কবার ইচ্ছা করুণারও হয়েছিল। কিন্তু সে-সাধ মেটেনি। তাই বলে কি আপনজন ওব আবো আপনাব হয়েছে?

তাসখেলাব ইচ্ছা করুণাব সাধারণত হয় না। সেও নিজের পডাশুনো কি কাজকর্ম নিয়েই থাকে। আজ যখন এতদিন বাদে করুণা খেলতে চেয়েছে, ওর আশাভঙ্গ কবে লাভ নেই। তাই হাতের কাজ ফেলে রেখে অমিয়ভূষণ বললেন, 'বেশ, আনো তাস। তোমাদেব সঙ্গে আজ তাসই খেলব।'

তাকেব ওপর থেকে পুরোন তাস একজোড়া নামিয়ে আনল এনাক্ষী কিন্তু চতুর্থ ব্যক্তিকে পাওয়া গেল না। অমিয়ভূষণ আছেন, করুণা আর এনাক্ষী আছে, কিন্তু ওর মা কল্যাণী বাড়িতে নেই। শতদলবাসিনী বললেন, 'সে বোধহয় বাঁড়ুয্যে বাড়িতে গেছে। ওদের বড় ছেলে আর বড় বউ সদানন্দ আশ্রম থেকে দীক্ষা নিয়ে ফিরে এসেছে। সেই গল্প শুনছে বসে বসে।'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'গল্প শুনতে চায় শুনুক। কিন্তু ওসব দীক্ষাটীক্ষা বড় সংক্রামক জিনিস। ওদিকে বেশি ঘেঁষাঘেঁষি না করাই ভালো। যাতো পুনটুরি, তোর মাকে ডেকে নিয়ে আয়।'

এনাক্ষী একটু বাদে ঘুবে এসে বলল, 'মা কিছুতেই আসতে চাইল না।

আমি ডাকতে গেলাম বলে মহা বিরক্ত। আশ্রমের গল্প মন দিয়ে শুনছে কিনা। তা ছাড়া তাকে বেশি ডাকাডাকি করে লাভও নেই। তাস খেলাটা মা তেমন পছন্দ করে না। তার চেয়ে চল না পিসীমা আমরা বারান্দায় বসে তিনজনে বেশ গল্পটল্প করব। বেড়াতে বেরোলেও পারি। অনেকদিন একসঙ্গে আমরা কোথাও বেড়াইনে।'

করুণা একটু ক্ষুন্ন হল। কিন্তু তাস খেলা নিয়ে বেশি পীড়াপীড়ি করল না। গল্পের আসর থেকে কল্যাণীকে জোর করে তুলে আনতে গেলে হয়ত তার মেজাজ নষ্ট হয়ে যাবে। খেলাটাও ভালো জমবে না। তার চেয়ে চুপচাপ বসে থাকাটা মন্দ নয়। বেড়াবার প্রস্তাবে সায় দিল না করুণা, তবে এনাক্ষী যখন চেয়ারগুলি বারান্দায় টেনে নিয়ে এল, তার একটি দখল করতে অসম্মত হল না।

অমিয়ভূষণ বসলেন বোন আর মেয়ের মাঝখানের চেয়ারে। তিনি এনাক্ষীর দিকে চেয়ে বললেন, 'তোর মার দিকে একটু লক্ষ্য রাখিস পুনটুরি। যেন আশ্রম-টাশ্রমে জড়িয়ে না পড়ে।'

এনাক্ষীর হয়ে জবাব দিল করুণা। হেসে বলল, 'জড়িয়ে যদি বউদি পড়েই দাদা, আমরা কি আর বাধা দিয়ে আটকে রাখতে পারব! আমরা তো পারবই না, তুমিও যে পারবে এমন ভরসা কম।'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'পারি না পারি চেষ্টা তো করে দেখতেই হবে। ধর্মচর্চা করতে চায় ভালো কথা। এ সম্বন্ধে প্রত্যেকরই যার যার ব্যক্তিগত রুচি-অরুচি আছে। কিন্তু ওই আশ্রম-টাশ্রম আমি মোটেই সহ্য করতে পারিনে।'

এনাক্ষী তর্ক তুলে বলল, 'কিন্তু আশ্রম সহ্য না করলেও অনুষ্ঠান তো তুমি বেশ সহ্য কর। ঠাকুরমার জন্যে আমাদের বাড়িতে পুজো-টুজো তো নেহাৎ কম হয় না। ওর জন্যে অনেক আচার-বিচারও আমাদের মেনে চলতে হয়।'

করুণা বলল, 'মার কথা তুলিস কেন পুনটুরি। মা সেকেলে মানুষ। বুড়ো হয়েছেন। লেখাপড়া কিছু শেখেননি। তাঁকে যুক্তি দিয়ে কিছু

বোঝানো, কিছু নতুন করে শেখানো আমাদের পক্ষে কঠিন। কিন্তু তুই যদি হঠাৎ তোর ঠাকুর্‌মার মত আচারবতী হয়ে উঠিস, সকালসন্ধ্যা মালা জপ করতে শুরু করিস তাহলে ব্যাপারটা কি ভালো দেখাবে?'

এনাক্ষী হেসে বলল, 'ঠাকুরমার বয়সে কি করব বলা যায় না, কিন্তু আপাতত ওদিকে কোন ঝোঁক নেই। কিন্তু তোমরা যেমন তোমাদের মার পক্ষ নিয়ে বলছ, আমাদের মার পক্ষেও তেমনি দু'একটা কথা আমরা বলতে পারি।'

অমিয়ভূষণ কৌতুক বোধ করে বললেন, 'বেশ তো, বল না। জানিস করুণা, ওরা দুই ভাই বোন আর ওদের মা এই তিনজনে মিলে আমাদের বিরুদ্ধে একটা দল পাকিয়েছে। সে দলের কাজ আমরা যা বলব তার প্রতিবাদ করা। বল পুনটুরি, তোমাদের পক্ষ থেকে কি বলবার আছে শুনি।'

এনাক্ষী বলল, 'আনুষ্ঠানিক ধর্মে অবশ্য আমরাও বিশ্বাস করিনে বাবা। মা যদি ওসব আশ্রম-টাশ্রমের দিকে ঝুঁকে পড়ে আমরা খুব দুঃখ পাব। কিন্তু তাই বলে তার স্বাধীনতায় বাধা দিয়ে তাকে দুঃখ দেব না। মানুষের রুচিপ্রবৃত্তি আলাদা একথা যদি আমরা একবার স্বীকার করে নিই তাহলে কাউকে বাধা দেওয়ার কোন জোও থাকে না। ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা যদি আমরা স্বীকার করি তাহলে আনুষ্ঠানিক ধর্মকেই বা স্বীকার করব না কেন।'

মেয়ের তর্ক করবার শক্তি দেখে খুব খুশী হলেন অমিয়ভূষণ। বিস্মিতভাবে তার দিকে একটু চেয়ে থেকে বললেন, 'বৃদ্ধা মার সম্বন্ধে উদার হওয়া আর স্ত্রীর নির্বুদ্ধিতা সহ্য করে যাওয়া এক কথা নয় পুনটুরি। তোমরা বড় হয়েছ, তোমাদের সামনে আমার আর লজ্জা করবার কিছু নেই। তাছাড়া এসব বিষয়ে আমি খোলাখুলি আলোচনাই পছন্দ করি। তোমাদের ভাইবোনের ধারণা, তোমাদের মার ওপর আমি নিজের মতামত জোর করে চাপাতে চাই। তোমাদের বোধহয় ধারণা, তাঁর নিজের পছন্দ অপছন্দ, রুচি প্রবৃত্তির আমি ধার ধারিনে। একথা ভুল। স্বামী যে স্ত্রীকে

সব ব্যাপারে নিজের নিজের ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে চায় তা কোন মিশনারি মনোভাব থেকে নয়, স্ত্রীকে সে আলাদা বলে ভাবতে পারে না বলেই স্ত্রীকে সে সব ব্যাপারেই একাত্ম করে নিতে চায়। স্ত্রী স্বামীর শুধু অর্ধাঙ্গিনী তা নয়, অর্ধেক আত্মা। তাই একজনকে সম্পূর্ণ আর একজনের মতো না হলে চলে না।

করুণা আর এনাক্ষী দুজনেই একটু বিস্মিত হন। অমিয়ভূষণ বোন আর ছেলেমেয়ে সকলের সঙ্গেই খোলাখুলিভাবে সব কথা আলোচনা করেন কিন্তু দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে এমন আবেগপূর্ণ ভাষায় কথা বলতে তাঁকে আর কোনদিন তারা দেখেনি। করুণা একটু বাদে বলল, 'কিন্তু দাদা, আত্মসমর্পণটা যে আমাদের দেশে একেবারেই একতরফা হয়ে পড়ে। স্বামীর জন্যেই স্ত্রীকে সব ছেড়ে আসতে হয়। শুধু গোত্রান্তর নয়, কোন কোন স্বামী স্ত্রীব কাছ থেকে একেবারে রূপান্তর দাবি কবেন।'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'তা হযত করেন। কিন্তু এ ব্যাপারটা শুধু আমাদের দেশে নয়, সব দেশেই সত্য। নানা কাবণে বেশি বিদ্যাবুদ্ধি, বেশি চিন্তাশক্তি, এমনকি বেশি পরিমাণ উদারতা হৃদয়বত্তাও পুরুষেব দখলে। একথা যদি আমরা অস্বীকার করি ফ্যাক্টকে অস্বীকার করব। এর পিছনে অবশ্য অনেক কারণ আছে। বহুকাল ধরে মেয়েরা শূদ্রের মত পতিত ছিল, এখনও বেশির ভাগ জায়গায় তাই আছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা তাদেব আয়ত্তেব বাইরে ছিল। তাই সমাজদেহের একাংশ একেবাবে পঙ্গু হয়ে গেছে। কিন্তু হঠাৎ সেই খোঁড়া পা-খানা যদি বাতারাতি গিরি লঙ্ঘন কবতে চায়, যদি ভালো পা-খানার সঙ্গে তাল ঠুকে বলে, তুমি আর আমি সমান, শুধু তাই নয়, তোমার চেয়ে আমি বড়, আমি আদ্যাশক্তি, তাহলে ব্যাপারটা বড়ই হাস্যকর হয়ে ওঠে।'

করুণা হেসে বলল, 'দাদা পুরুষের কাছে মেয়েরা সমান অধিকারই দাবি করে। যা পায়নি, কি যা হারিয়েছে তাই ফিরে পেতে চায়। এখনকার যে অবস্থা তাতে তারা পুরুষের সমকক্ষ বলে নিজেদের কিছুতেই মনে করে না।

আমার বউদির মত দু'একজন জেদী জবরদস্ত বউ-ঝির কথা আলাদা।'

এনাক্ষী ভ্রূ কুঁচকাল! অকারণে অসঙ্গতভাবে করুণা যে কল্যাণীকে খোঁচা দিল এটা সে পছন্দ করেনি। এনাক্ষী বলল, 'পিসিমা, তর্কটা উঠেছে সমাজে স্ত্রী-পুরুষের অধিকার নিয়ে। তোমাদের ননদ ভাজের ঘরোয়া বিবাদের কথা এখন থাক। তুমি যা বলছ বাবা, আমি তা মেনে নিতে পারিনে।'

অমিয়ভূষণ স্মিতমুখে মেয়েব দিকে তাকালেন, 'কোন কথাটা তুমি অমান্য করতে চাও বল।'

এনাক্ষী বলল, 'সব মেয়ে সব ব্যাপাবে পুরুষের চেয়ে ছোট একথা সত্যি নয়।'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'আমি কি সে-কথা বলেছি? আমি গড়পড়তা মেয়েদের কথাই বলতে চেয়েছি। গড়পড়তা মেয়েরা বলতে পারে না যে, তারা পুরুষের সমান।'

এনাক্ষী উত্তেজিতভাবে বলল, 'কিন্তু বলা দরকার। আমরা যে তোমাদের সমান এ কথা আমাদেব জোব গলায় বলা দবকাব। তোমরা যে দয়া করে আমাদেব কিছু দিচ্ছ না, আমাদেব দিলে যে তোমাদেরই কল্যাণ, সকলের কল্যাণ, এ কথা আমবা যদি তোমাদেব বুঝিয়ে না বলতে পারি, তোমরা ভিক্ষে দেওয়ার মত ছিঁটে-ফোঁটা দেবে, পুবোপুরি দিতে চাইবে না। তোমরা মুখে বলবে দিচ্ছি, কাগজে কলমে বলবে দিলাম, কিন্তু কাজের বেলায় দিতে পারবে না। মেয়েদেব স্তবস্তুতি কি আমাদের সমাজেই কম! কিন্তু সত্যিকারের অধিকাব তাদের কতটুকু বল তো?'

মেয়েব এই দৃপ্ত ভঙ্গিতে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন অমিয়ভূষণ। খানিকটা স্নেহ আর প্রশ্রয়েব হাসি তাঁব মুখে লেগে রইল।

এনাক্ষী আরো কি বলতে যাচ্ছিল, বাইরের উঠানে আর একজন ভদ্রলোককে এসে দাঁড়াতে দেখে থেমে গেল। একেবারে অচেনা নয়। ও বাড়ির মৃগাঙ্ক দত্তগুপ্ত। বয়স বছব তিরিশেক হবে। দেখতে সুপুরুষ নয়। রঙ ময়লা,

চেহারার মধ্যে একটা চোয়াড়ে ভাব আছে। পুরু ঠোঁট, একটু চ্যাপটা ধরনের নাক, চওড়া কপাল। জোড়া ভ্রূ দুটি বড় সুন্দর। আর তার নিচে বড় বড় দু'টি বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। সব মিলিয়ে মৃগাঙ্কের চেহারার মধ্যে একটা দৃঢ় পৌরুষের ভাব আছে। নিজের ব্যক্তিত্ব আর শক্তিমত্তা সম্বন্ধেও সে খুব সচেতন। চট করে সে হয়ত কাউকে আকর্ষণ করে না, কিন্তু চট করে ভুলে যাওয়ার মতও তার চেহারা নয়। বরং একটু অনিচ্ছা এমন কি অস্বস্তি-সত্ত্বেও তাকে মনে রাখতে হয়। তার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিতভাবে চোখ নামিয়ে নিল এনাক্ষী।

উঠানের মাঝখান থেকে মৃগাঙ্ক আরো দু'পা এগিয়ে বারান্দার দিকে এল। তারপর অমিয়ভূষণের দিকে চেয়ে সপ্রতিভভাবে কিন্তু বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'নমস্কার। আপনাদের আলাপে ব্যাঘাত ঘটালাম। তার জন্যে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিই।'

অমিয়ভূষণ একটু বিব্রত হয়ে বললেন, 'না না না, তাতে কি হয়েছে। কিন্তু আপনাকে তো—'

মৃগাঙ্ক স্মিতমুখে বলল, 'হ্যাঁ, নিজের পরিচয় নিজের মুখেই দিতে হচ্ছে। ঠাকুরমা—মানে আপনার মাকে ডেকেছিলাম ইনট্রোডিউস করিয়ে দেওয়ার জন্যে। তাঁর সঙ্গে আমাদের অনেক আগেই পরিচয় হয়ে গেছে। এই কলোনীর কার সঙ্গেই বা হয়নি। তাঁকে বলেছিলাম আপনি আলাপ করিয়ে দিয়ে যান। তিনি হেসেই অস্থির। বললেন, ওমা আলাপ আবার কি করিয়ে দেব। যাও না মৃগাঙ্ক, ওরা ওখানে বসে বসে গল্প করছে, তুমি সোজা চলে যাও না। পুরুষ ছেলে, লজ্জা কি! বলে তিনি তাঁর সরকার বাড়ির সখির সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন।'

অমিয়ভূষণ হেসে বললেন, 'ও আপনি মৃগাঙ্কবাবু। আমার অবশ্য গোড়া থেকেই তাই মনে হয়েছিল। আসুন ভিতরে আসুন।'

মৃগাঙ্ক বারান্দায় আসবার সঙ্গে সঙ্গে করুণা আর এনাক্ষী দুজনেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

মৃগাঙ্ক তা লক্ষ্য করে অমিয়ভূষণের দিকে চেয়ে বলল, 'আমার একার জন্যে যদি ওঁদের দু'জনকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, আমার পক্ষে তা বড় অস্বস্তির ব্যাপার হবে।'

অমিয়ভূষণ এবার নিজেও উঠে দাঁড়ালেন, 'আপনি বসুন, আপনি বসুন। ওরা বসবে বই কি, ওরাও বসবে। নটবর, কোথায় গেলিরে, আর একখানা চেয়ার এনে দিয়ে যা।'

করুণা বলল, 'দাদা, উনি বসুন না। আমরা তো এতক্ষণ বসেই ছিলাম। আমরা বরং ভিতরে যাই।'

অমিয়ভূষণ হেসে বললেন, 'সত্যিই তো। আমরা তো এতক্ষণ সবাই বসেছিলাম, আপনি বসুন। আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। আমার বোন করুণা, এনাক্ষী আমার মেয়ে।'

মৃগাঙ্ক নমস্কার বিনিময় করে মৃদু হেসে বলল, 'আলাপ না থাকলেও আমি ওঁদের সবাইকে চিনি। আর ওঁদের জন্যেই আমার এখানে আসা।'

একথায় শুধু এনাক্ষী নয়, করুণা পর্যন্ত লজ্জিত হয়ে উঠল। মৃগাঙ্ক আড়চোখে অসমবয়সী দুটি নারীর প্রায় সমপরিমাণ লজ্জা আর বিস্ময় দেখে মনে মনে হাসল। তারপব অমিয়ভূষণের দিকে তাকিয়ে নিজের কথাটা ব্যাখ্যা করে বলল, 'হ্যাঁ, ওঁদের কাছে আমি মার অনুরোধ জানতে এসেছি। তিনি নিজেই আসতেন। কিন্তু তাঁর শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, তাই উঠে আসতে পারলেন না। বাড়িতে আর কোন মেয়ে নেই যে, তাঁর হয়ে এবাড়ির মেয়েদের নিমন্ত্রণ করতে আসবেন। তাই রীতি লঙ্ঘন ক'রে আমাকেই আসতে হয়েছে।'

করুণা বলল, 'আচ্ছা, আপনি দাদার সঙ্গে গল্প করুন। আমরা আসছি।'

অমিয়ভূষণ বাধা দিয়ে বললেন, 'তুই বোস না করুণা। মৃগাঙ্কবাবু বলছেন, তোদের নিমন্ত্রণ করার জন্যেই তিনি এসেছেন, আর তোরা সবাই মিলে চলে যাচ্ছিস সে কি হয়?'

এনাক্ষী বলল, 'তুমি এখানে থাকো পিসীমা। আমি বরং মাকে গিয়ে খবর দিচ্ছি।'

এনাক্ষী চলে যাচ্ছিল, মৃগাঙ্ক তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'তার আগে আমার মার খবরটা দিই। আপনি সেদিন আমাদের বাড়িতে গিয়ে জলস্পর্শ না ক'রে চলে এসেছেন, সেইজন্য মা খুব দুঃখ পেয়েছেন। এমন কি গৃহস্থ-বাড়ির তাতে অকল্যাণ হবে এমন আশঙ্কাও তাঁকে পেয়ে বসেছে। তাঁর সব দুঃখ, সব আশঙ্কা দূর করতে পারব এমন ভরসা আমার নেই। তবে আপনি যদি একটু সাহায্য করেন আপাতত আমরা অকল্যাণের ভয় থেকে বাঁচি।'

এনাক্ষীর লজ্জা আর বিস্ময়ের মাত্রা এত বেড়ে গেল যে, সে কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। ভদ্রলোকটি বড় অদ্ভুত ধরনের। ভিতরে ভিতরে যে অভদ্র তাতে এনাক্ষীর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। তার বাবা রয়েছেন, পিসীমা রয়েছেন, তাদের সামনে এনাক্ষীর সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গভাবে কথা বলছে যেন তার সঙ্গে কতদিনের আলাপ। ছি ছি, বাবা আর পিসীমা না জানি কীই ভাবছেন।

এনাক্ষী মৃগাঙ্কের কথার সরাসরি কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'আচ্ছা সে একদিন দেখা যাবে। বাবা তো রয়েছেন। উনি আপনাকে বলে দেবেন। আমরা আসছি।'

এনাক্ষী দ্রুতপায়ে বারান্দা থেকে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল। মেয়েটি এমন করে তাকে এড়িয়ে যাওয়ায় মৃগাঙ্ক খুশী হল না। কিন্তু মনের অপ্রসন্নতা ভাষায় কি ভঙ্গিতে কিছুমাত্র ফুটতে না দিয়ে হেসে করুণার দিকে তাকাল, 'আপনার ভাইঝি বোধহয় খুব শাই।'

করুণা গম্ভীরভাবে বলল, 'হ্যাঁ, ও একটু লাজুক।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'দেখুন, আমার একটা বড় খারাপ দোষ আছে। সামান্য আলাপেই আমি অপরিচয়ের আড়ালটা একেবারে ভেঙে ফেলি। অনেকে

অপ্রস্তুত হন, কেউ কেউ অসন্তুষ্ট হন। তার ফলে আমিও লজ্জা পাই। তবু স্বভাবটা—।

করুণার একবার যেন মনে হল মৃগাঙ্কের কথার মধ্যে লজ্জার বিন্দুমাত্র আভাস নেই। বরং তার চোখের দৃষ্টিতে চাপা কৌতুকের ঝলক রয়েছে। করুণা কিছু বলবার আগে অমিয়ভূষণ বলে উঠলেন, 'না না। আপনার লজ্জার কোন কারণ নেই। আমরাও ঠিক এই রকমই চাই। বেশি ফর্মালিটি আমারও পছন্দ হয় না। মানুষের সঙ্গে মানুষ আলাপ পরিচয় করবে, মেলা-মেশা করবে, তার আবার অত সংকোচের কি আছে।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আমার অদ্ভুত মিল আছে। যা হোক যে জন্যে এসেছি তাই বলি। মার অনুরোধ আপনারা সবাই কাল সন্ধ্যায় আমাদের ওখানে চা খাবেন। আপনার মা মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে যান, কিন্তু কোনদিন একটা পান পর্যন্ত নেন না। নাতনীটিকেও সেই শিক্ষা দিয়েছেন।'

এনাক্ষীকে দেখেই শেষ কথাটা বলল মৃগাঙ্ক। তার একটু আগেই সে এসে দোরের পাশে দাঁড়িয়েছিল। মৃগাঙ্কের অভিযোগের কোন জবাব না দিয়ে অমিয়ভূষণের দিকে চেয়ে বলল, 'বাবা, ওঁরা সব এসেছেন।'

একটু বাদে শতদলবাসিনী আর কল্যাণী দুজনকেই দেখা গেল।

শতদলবাসিনী খুব খুশী হয়ে বললেন, 'এই যে এসেছ? বেশ বেশ! আমি বলিনি তোমাদের, বড়লোকের ছেলে হলে কি হবে একটুও দেমাক নেই, অহঙ্কার অভিমান নেই। মৃগাঙ্ক খুব ভাল ছেলে। বলিনি?'

মৃগাঙ্ক হাসিমুখে বলল, 'অত বেশি সার্টিফিকেট দেবেন না। এঁরা সবাই ভাববেন আপনাকে আমি ঘুষ দিয়ে বশ করেছি।'

শতদলবাসিনী বললেন, 'শোন কথা। তুমি আবার কি ঘুষ দেবে আমাকে। আমার কি আর ঘুষ নেওয়ার বয়স আছে। ঘুষ যাদের দিতে হয় তাদের দিয়ো।'

মৃগাঙ্ক আর একবার হাসিমুখে এনাক্ষীর দিকে তাকাল। এনাক্ষী এবারও

চোখ নামিয়ে নিল। কিন্তু আগেকার মত অস্বস্তি বোধ করল না। বরং তার মনে হল ঠাকুরমার সঙ্গে অনেকটা অন্তরঙ্গতা আছে বলে তাদের সঙ্গে অমন সহজভাবে আলাপ করতে পেরেছে মৃগাঙ্ক। শতদলবাসিনী উপস্থিত থাকায় দুই পক্ষেরই আড়ষ্টতা সহজে কেটে গেল।

মৃগাঙ্ক বলল, 'আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে এলাম ঠাকুরমা।'

আত্মীয় সম্বোধনে শতদলবাসিনী খুশী হয়ে বললেন, 'ওমা প্রথম দিনেই ঝগড়া?

মৃগাঙ্ক বলল, 'হ্যাঁ, প্রথম দিন হলেও, অনেকদিন ধরেই পুষে রেখেছি। সেদিন আপনারা রেডিও শুনে চুপে চুপে চলে এলেন, আমাকে একবার জানালেনও না। কেন আমি বাঘ না ভাল্লুক। বড়লোকের ছেলে বলে হাতী খাই না ঘোড়া খাই?'

মৃগাঙ্কের কথার ভঙ্গিতে করুণাও মুখ নিচু করে হাসি লুকাল।

শতদলবাসিনী বললে, 'আমার তো ইচ্ছাই ছিল পুনটুরির সঙ্গে সেদিনই তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। কিন্তু তোমার মা-ই বললেন তুমি ঘুমোচ্ছ। তাই আর তোমাকে ডাকাডাকি করলাম না। এদিকে পুনটুরিও 'চল চল' বলে বিরক্ত করতে লাগল। ছেলেবেলা থেকে ওই ওর দোষ। ওর জন্যে কোথাও দু'দণ্ড বসবার জো নেই।'

কল্যাণী এতক্ষণে কথা বললেন, 'কিন্তু আপনি কি বাইরেই বসে থাকবেন? আসুন, ভিতরে আসুন।'

মৃগাঙ্ক হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, আজ আর ভিতরে নয়, কাল আপনারা সবাই মিলে যাবেন আমাদের ওখানে, তারপর আমি আর একদিন আসব। কমলাক্ষবাবুর সঙ্গে দেখা হল না। যার একান্ত সাধ তিনি কাল আমাদের সামনে বসে বাজাবেন। একই সঙ্গে দেখাশোনা আলাপ-পরিচয় সব হবে। বাবাও উপস্থিত থাকবেন।'

কল্যাণী বললেন, 'আমাদের তো তাতে অসাধ নেই। কিন্তু কমলের নাগাল পেলে হয়। সে যদি বাড়ি আসে, অন্য কোন জায়গায় যাবে বলে

যদি কথা না দিয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই যাবে। না যাওয়ার তো কোন কারণ নেই। আপনি নিজে এসে এমন করে বলে গেলেন।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'আমরা সবাই খুশী হব। সবাই অপেক্ষা করে থাকব।'

মৃগাঙ্কের আপত্তি সত্ত্বেও কল্যাণী তাকে চা আর খাবার না খাইয়ে ছাড়লেন না। একটু হেসে বললেন, 'আপনি না খেলে ওরাই বা গিয়ে খাবে কেন?'

মৃগাঙ্ক বলল, 'এই তুলনাটা কি উচিত হল? আপনি হলেন মায়ের মত।'

খানিক বাদে মৃগাঙ্ক সবাইর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়াল। আর একবার নিমন্ত্রণের কথা মনে করিয়ে দিল। তারপর উঠান পার হয়ে যেতে যেতে নিজের মনেই একটু হাসল। প্রত্যেক দুর্গই মনে করে সে দুর্ভেদ্য। কার শক্তি যে কতটুকু মৃগাঙ্কের টের পেতে বাকি নেই।

॥ ১২ ॥

কমলাক্ষ ফিরে এল রাত প্রায় দশটায়। সমস্ত কীর্তিপুর কলোনী তখন প্রায় নিঝুম হয়ে গেছে। বেশির ভাগ বাড়িই অন্ধকার। খেয়ে দেয়ে আলো নিবিয়ে এতক্ষণে সবাই বোধ হয় শুয়ে পড়েছে। শুক্লপক্ষের রাত বলে পথ চলতে বিশেষ কোন অসুবিধা হল না কমলাক্ষের। অন্ধকার রাত্রেও চলাফেরা আজকাল তার অভ্যাস হয়ে গেছে। খানিকটা পথ হেঁটে এসে নিজেদের বাড়ির সদর দরজার সামনে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের বাড়িতে এখনো আলো জ্বলছে। এ বাড়ির কারোরই বেশি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বার অভ্যাস নেই। কমলাক্ষের জন্যে বাড়ির সবারই বেশি রাত জাগবার অভ্যাস হয়ে গেছে। কলকাতায় থাকতে সে আরো রাত্রে বাড়ি ফিরত। তার জন্যে জেগে থাকতেন মা। পিসীমার তো খাওয়ার পরে খানিকক্ষণ বইটই না পড়লে ঘুমই আসে না। এনাক্ষী অবশ্য গোড়ায় একটু ঘুমকাতুরে ছিল। কিন্তু পিসীমার ঘরে থেকে থেকে তারও রাতজাগা এবং রাত জেগে বই পড়া অভ্যাস হয়ে গেছে। ঠাকুরমা ছাড়া কেউ এগারটার আগে শুতে যান না।

সাড়া পেয়ে কল্যাণী এসে দোর খুলে দিলেন। গম্ভীর মুখে বললেন, 'আমরা তো ভেবেছিলাম তুই বোধহয় আজ আর এলিইনে।'

কমলাক্ষ বলল, 'আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু শেষপর্যন্ত এসেই পড়লাম। কি জানি তুমি যদি আবার চিন্তাভাবনা শুরু করে দাও।'

কল্যাণী বললেন, 'বয়ে গেছে আমার ভাবতে। তোমার জন্যে চিন্তা করা আমি ছেড়ে দিয়েছি বাপু। চিন্তাই করি আর যাই করি তুমি তো তোমার নিজের খেয়াল মতই চলবে।'

মায়ের এই অভিযোগ নতুন নয়। কমলাক্ষ বেশি প্রতিবাদ করল না। পাশের ঘর থেকে শতদলবাসিনী বললেন, 'হ্যাঁরে কমল! তুই ভেবেছিস কি

বল দেখি। রোজ রাতদুপুর না হলে তুই বাড়ি ফিরবিনে। একি আগের মত সেই শহর বন্দর? এই জলো জায়গায় রাতে-বিরাতে কত কি চলাফেরা করে। রাস্তা ভালো না, ঘাট ভালো না। তোর প্রাণে কি কোন ভয়ডরও নেই?'

কমলাক্ষ বলল, 'ভূত পেত্নীর ভয় এখনো খুবই আছে ঠাকুরমা। তুমি এবার ঘুমোও।'

হাতমুখ ধুয়ে এসে খেতে বসল কমলাক্ষ। শোয়ার ঘরে তার জন্য ভাত বেড়ে ঢাকা দিয়ে রেখেছেন কল্যাণী। রোজই প্রায় তাই করেন। এত রাত্রে তাঁর আর রান্নাঘরে যেতে ইচ্ছা করে না।

কমলাক্ষের সাড়া পেয়ে করুণা আর এনাক্ষীও তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দোরের সামনে দাঁড়াল। কল্যাণী বললেন, 'তোমরা আবার এত রাত্রে উঠে এলে কেন। যাও, শুয়ে পড় গিয়ে।'

করুণা নিঃশব্দে একবার বউদির দিকে তাকাল। রাত দশটা যে তার পক্ষে এত রাত নয় তা কল্যাণীও জানেন। কিন্তু তিনি অন্তত এই সময়টা ছেলের সঙ্গে একান্তে কাটাতে চান। বাড়ির সবাই যদি সব সময় কমলাক্ষকে ঘিরে থাকে তিনি নিজের মনের কথা বলবেন কখন, ছেলের মনের কথা শুনবেন কখন? একেই তো গানবাজনা নিয়ে আছে ছেলে। নিরিবিলিতে পাওয়াই শক্ত। তারপর যদি বাড়ির সবাই সব সময় তার আশেপাশে থাকে, ভালোমন্দ দুটো কথা কখন তার সঙ্গে বলবেন কল্যাণী।

করুণা যে বউদির মনের ভাব বুঝতে না পারে তা নয়। কিন্তু অনেক সময় বুঝেও তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধতা করে। তারও জেদ নিতান্ত কম নয়।

কল্যাণী তাদের চলে যাওয়ার ইশারা করলেও করুণা সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল না। বরং ভাইপোর সঙ্গে নিশ্চিন্তে আলাপ শুরু করল।

করুণা বলল, 'অজয়ের ওখানে আজ গিয়েছিলি নাকি কমল? কেমন আছে তার বউ?'

কমল একটু হেসে বলল, 'ভালোই আছে পিসীমা, আজ সারাদিন তো তাদের হাঙ্গামাতেই কাটল।'

কল্যাণী বিস্মিত হয়ে বললেন, 'সারাদিন মানে? সারাদিন কি অজয়দের বাসাতেই ছিলি নাকি? অফিসে যাসনি?'

কৈফিয়তটা মাকে না দিয়ে পিসীমাকেই যেন দিতে চাইল কমল। করুণার দিকে চেয়ে বলল, 'কি করে অফিসে যাব পিসীমা? অজয়ের স্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হল। তাই নিয়ে ছুটোছুটি। ঝামেলা কি কম?'

কল্যাণী ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন, আবার হাসপাতালে কেন? কি হয়েছে সুনন্দার?'

কমল একটু হেসে বলল, 'ছেলে হয়েছে।'

কল্যাণী বললেন, 'ছেলেপুলে হওয়ার কথা ছিল নাকি তার?'

করুণা এবার হেসে ফেলল, 'কি যে বল বউদি! কথা না থাকলে হল কি করে!'

এনাক্ষীও মুখ নীচু করে হাসল।

কল্যাণী অপ্রতিভ হয়ে বললেন, 'কি জানি। কমল তার বন্ধুবান্ধবের কথা আমাকে তো আর তেমনভাবে বলে না, তোমাদেরই বলে। আমি জানব কি করে।'

কমল হেসে বলল, 'তোমাকেও বলেছি মা। তুমি বোধহয় খেয়াল করনি, না হয় ভুলে গেছ, তা না হলে রাগ করে অস্বীকার করছ।'

কল্যাণী চটে গিয়ে বললেন, 'সব সময় তোদের ঠাট্টা ইয়ার্কি আমার ভালো লাগে না কমল। যারা ওসব পছন্দ করে তাদের সঙ্গে গিয়ে করিস। অত মিথ্যেকথা বলবার অভ্যাস আমার নেই।'

এনাক্ষী হেসে বলল, 'কটাক্ষটা তুমি কার ওপর করছ মা। আমরাই কি রাতদিন মিথ্যে বলা প্র্যাকটিস করি নাকি?'

কমল আর কিছু না বলে নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করল। তারপর উঠে গিয়ে মুখ ধুয়ে কোঁচার খুঁটে জল মুছতে মুছতে এল।

করুণা আর দাঁড়াল না। নিজের ঘরে ফিরে গেল। এনাক্ষী তাকে ডেকে বলল, 'ওকি পিসীমা, চলে যাচ্ছ কেন। বোসো বোসো।'

কমল বলল, 'একটু বসে যাও পিসীমা, অনেক কথা আছে।'

করুণা যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'তোমরা কথা বল কমল। আমি এবার শুয়ে পড়ব।'

সে চলে যাওয়ার পর একটুকাল সবাই চুপ করে রইল। কমল ভাবল পিসীমাকে যখন তখন অমন করে খোঁচা দিতে যায় কেন মা? আর পিসীমাই বা এত বুদ্ধিমতী হয়ে অমন স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে কেন তা বুঝতে পারা তার পক্ষে দুঃসাধ্য।

কল্যাণী হঠাৎ বললেন, 'তুই যদি এমন ছোটখাট অছিলায় কেবলই অফিস কামাই করিস কমল, তোর চাকরি থাকবে না আমি বলে দিচ্ছি।'

কমল একটু তরলভাবে বলল, 'আমিও তাই ভাবছি মা। তারা ছাড়িয়ে দেওয়ার আগে আমি নিজেই ছেড়ে আসব কিনা। দুই কূল বজায় রাখা ক্রমেই শক্ত হয়ে উঠছে।'

কল্যাণী বলে উঠলেন, 'খবরদার ও কথা মনেও এনো না। অনেক কষ্টে ওই চাকরিটুকু জুটেছে। কাজকর্ম মন দিয়ে করে মনিবের মন জুগিয়ে যাতে চাকরিটা থাকে, ইনক্রিমেণ্ট আর প্রোমোশোন ট্রোমোশন যাতে হয় তার চেষ্টা কর। সংসার বড় কঠিন ঠাঁই। সেতার বাজিয়ে চিরদিন যাবে না, বন্ধু বল, বান্ধব বল, আখেরে কেউ কোন কাজে আসবে না। নিজের ভাত তোমাকে নিজেই জোটাতে হবে।'

এ ধরনের উপদেশ উঠতে বসতে কিছুদিন ধরে মা প্রায়ই দিচ্ছেন। কমল কোন প্রতিবাদ না করে চুপ করে রইল।

একটু বাদে কল্যাণী ফের বললেন, 'চাকরি ছাড়ার কথা বলতে তোর লজ্জা হয় না কমল? দিন নেই, রাত নেই, একটা মানুষ খেটে চলে তো খেটেই চলেছে। বাড়ি না ঘোড়ার ডিম হয়েছে একটা। এত দূরে এ জংলা গাঁয়ে এসে কোনরকমে একটু মাথা গুঁজবার ডেরা করেছে তাতেই তো দেনায় ডুবু ডুবু। সেই দেনাই শোধ দেবে, না সংসারের খরচ চালাবে? তারপর মেয়ে, একটি আছে ঘাড়ে। ওর বিয়ে টিয়ে দিতে হবে না?

না কি বৌনের মতো মেয়েকেও চিরকাল আইবুড়ো করে ঘরে পুষে রাখবেন ?'

কমল একটু হেসে বলল, 'সেজন্যে ভেবো না মা। পুনটুরীর তাড়াতাড়িই এবার একটা ব্যবস্থা করে ফেলব।'

কল্যাণী বলল, 'হুঁ, তুমি করবে ছাই। তুমি যা করবে তা আমার জানা আছে।'

এনাক্ষী উঠে চলে যাচ্ছিল, কমল তার হাতখানা ধরে ফেলে হেসে বলল, 'পালাতে হবে না, বোস এখানে। একেবারে লজ্জাবতী রাধা। দোরের আড়ালে গিয়ে তো ফের আড়ি পাতবি।'

তারপর কল্যাণীর দিকে চেয়ে বলল, 'চেষ্টা কি একেবারে করিনে। আমার কত বন্ধুকেই তো ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম। তাদের কাউকেই কি তোমার মেয়ের মনে ধরল ?'

কল্যাণী হেসে বলল, 'আর জ্বালাসনে বাপু। কি করে তাদের মনে ধরবে শুনি ? চাল নেই চুলো নেই, তোর মতই তারা একেকজন মূর্তিমান মহাপুরুষ।'

কমল বলল, 'বুঝেছি মা, মহাপুরুষকে পুনটুরীর মনে ধরবে না, রাজপুরুষের দিকেই লক্ষ্য। ভিতরে ভিতরে ওর ইচ্ছে রাজরাণী হবার।'

কল্যাণী বললেন, 'তাতে তো তোরও লাভ। তুইও রাজার সম্বন্ধী হতে পারবি।'

কমল হেসে বলল, 'রাজার সম্বন্ধী মানে প্রজারও সম্বন্ধী। তাতে লাভ নেই।'

এনাক্ষী এবার দাদার মুঠি থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'তোমরা সারারাত যত পার বসে বসে বাজে কথা বল দাদা। আমি যাই, আমার ঘুম পাচ্ছে।' বলে এনাক্ষী সত্যিই বেরোবার উপক্রম করল। কমলও চলে যাচ্ছিল, কল্যাণী বাধা দিয়ে বললেন, 'ভালো কথা, কাল কিন্তু কোথাও বেরিয়ো টেরিয়ো না। কাল বিকেলে আমাদের নিমন্ত্রণ আছে।

কমল জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায়?'

কল্যাণী বললেন, 'প্রভাকরবাবুদের বাড়িতে। চায়ের নিমন্ত্রণ। তোমাকে কাল সেখানে বাজাতে হবে।'

কমল বলল, 'চায়ের নিমন্ত্রণের বদলে আমার বাজনা শোনা যায় না মা। বড়জোর পুনটরীর দু' একখানা গান তাঁরা শুনতে পারেন।'

এনাক্ষী বলল, 'ভুলে যাচ্ছ কেন মা দাদা এখন প্রফেশনাল আর্টিস্ট, টাকা হাতে না পেলে সে সেতারে হাত দেয় না।'

কল্যাণী হেসে বললেন, 'রাত ভোর দুজনে এখন ঝগড়া কর বসে বসে।'

কিন্তু দুজনেই এবার উঠে পড়ল। ছাদের ওপর ছোট একটু ঘর আছে। কমল নিজের জন্যে সেই ঘরখানা বেছে নিয়েছে। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে রাত জেগে সে বাজায়। কমল সিঁড়িতে পা দিয়েছে, এনাক্ষী পিছন থেকে বলল, 'সুনন্দা বউদি কোন্ হাসপাতালে আছে দাদা? আমরা একদিন দেখতে যাব।

কমল বলল, 'বেশতো যাস একদিন। বেলগাছিয়ায় আছে। গ্রে স্ট্রীট থেকে ওইটাই সবচেয়ে কাছে পড়ে।'

এনাক্ষী বলল, 'নীলকান্তবাবুর মেয়ে মালা তো ওখানেই কাজ করে।'

কমল হেসে বলল, 'তার সঙ্গেও আজ দেখা হয়ে গেল। সুনন্দা তো ওদের ওয়ার্ডেই আছে। তার ছেলে হওয়ার খবর তো মালাই এনে দিল আমাদের।

এনাক্ষী হেসে বলল, 'বাপরে! এত সব চমৎকার চমৎকার খবর তুমি এতক্ষণ চেপে যাচ্ছিলে!'

কমল বলল, 'এর আবার চাপাচাপির কি আছে!'

এনাক্ষী বলল, 'আছে বই কি, জিজ্ঞেস না করলে তুমি একটি কথাও নিজের থেকে বলতে নাকি! সেই যেমন বাসে দেখা হওয়ার কথাটা অনেক দিন ধরে চেপে রেখেছিলে, হাসপাতালের দেখা-সাক্ষাতের খবরটাও তাই করতে।'

কমল উদাসীনের ভঙ্গিতে বলল, 'দিনের মধ্যে অমন কত মেয়ের সঙ্গে কত-বার দেখা হয়, কথাবার্তা হয়, সবই এসে তোকে বলতে হবে নাকি?'

এনাক্ষী বলল, 'না সব নয়, ছিটেফোঁটা এক আধটু বললেই হবে।'

কমল বলল, 'হ্যাঁ, ছিঁটেফোঁটা বলি আর তুমি বিন্দুকে সিন্ধু করে তোল। শুধু মালা কেন, আরো আরো কত মেয়ের সঙ্গেই তো দেখা হল। কত লেডী ডাক্তার, নার্স—সে এক প্রমীলা রাজ্য।'

নিজের পড়বার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন অমিয়ভূষণ। বারান্দার ধারে দাঁড়ানো ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোরা ঘুমুতে যাসনি এখনো।'

এনাক্ষী বলল, 'যাই বাবা। তুমি নিজে ঘুমোচ্ছ না। শুধু আর সবাইকে ঘুমোবার জন্যে তাড়া দিচ্ছ। তুমিও যাও, শুয়ে পড় গিয়ে এবার, এত রাত্রে আজ আর কাজ করে দরকার নেই।' তারপর কমলাক্ষের দিকে চেয়ে বলল, 'দাদা, আমি চললাম। পিসীমা এখনও পড়ছেন, এতও পড়তে পারে!'

কমল বলল, 'যে বলছে সেই বা একখানা কম কিসে।'

অমিয়ভূষণ মৃদু হাসলেন। দুই ভাইবোনে খুব ভাব। এত ভাব আছে বলেই এমন ছদ্মকলহ। নিজেদের কথা মনে পড়ে অমিয়ভূষণের। তাঁরা দুই ভাইবোনেও এমনি ছিলেন এমনি আছেন। হয়ত তাঁদের দেখেই কমল এনাক্ষীও এখন পরস্পরকে ভালোবাসতে শিখেছে। নইলে ভাইতে ভাইতে বনিবনাও হয় না, ভাইতে বোনে ঝগড়া বিবাদ হয় এমন দৃষ্টান্তই তো সংসারে বেশি।

করুণার কথা ভেবে দুঃখ হয় অমিয়ভূষণের। কেমন একটা লজ্জা সংকোচ আর অপরাধের ভাব মনে আসে। একই মায়েরপেটের ভাইবোন তাঁরা। কিন্তু দুজনের জীবন একেবারে দু রকম হয়ে গেল। স্ত্রী-পুত্র-কন্যায় তাঁর সংসার ফুলে-ফলে ভরে উঠল। আর করুণা রইল তাঁরই চোখের সামনে নিষ্ফলা মরুভূমি হয়ে। এ যেন দেখা যায় না, সওয়া যায় না, ভাবতে বড় খারাপ লাগে। অবশ্য এর জন্যে অমিয়ভূষণের কোন দোষ নেই। মণিময় আর করুণার বিয়েতে তিনি গোড়ার দিকে একটু অমত করলেও শেষ পর্যন্ত পূর্ণ সম্মতিই দিয়েছিলেন। সব রকম সহায়তা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু

ওরাই পিছিয়ে গেল। একবার একজন এগোয় তো আর-একজন পিছোয়, একজন পিছোয় তো আর-একজন এগোয়। জীবনভর মান অপমানের পালাই শেষ হল না ওদের। এ একরকম মন্দ নয়। হয়ত ভালোবাসা এই কাছে না পাওয়ার ভিতরেই বেঁচে থাকে। অতি পাওয়ার মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়। স্ত্রীকে বেশিদিন কাছছাড়া করে রাখেননি অমিয়ভূষণ। রাখবার কোন উপলক্ষ ঘটেনি। কিন্তু কাছে আছেন বলেই কি সব সময় তাঁরা কাছাকাছি থাকতে পারেন? বরং অনেক সময়ই পারেন না। ভৌগোলিক ব্যবধান ঘটে না বলে প্রকৃতি রেহাই দেয় না। বাদবিসংবাদ কলহ কেলেঙ্কারিতে তাঁদের মধ্যে আরো দুস্তর ব্যবধান গড়ে ওঠে।

তবু, অমিয়ভূষণ স্বীকার করেন, বিয়ে করাই ভালো ছিল। তাঁর পক্ষে বরং অবিবাহিত থাকাটা এমন কিছু অস্বাভাবিক হত না, কিন্তু করুণার পক্ষে বড়ই বিসদৃশ। শুধু পড়ে আর পড়িয়ে কি ও সারাজীবন কাটাতে পারবে? তেমন কোন বড় আদর্শ তো সামনে নেই। করুণা অবলম্বন করবে কাকে?

অমিয়ভূষণ মনে মনে ঠিক করেছেন করুণার বিয়ের জন্যে তিনি আর এক-বার চেষ্টা করে দেখবেন। এই কীর্তিপুরেই দেশের কাজ করে বেড়াচ্ছে মণিময় সে কথা কানে গেছে অমিয়ভূষণের। পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে বেছে বেছে এই কীর্তিপুরকেই বা কেন সে কর্মভূমি করেছে তা বোঝা কঠিন নয়। মনে মনে একটু হাসলেন অমিয়ভূষণ। মণিময়কে এবার একদিন জোর করে ধরে আনতে হবে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করবেন একদিন। তারপর মধ্যস্থতা ক'রে ওদের বিবাদ মেটাবার চেষ্টা করবেন। এখনও সময় আছে। এখনও বিয়ে টিয়ে করলে ছেলেপু্ত্র হতে পারে করুণার। যদি নাও হয় তাতেই বা কি। সান্নিধ্যে সাহচর্যে দুজনে মিলে যে নীড় ওরা গড়ে তুলবে তাই হবে ওদের সন্তানের তুল্য। নারীপুরুষে মিলে দুজনের যৌথ সৃষ্টি দরকার। তা সে রক্ত-মাংসের সন্তানই হোক, আর সাধ-স্বপ্নের আদর্শই হোক। এমন কিছু অসম্ভব কল্পনা নয় অমিয়ভূষণের। ওদের মত রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে এমন চল্লিশ পেরিয়ে পঞ্চাশ পেরিয়ে বিয়ে তো আরো অনেকের

হয়েছে। এ ধরনের কথায় করুণা রাগ ক'রে বলেছিল, 'ও সব আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ যদি কর দাদা আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।'

করুণাকে জানিয়ে শুনিয়ে কিছু করবেন না অমিয়ভূষণ, হঠাৎ ওদের দেখা সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দু'জনকে চমকে দেবেন। অমিয়ভূষণের মা গোড়ায় এ ধরনের অসবর্ণ বিয়ের প্রস্তাবে আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু এখন আর করবেন না। শতদলবাসিনী আজকাল মাঝে মাঝে বলেন, 'বামুন হোক, কায়েত হোক, যে জাত ইচ্ছে হোক, আমার কিছুতে আপত্তি নেই, করুণা বিয়ে করলেই আমি খুশী।'

কিন্তু করুণার আর কাউকে খুশী করবার ইচ্ছা নেই। তবু যতদূর সাধ্য তিনি আবার চেষ্টা ক'রে দেখবেন। ওর যা বয়স চেহারায় তার চেয়ে অনেক কম দেখায়, তাই হয়ত একেবারে অসম্ভব হবে না। ভাবতে ভাবতে শোবার ঘরে ঢুকলেন অমিয়ভূষণ।

কমলাক্ষও ছাদের ঘরে গিয়ে ঢুকল কিন্তু শুয়ে পড়ল না। সেতারের ঢাকনিটা খুলে ফেলল আস্তে আস্তে। জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ঘরে। বাজাবার জন্যে আজ আর হ্যারিকেন জ্বালতে হবে না। চাঁদের আলোই যথেষ্ট। আজ একটি মেয়ে কমলাক্ষকে বলেছে সেদিন রেডিয়োতে বাজনা শুনে খুবই ভালো লেগেছে তার। যন্ত্রসঙ্গীতের ওপর তার নাকি এতদিন কোন আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু সেদিনের সেই সুর তার আজও নাকি কানে লেগে রয়েছে। এর পর আবার যেদিন প্রোগ্রাম থাকবে সেদিন যেন মালাকে দয়া ক'রে একটা খবর পাঠায় কমলাক্ষ। কমল অবশ্য বলতে পারত, খবর পাঠাবার দরকার কি? বেতার জগত থেকে আমার প্রোগ্রামটা দেখে নেবেন।' কিন্তু বলেনি। এমন কি ও ধরনের কোন কথা মনেও পড়েনি কমলাক্ষের। বরং উল্টোটাই বলে এসেছে। প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে জানাবে বলে। অবশ্য প্রোগ্রাম সে ঘন ঘন পায় না। তিন চার মাস অন্তর মাঝে মাঝে পায়। তাই বেতার জগৎ ঘাঁটিবার কথাটা মালাকে না বলেই সে ভালো করেছে। কিন্তু মালা শুধু তার বাজনার সুখ্যাতিই করেনি, তাকে

নিমন্ত্রণ করেও রেখেছে। তাদের কলোনীতে রবীন্দ্র-জয়ন্তী হবে। সেই উপলক্ষে দয়া ক'রে যেতে হবে কমলাক্ষকে। অবশ্য ক্লাবের পক্ষ থেকে ছেলেরা নিশ্চয়ই যাবে তার কাছে। কিন্তু মালা তাকে আগেই অনুরোধ ক'রে রাখল।

হাসপাতালের মধ্যে নার্সের ইউনিফর্ম-পরা একটি মেয়ের মুখে নিজের বাজনার সুখ্যাতি শোনা, ফের বাজাবার জন্যে অনুরোধ শোনা, আমন্ত্রণ পাওয়া এই প্রথম। এর আগে আরো অনেক মেয়ের মুখে মাঝে মাঝে প্রশংসা শুনেছে কমলাক্ষ, কিন্তু অমন পরিবেশে অমন একটি মেয়ের আন্তরিক মুগ্ধতা প্রত্যক্ষ করেনি। হ্যাঁ, মালার প্রত্যেকটি কথা যে অকৃত্রিম তাতে কোন সন্দেহ নেই কমালাক্ষের। কোন কথা ঠোঁটের আর কোন কথা হৃদয়ের তা বুঝবার মত ঢের বয়স হয়েছে তার।

দেখা হয়ে গেল আকস্মিকভাবে। অবশ্য একেবারে আকস্মিক বলা যায় না। সুনন্দাকে ভর্তি ক'রে দেওয়ার জন্যে অজয়ের সঙ্গে কমলাক্ষ যখন ট্যাক্সিতে ক'রে হাসপাতালের ভিতরে ঢুকল তখনই মালার কথা মনে হয়েছিল তার। অবশ্য তার আগেও হাসপাতালের সামনে দিয়ে বাসে ক'রে যাওয়া-আসার সময় কমলাক্ষের মাঝে মাঝে মনে পড়েছে ওর কথা। এখানে একটি মেয়ে আছে যার সঙ্গে কমলাক্ষের পরিচয় হয়েছিল, একরাত্রে বাসের একটি লেডীজ সীটে পাশাপাশি বসে কথা বলতে বলতে এসেছিল তারা। এমন তো কতজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, কিন্তু সে-কথা কি তারপর মনে ক'রে রেখেছে কমলাক্ষ? কিন্তু আশ্চর্য, মালার কথা তার মনে আছে। তার বড় বড় দুটি চোখ আর সেই চোখের তাকাবার সুন্দর ভঙ্গিটুকুর মধ্যে এমন কিছু আছে যা সহজে ভোলা যায় না। তার কথার মধ্যে এমন একটু মাধুর্য আছে যা গানের সুরের মত কানে লেগে থাকে। অথচ মালা যে গানবাজনা জানে, কোনদিন চর্চা করেছে, এমন কথা সে কিছুতেই স্বীকার করল না।

বাসে করে আসা-যাওয়ার পথে হাসপাতালের দিকে তাকিয়ে মালার কথা তার মাঝে মাঝে মনে হলেও ভিতরে গিয়ে খোঁজ নেওয়ার কথা কমলাক্ষ কোনদিন ভাবেনি। অত অল্প পরিচয়ে তেমন কথা ভাবাও যায় না। কিন্তু

আজ অজয়ের স্ত্রীকে লেবার ওয়ার্ডে ভর্তি করতে এসে মালার খোঁজ সে ইচ্ছা ক'রেই নিয়েছিল। যদি না নিত, কিছুতেই অত ভিড়ের মধ্যে তার সঙ্গে মালার দেখা হত না। বাপ-মায়ের অমতে নিজের পছন্দমত মেয়েকে ভালো-বেসে বিয়ে করবার মত সাহস তার থাকলেও, আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে আলাদা হয়ে থাকবার মত মনের জেদ তার থাকলেও অসুখ বিসুখ, ডাক্তার হাসপাতালের ব্যাপারে অজয় চিরকালই বড় নার্ভাস। কমলাক্ষ নিজেও অবশ্য খুব সবলচিত্ত নয়। নিজের কাজ ছাড়া অন্য ব্যাপারে সেও বেশ অপটু ; তবু অজয়ের মত অত ভয় সে পায় না। স্ত্রীর যন্ত্রণা দেখে এমন বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল অজয়ের মুখ যেন যে-কোন মুহূর্তে তার বিপত্নীক হওয়ার আশঙ্কা আছে। সুনন্দার সাহস ওর চেয়ে বেশি। নিজের শারীরিক কষ্টের মধ্যেও সে বার বার বলছিল, 'আমার জন্যে ভাববেন না কমলবাবু, আপনি আপনার বন্ধুকে সামলান।'

সুনন্দাকে ওয়েটিং রুমে নিয়ে আসবার পর অজয় তার পরিচিত হাউস সার্জনের খোঁজ নিতে গিয়েছিল। তাঁর দেখা না পেয়ে আরো হতাশ হয়ে পড়েছিল অজয়। বলেছিল, 'দেখতো কাণ্ড, ভদ্রলোক ছুটি নেওয়ার আর সময় পেলেন না? এখন উপায়?'

অবশ্য অজয়ের এই ডাক্তার বন্ধু না থাকলেও সুনন্দাকে ভর্তি করবার কোন বাধা ঘটেনি। পেয়িং বেড দেবে বলেই তারা ঠিক করেছে। বেডও যথেষ্ট খালি পড়ে রয়েছে, অসুবিধা কিসের। সহজেই সুনন্দাকে ওরা ভর্তি করে নিল। অজয় তবু বলল, 'জানা শোনা কেউ থাকলে সুবিধে হত। খোঁজ খবর নেওয়া, কখন কেমন থাকে দরকার হলে জানানো—'

কমলাক্ষের অনেকক্ষণ ধরেই মালার কথাটা মনে পড়ছিল। এবার ফাঁক পেয়ে বলল, 'একজন নার্সের সঙ্গে আমার অবশ্য জানা-শোনা আছে, তাকে খবর দিতে পারি।'

অন্য সময় হ'লে অজয় নিশ্চয়ই এই নিয়ে বন্ধুকে ঠাট্টা করতে ছাড়ত না। কিন্তু এখন বিরক্ত হয়ে বলল, 'নার্স কি করবে?'

কমলাক্ষ বলল, 'যা করবার নার্সই তো করবে। সেবাশুশ্রূষা, খোঁজখবর নেওয়া, কোন্‌টা সে না করতে পারবে শুনি। তাছাড়া অনেকদিন ধরে এ সব কাজ করছে। সব আটঘাট সে জানে।'

অজয় বলল, 'তাহলে দাও খবর।'

কমলাক্ষ বলল, 'অবশ্য খবর দিলেই যে পাব তার কোন কথা নেই। এ সময় ডিউটি আছে কি না তার ঠিক কি।'

কিন্তু দেখা গেল ডিউটি আছে। খবর পাওয়ার মিনিট পাঁচেক পরে মালা বাইরে এসে তাদের সঙ্গে দেখা করল। কমলাক্ষের দিকে চেয়ে বিস্মিতভাবে বলল, 'হঠাৎ আপনি যে এখানে? কি ব্যাপার?'

ব্যাপারটা সব খুলে বলল কমলাক্ষ। বলল, 'অজয় আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমরা একই ওস্তাদের কাছে সেতার শিখেছি। ও আমাকে বিদ্যায় অনেক ছাড়িয়ে গেছে। অভিজ্ঞতাতেও অনেক ছাড়িয়েছে। ওর স্ত্রীকে ভর্তি ক'রে দিয়ে গেলাম। আপনি যদি একটু লক্ষ্য রাখেন—'

মালা মৃদু হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই রাখব। লক্ষ্য রাখাই তো আমাদের কাজ। সতের নম্বর বেড তো? পেশেণ্ট বেশ ভালো আছে। কিচ্ছু ভাববেন না।'

মালার সহজ অনায়াস ভঙ্গি দেখে বিস্মিত হচ্ছিল কমলাক্ষ। কোন বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকলে সাধারণ একটি মেয়েও অসাধারণ আত্মবিশ্বাস আর নির্ভীকতার সঙ্গে কথা বলতে পারে। আর তেমন প্রত্যয়বতী কোন মেয়ে সাধারণ নার্সের কাজ করলেও যে তাকে এত চমৎকার দেখায় তাও যেন কমলাক্ষ এই প্রথম লক্ষ্য করল।

অজয় বলল, 'কোন দরকার টরকার হলে যেন খবর পাই। আমার ঠিকানা রেখে যাচ্ছি।'

মালা বলল, 'নিশ্চয়ই পাবেন। ও-বেলায় পাঁচটা নাগাদ পুরোপুরি সুখবর পাবেন বলে মনে হচ্ছে।'

নিজের প্রগলভতায় এবার লজ্জিত হল মালা। একটু বাদে মুখ তুলে বলল, 'স্টাফ নার্স ওই রকমই বলছিলেন।'

তারপর কমলাক্ষের দিকে চেয়ে বলল, 'আমার আজ এ বেলা ও বেলা দু' বেলাই ডিউটি। বিকেলের দিকে যদি আসেন খবর দিতে পারব।'

যথাসময়ে খবর নিতে গিয়েছিল কমলাক্ষ আর অজয়। খবর পেতে একটু দেরি হয়েছিল অবশ্য। রাত আটটা নাগাদ তারা অজয়ের ছেলে হওয়ার কথা জানতে পেরেছে। তারপর মালার ডিউটি শেষ হয়ে যাওয়ায় কমলাক্ষ একই বাসে, সেদিনের মত একই সীটে পাশপাশি বসে ফিরেছে কীর্তিপুরে। সেটা অবশ্য বড় কথা নয়। কিন্তু তার চেয়ে বেশি মনে রাখবার মত তাদের পথের আলাপ।

কথায় কথায় মালা বলেছিল, সাহিত্যে সঙ্গীতে তারও আগ্রহ কম ছিল না। কিন্তু সময় আর সুযোগের অভাবে কিছুই হয়ে উঠল না। মালা নিজে শিল্পী নয়, কিন্তু শিল্পকে ভালোবাসে, শিল্পীকে শ্রদ্ধা করে। তার কথার ধরনে তা টের পেয়েছে কমলাক্ষ। মালাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছে, 'আপনার ক্ষোভ করবার কোন কারণ নেই। আপনি যা করছেন আর্তের সেবা—কাজ হিসেবে সেও তো কম বড় কাজ নয়।'

মালা একটু হেসে বলেছিল, 'অমন ক'রে বলবেন না। তাহলে বড় লজ্জা পাব। আমরা আমাদের সংসার চালাবার জন্যে চাকরি করি। যন্ত্রের মত অভ্যাসবশে কাজ করে যাই। বড় কাজের বড় আনন্দ আমাদের ভাগ্যে জোটে না। সুরের ভিতর দিয়ে যে আনন্দ আপনারা পান তা আমরা কোথায় পাব।'

কমলাক্ষ মুহূর্তকাল নির্বাক হয়ে রয়েছিল। মালার মুখ থেকে এ ধরনের কথা সে আশা করেনি। এতো সাধারণ একজন নার্সের কথা নয়। জীবন সম্বন্ধে যে ভেবেছে, জীবনের অসম্পূর্ণতার দুঃখ যে অনুভব করেছে, এ তারই কথা।

একটু বাদে মালা ফের বলেছিল, 'তবে আমাদের কাজের মধ্যে যে কোন আনন্দই নেই একথাও ঠিক নয়। পেশেণ্টের মুখে যখন হাসি দেখি, তাকে সুস্থ দেখে তার বাড়ির লোকজন যখন খুশী হয়ে ওঠেন, কেউ কেউ ধন্যবাদ

পর্যন্ত জানান তখন আমরাও কিছুক্ষণের জন্যে চাকরির কথাটা ভুলে যাই, টাকার সম্পর্কের কথাটা ভুলে যাই। তা ছাড়া যে কোন কাজ ভালো ক'রে করতে পারলে ভালো লাগে। কি বলুন?'

কমলাক্ষ সায় দিয়ে বলেছিল, 'নিশ্চয়ই। সেই ভালো লাগাতেই সৃষ্টির আনন্দ। সেই অর্থে যে-কোন কাজ করাই সৃষ্টি করা।'

হঠাৎ কমলাক্ষের খেয়াল হল সে অনেকক্ষণ ধরে সেতার কোলে নিয়ে বসে আছে। হৃদয় এক অদ্ভুত সুরে বেজে চললেও যন্ত্র বাজছে না। লজ্জিত হয়ে বাজাতে শুরু করল কমলাক্ষ। আজ সারা রাত ধরে কমলাক্ষ রেয়াজ করবে। সহজে নিজেকে নিষ্কৃতি দেবে না, ক্ষমা করবে না।

১৩

সন্ধ্যাবেলা চায়ের নিমন্ত্রণ। কিন্তু প্রভাকর দত্তগুপ্তের বাড়িতে অতিথিদের অভ্যর্থনার ব্যাপার নিয়ে সকাল থেকেই আলোচনা হচ্ছিল। শোয়ার ঘরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে শেভ করতে করতে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলেন প্রভাকর। এখন তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি। কিন্তু বেশ শক্ত মজবুত শরীর। কালো রোগাটে চেহারা। মাথায় পাকা চুল বড় একটা চোখে পড়ে না। তাই বয়সটা অত বেশি বলে মনে হয় না। হঠাৎ দাঁতগুলি অবশ্য বছর দশেক আগে প্রায় সবই পড়ে গিয়েছিল। বাকি যে কটা ছিল, ডাক্তার দিয়ে তুলে ফেলে বাঁধিয়ে নিয়েছেন প্রভাকর। দামী পাথরের দাঁত। সেটটা এমনভাবে বসে গেছে যে, আসল দাঁত বলেই মনে হয়। রাত্রে শোয়ার সময় জলভরা বাটির মধ্যে প্রভাকর যখন খুলে রাখেন দাঁত, তার কৃত্রিমতা হঠাৎ একেক-দিন চোখে পড়ে বিভাবতীর। দন্তহীন মুখ আর তোবড়ানো গালে স্বামীকে শুধু বৃদ্ধ নয়, কুদর্শনও মনে হয়। কিন্তু দেখে দেখে চোখে সয়ে গেছে বিভাবতীর। শুধু তাই নয়, স্বামীর এই রূপই বরং ভালো লাগে তাঁর চোখে। দিনের বেলায় কড়ামেজাজী, বদরাগী স্বামী রাত্রে বাঁধানো দাঁত খুলে ফেলে জীর্ণদেহে অসহায় চেহারা নিয়ে তাঁর কাছে যখন ধরা দেন, বিভাবতীর ভারি মায়াই হয় আজকাল। মানুষটি সেই মায়ামমতাটুকুই যেন প্রত্যাশা করে। বিভাবতীর মনে হয় কৃত্রিম দাঁত খুলে রেখে কৃত্রিম খোলসও খুলে ফেলেছেন প্রভাকর। এবার আসল মানুষটির সান্নিধ্য পাচ্ছেন, স্পর্শ পাচ্ছেন তিনি। বিভাবতীরও বয়স হয়েছে, তাঁরও দু-একটা করে দাঁত পড়তে, দু-চারগাছি করে চুল পাকতে শুরু করেছে। দাম্পত্য-চুক্তিতে এতকাল বাদে স্থায়ী স্বাক্ষর পড়েছে। এখন কোন রকম ঝগড়াঝাঁটিকে আর ভয় হয় না, তেমন দুঃসহও মনে হয় না। দুজনেই জানেন যে কয়েক

ঘণ্টা পরেই আবার তাঁদের মিল হবে। তাছাড়া আগের তুলনায় ঝগড়ার পরিমাণ আর প্রচণ্ডতা দুই-ই কমে গেছে। মিলটাই আজকাল দুজনের মধ্যে বেশি। আজকাল অশান্তির কারণ নিজেদের মতবিরোধ নয়, আশান্তির মূল আজকাল ছেলের চালচলন, আচার-ব্যবহার। তাই নিয়েই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা হচ্ছিল।

প্রভাকর সাবান-মাখা গালে সেফটি রেজর টানতে টানতে আয়নার দিকে তাকিয়ে ভ্রূ-কুঁচকে বললেন, 'হঠাৎ অমিয়বাবুদের মৃগাঙ্ক নিমন্ত্রণ করতে গেল কেন?'

বিভাবতী তাঁর ডানদিকে খাটের ওপর বসে দ্বিতীয়বার চা খাচ্ছিলেন। কাপটা একটু নামিয়ে নিয়ে বললেন, 'কেন গেল, তা তুমিও জানো, আমিও জানি। তোমারই তো ছেলে।'

প্রভাকর একটু তীব্রস্বরে বললেন, 'খোঁটা দেওয়ার অভ্যাসটা তুমি আজও ছাড়তে পারনি দেখছি। তার মানে অমিয়বাবুর একটি সুন্দরী মেয়ে আছে, এই তো?'

বিভাবতী ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে একবার তাকিয়ে দেখে বললেন, 'আস্তে। কি যে যা তা বল যখন তখন। ঝি-চাকররা সব রয়েছে। কার কখন কানে যাবে।'

স্ত্রীর সতর্কতায় প্রভাকর একটু হাসলেন। 'কানে যেতে কি চোখে পড়তে কারো বাকি আছে নাকি?'

বিভাবতী বললেন, 'তবু তোমার মুখের এসব কথা তাদের কানে না যাওয়াই ভালো।'

মনে হল প্রভাকর স্ত্রীর কথাটা তখনকার মত মেনে নিলেন। নীরবে আরো কিছুক্ষণ রেজর টেনে গেলেন থুতনিতে। তারপর হঠাৎ বললেন, 'কিন্তু এমন ক'রে কতদিন চলবে?'

বিভাবতী বললেন, 'যতদিন তুমি চালিয়েছ। বুড়ো না হওয়া পর্যন্ত।'

প্রভাকর এবার বিরক্ত হয়ে বললেন, 'দেখ, বার বার আমার সঙ্গে তুলনা

করো না। আমি কেবল মেয়েদের পিছনে পিছনেই ঘুরিনি, বিষয়-আশয় ব্যবসা-সম্পত্তিও গড়ে তুলেছি। তারা আমার কাজের উদ্যম বাড়িয়েছে, উদ্যম জুগিয়েছে। আমি কোন মেয়ের পায়ে আমার যথাসর্বস্ব ঢেলে দিইনি।'

বিভাবতী বললেন, 'তোমার ছেলে তোমার চেয়ে এক কাঠি ওপরে তো যাবেই।'

স্ত্রীকে ছেলে সম্বন্ধে এরকম নিরাসক্ত ভঙ্গিতে কথা বলতে দেখে আহত হলেন প্রভাকর। এই ঔদাসীন্য এই অভিমান যেন বিভাবতীর ছেলের ওপর নয়, স্বামীর ওপরই।

একটু চুপ ক'রে থেকে প্রভাকর বললেন, 'দেখ, ও যে এমন হবে, আমি তা ভাবিনি। আমি বরং ভেবেছিলাম আমাকে দেখে ওর শিক্ষা হবে!'

একটু যেন করুণ সুর বাজল প্রভাকরের কথায়। তবে কি এতদিন বাদে তাঁর অনুশোচনা এসেছে? ছেলের আচরণ দেখে নিজের আগেকার চালচলনের জন্যে লজ্জিত হচ্ছেন প্রভাকর। এই লজ্জা আর অনুশোচনার মধ্যে যেন স্বামীকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে পেলেন বিভাবতী। কিছুকাল ধরেই পাচ্ছেন।

বিভাবতী বললেন, 'কি শিক্ষা হবে? তোমার তো দৈন্যদশা ও দেখেনি, বরং তোমার প্রতিপত্তিই ও বাড়তে দেখেছে। বাইরের সকলের কাছেই তো নামী পুরুষ, কীর্তিমান পুরুষ। ভিতরে ভিতরে পুড়ে মরেছি কেবল আমি।'

একটু অনুকম্পা হল প্রভাকরের। তিনি নরম গলায় বললেন, 'বেশির ভাগই মিথ্যে আগুনে পুড়েছ বিভা। আমি সাধু ছিলাম একথা বলিনে। কিন্তু যাকে লম্পট-বদমাস বলে তাও ছিলাম না। তাহলে যা করেছি, তার সিকিও করতে পারতাম না। কোথায় থামতে হয়, কখন থামতে হয়, তা আমি জানতাম।'

বিভাবতী তর্ক করলেন না। কতদিন যে তিনি মাথা খুঁড়ে জোর ক'রে স্বামীকে থামিয়েছেন, সেকথা আজ আর তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন না। বরং

ছেলের সম্বন্ধেই উদ্বেগ জানালেন। বললেন, 'তোমার [illegible]। [illegible]
বাবুদের বলে এসেছে। অবশ্য পাড়াপড়শীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়, তাদের সঙ্গে মেলামেশা জানাশোনা হয়, সে তো ভালই। কিন্তু যা বেপরোয়া ছেলে তোমার, সেইজন্যেই তো ভয়। এই কলোনীর মধ্যে কোন কাণ্ড-টাণ্ড করলে কেলেঙ্কারীর আর সীমা থাকবে না।'

প্রভাকর বললেন, 'আরে না না। মৃগাঙ্ক অত বোকা ছেলে নয়। তাছাড়া এখন বয়স হয়ে গেছে। এখন শুধু বাপ-মায়ের শাসন নয়, সমাজের শাসন, সরকারের শাসনও তাকে মেনে চলতে হয়। যা খুশি তাই করব, ভাবলেই কি ও যা খুশি তাই করতে পারে? দুটো পয়সা করেছি বলে আমি তো আর মুল্লুক কিনে বসিনি, রাজ্যসুদ্ধ লোকের মাথাও কিনতে পারিনি।'

এ ধরনের বিনয়, সমাজ আর রাষ্ট্রের ওপর এই নির্ভরশীলতা প্রভাকরের মুখে এই প্রথম শুনলেন বিভাবতী। তাঁর মনে হল সত্যি তো অত ভয় করবার কি আছে! তাঁর ছেলেকে সামলে রাখার দায় তো শুধু তাঁরই নয়, দশজনের কথা ভেবে সে নিজেও নিজেকে সামলাবে। তাছাড়া অহরহ যা তা করে বেড়াচ্ছে, পরের ঘরের মেয়ে-বউকে বের করে যখন-তখন আনছে, এমন খারাপ ছেলেও মৃগাঙ্ক নয়। কেবল বিভাবতীর মামাতো বোনের মেয়ে সুলতা আর অফিসের টাইপিস্ট মেয়ে রেখা রায় সম্বন্ধেই ওর নামে যা-তা রটেছিল। তাছাড়া আর কোন ঘটনার কথা বিভাবতীর কানে আসেনি। তা তিনি যতটা দেখেছেন শুনেছেন, সুলতা আর রেখার দোষ ছিল। মেয়েদের কাছ থেকে তেমন ইশারা-ইঙ্গিত না পেলে কি পুরুষে এগোতে পারে? কিন্তু যত দোষ পড়ল গিয়ে তাঁর ছেলের ঘাড়ে। এখন বিভাবতীর ইচ্ছা ওর বিয়ে-থা দেন। শুধু তিনি নন, বউও যদি একদিক থেকে ওকে আগলে রাখে, তাহলে শুধরে যাবে মৃগাঙ্ক। কিন্তু ছেলে কিছুতেই মাথা পাতে না। ও পরিষ্কারই বলে, 'আমি তোমাদের বিয়ে-টিয়েতে বিশ্বাস করিনে।'

বিভাবতী বলেন, 'কিন্তু তুমি তো বাপু সন্ন্যাসীও নও। বিয়ে-টিয়ে যদি না করতে হয়, তেমন শুদ্ধ-শান্তভাবে থাক। আর যদি পারবে না মনে কর,

তাহলে আমাদের কথা শুনে বিয়ে কর। তোমার যাকে খুশি তাকে বিয়ে করতে পার। আমার তাতে কোন আপত্তি নেই।'

মৃগাঙ্ক বলে, 'না মা। কারো সঙ্গে ও ধরনের স্থায়ী চুক্তি করতে আমি রাজী নই। অমন বজ্র-আঁটুনি ফসকা গেরোয় বিশ্বাসও নেই আমার।'

এক একদিন রাগ করে ওঠেন বিভাবতী। বলেন, 'ছি ছি ছি! কি যা তা বলছিস মৃগাঙ্ক। আমার কাছে ওসব কথা বলতে তোর লজ্জা করে না? আমি না তোর মা?'

মৃগাঙ্ক জবাব দেয়, 'তুমি মা বলেই তো তোমাকে খোলাখুলিভাবে সব কথা বলতে পারছি। আর কেউ একথা শুনলে তো গালে হাত দিয়ে বলবে, 'ও-মা'!''

বিভাবতী হেসে বলেন, 'থাক বাপু, আর জ্বালাসনে।'

তাঁর এখনও মনে হয় তাঁকে জ্বালাবার আব চটাবাব জন্যে মৃগাঙ্ক ও ধবনের কথাবার্তা বলে। আসলে ও যা বলে, তা ও নিজেই বিশ্বাস কবে না। বললে অদ্ভুত শোনাবে ব'লে বলে। বিভাবতীব এখনও ধারণা তেমন সুন্দবী, শিক্ষিতা কোন মেয়েকে মৃগাঙ্কব এখনও চোখে পড়েনি। তাই কাউকেই তার পাকাপাকিভাবে মনে ধরছে না। অবশ্য তেমন একটি মেয়ের সন্ধান আনার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি নেই বিভাবতীব। ঘটক লাগিয়েছেন, কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে খোঁজখবর করেছেন, কিন্তু রূপ-গুণ-বিদ্যা-বুদ্ধি, কুলশীল সবই আছে, মৃগাঙ্কের জন্যে তেমন মেয়ের সন্ধান পাননি। যাচাই-বাছাই ক'রে যে দু-একটি মেয়েব ফটো তিনি ছেলেকে দেখিয়েছেন তা ওর পছন্দ হয়নি।

বিভাবতী রাগ ক'রে বলছেন, 'তোর বউ মাটিতে পাওয়া যাবে না। তুই কোন ডানাকাটা পরীকে আকাশ থেকে নামিয়ে আনিস, আমি তাই দেখব। এত বাছাবাছি যারা করে তাদের ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত কানা খোঁড়া, বোবা কালা কিছু একটা জোটে।'

মৃগাঙ্ক হেসে বলে, 'আমারও তাই ইচ্ছে মা। তুমি আশীর্বাদ কর আমার

যেন তেমন একটি বউই আসে। তাহলে সে চিরকাল আমার দয়া পেয়ে বর্তে যাবে, আর বেশি কিছু দাবি করবে না।'

বিভাবতী হঠাৎ বলে ফেলেন, 'যাদের হাত পা নাক চোখ আছে, তাদেরই বা তোমরা দয়া ছাড়া আর কি কর!'

দাড়ি কামানো শেষ করে মুখ ধোয়ার জন্যে বাইরে যাবেন প্রভাকর, বিভাবতী বললেন, 'তাছাড়া আরো একটা মতলব আমাব আছে।'

প্রভাকর মুখ ফিরিয়ে হেসে বললেন, 'লোকে আমাকেই শুধু মতলববাজ বলে, কিন্তু মতলব ভাঁজতে আমাব স্ত্রী পুত্রও যে কারো চেয়ে কম যান না, সে খবব কেউ রাখে না। তোমাব মতলবটা কি শুনি?'

বিভাবতী বললেন, 'তেমন খারাপ কিছু নয়। আমি বলছিলাম, অমিয়বাবুব মেয়েটি তো বেশ সুন্দরী। এ-দিকে এম-এ পাশ করেছে। জাতেও বৈদ্য। অবস্থা টবস্থা দেখে একেবারে হাঘরে বলে মনে হয় না—'

প্রভাকর বললেন, 'অত ভনিতা কবতে চাও কেন। এককথায় বলে ফেল, ওদের সঙ্গে কুটুম্বিতা কবতে চাও।'

বিভাবতী বললেন, 'যদি চাই-ই তাতে দোষটা কি।'

প্রভাকর বললেন, 'দোষ একটু আছে বই কি। বন্ধুতাই বল আর কুটুম্বিতাই বল, সমানে সমানে কবতে হয়। এটা এক-আধদিনেব ব্যাপাব নয় যে দয়াধর্ম করবে। অমিয়বাবুব মত একজন মাস্টারের মেয়েকে ঘরে আনলে আমাব মান-সম্মান বাড়বে না। তাছাড়া একতলা একখানা বাড়ি তুলে ভদ্রলোক তো দেনায় হাবুডুবু খাচ্ছেন। মেয়েব বিয়ে তিনি দেবেন কি করে?'

বিভাবতী বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তুমি সে খবরও রাখ?'

প্রভাকর বললেন, 'আমাকে সব খবরই বাখতে হয়। এই কীর্তিপুবে যারা আছে, কলোনীর বাইরেই হোক আর ভিতরেই হোক, তাদের প্রত্যেকেব নাড়ী-নক্ষত্র আমার জানা।'

বিভাবতী বললেন, 'কিন্তু হলেনই বা অমিয়বাবুরা গবীব। মেয়েটিতো

ভালো। যাই বলো ওই ধরনের গৃহস্থ ঘরের মেয়ে আনাই উচিত। দেমাক্‌ টেমাক কিছু থাকবে না, বেশ হবে। কথায় বলে উঠতি ঘরে মেয়ে দিতে হয় আর পড়তি ঘর থেকে মেয়ে আনতে হয়। তাহলেই কুটুম্বিতা ক'রে সুখ থাকে।'

প্রভাকর হেসে বললেন, 'অমিয়বাবুর মত মানুষ উঠলেনই বা কবে আর পড়লেনই বা কবে সে-খবর তো জানিনে। তুমি ভেব না, মঞ্জুকে যেমন ঘরে দিয়েছি, মৃগাঙ্কের বউও তেমন ঘর থেকেই আনব।'

কথা মিথ্যা নয়। তাঁদের মেয়ে মঞ্জু বেশ বড় ঘরেই পড়েছে। তার শ্বশুরের ওষুধের ব্যবসা আছে। বাপ মারা যাওয়ার পর নির্মলই সব দেখা-শোনা করে। বাড়ি গাড়ি গয়নাগাটি কিছুরই অভাব নেই। তবু মেয়েটার মুখ দেখলে মনে হয় না যে, সুখে আছে। অথচ বিভাবতীর স্বামী-পুত্রের মত নির্মলের যে কোন বদখেয়াল আছে তা নয়। সে অল্প বয়স থেকেই সংসারী মানুষ, বিষয়ী মানুষ। মদ মেয়ের ধারেও ঘেঁষে না। নিজের ব্যবসায়কে বড় করা, মুনাফা বাড়িয়ে তোলার চিন্তায় সে মশগুল। স্ত্রীকে অবসর মত যত্নও করে, সিনেমা দেখাতে নিয়ে যায়, বছরে দু'বার ক'রে চেঞ্জে পাঠায় তবু মঞ্জুর মুখ ভারভার। কে জানে ছেলেপুলে কিছু হল না বলেই হয়ত। সবারই কপালে সব সুখ হয় না। কিন্তু মঞ্জু বাপের বাড়ি এসে ছেলেপুলে না হওয়ার জন্যে আফসোস করে না। অন্য কথা বলে। 'আমি ও বাড়িতে আসবাবপত্রের সামিল মা। তার চেয়ে বেশি দাম ওরা আমাকে দেয় না। বাড়ির ঝি-চাকরের যে স্বাধীনতা আছে, আমার সে স্বাধীনতাটুকুও নেই।'

বিভাবতী অবশ্য মেয়েকে আমল দেন না, ধমকই দেন। বলেন, 'অঢেল সময় আছে হাতে, ভগবানের আশীর্বাদে টাকা-কড়িও আছে। আর কোন্‌ স্বাধীনতা তুই চাস শুনি? খুশিমত বই পড়বি, সেলাই করবি, মন দিয়ে ঘরসংসার করবি। দেখবি জীবনটা বেশ স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। স্বাধীনতা কাধিনতা ওসব ধরতাই বুলি ছেড়ে দে।'

মেয়ে হেসে বলে, 'মা, তুমি আমার দুঃখ বুঝবে না।'

একটু একটু যে না বোঝেন বিভাবতী তা নয়। কিন্তু বুঝে করবেন কি? বুঝলেও কি কিছু করবার জো আছে? ভালো খেয়ে, ভালো পরেও মানুষের যে-দুঃখ থেকে যায় সে-দুঃখ ঘোচানো কি সহজ?

হাত মুখ ধুয়ে এসে এক কাপ দুধ খেলেন, ঘরে তৈরী একটি সন্দেশ খেলেন প্রভাকর, তারপর মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সোনার বোতাম লাগানো মিহি খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি পরে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। জরুরী দরকার আছে ব্যারিস্টার বন্ধুর সঙ্গে। যাওয়ার আগে স্ত্রীকে বলে গেলেন, 'আমার ফিরতে দেরী হতে পারে, তোমরা খেয়ে নিয়ো। আর ওসব কুটুম্বিতা-টুটুম্বিতার কথা মনেও এনো না। তবে পাড়াপড়শীকে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ করে খাওয়াতে চাও, সে ভালো কথা। ওদের গৃহপ্রবেশের সময় ওরাও তো আমাদের বলেছিল। বাইরে গিয়েছিলাম বলেই যাওয়া হয়নি। তা ছাড়া অমিয়বাবুদের পরিবারটি বেশ ভালো। ওদের দিয়ে আমার কাজ হবে।'

বিভাবতী ভ্রূ কুঁচকে বললেন—'কি কাজ হবে শুনি?'

প্রভাকর হেসে বললেন, 'ভয় পেয়ো না। এখন তো গলিত নখদন্ত। এখন আর ভয় কিসের? অকাজ-কুকাজ নয়, সৎকাজই হবে। যারা সৎ, তারা প্রায়ই নিজেদের সততাকে কাজে লাগাতে পারে না। সেখানেও আমাদের মত কণ্ট্রাক্টরকেই মাথা খাটাতে হয়।'

১৪

আময়বাবুদেব আসতে আসতে সন্ধ্যা ছটা হল। করুণা ছাডা বাডির সবাই এসেছে নিমন্ত্রণ রাখতে। এমন কি, কমল বেরোবে বেরোবে করছিল, তাকেও শতদলবাসিনী জোব ক'রে আটকে বেখেছেন। ধরে নিয়ে এসেছেন এখানে। বলেছেন, 'মৃগাঙ্ক অত ক'বে বলে গেল, না গেলে কি ভালো দেখায়? তোর বাজনা শুনবে বলে সবাই অপেক্ষা করছে।'

কমল বলল, 'দোহাই ঠাকুরমা, বাজাতে আমি পাবব না।'

'কেন পারবিনে শুনি?'

'আমাব মুড নেই। তোমবা ভাব আমি নিজেব খেয়ালে চলি। তা নয়। আমাকে যন্ত্রেব খেয়ালও মানতে হয়। সে কি সব সময় বাজে?'

শতদলবাসিনী বললেন, 'কি যে বলিস মাথামুণ্ডু আমি তোদের কথা কিচ্ছু বুঝতে পারিনে। তারেব জিনিস, তাব আবাব না বাজবাব কি আছে? বাজালেই বাজে।'

এনাক্ষী হেসে বলল, 'তুমি ভুল করছ ঠাকুরমা। দাদা যে-সে তারেব কথা বলছে না। তার হৃদয়তন্ত্রীর কথা বলছে। মাঝে মাঝে একটু হেঁয়ালি-টেঁয়ালি না করলে শিল্পী বলে মানবে কেন লোকে?'

শতদলবাসিনী বললেন, 'বেশ না বাজাল, এমনিই গিয়ে আলাপ-পবিচয় করে আয় আজ। তাও তো মানুষেব সঙ্গে মানুষে করে।'

কমলকে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজী করা গেলেও করুণাকে কেউ রাজী করাতে পারল না। কল্যাণীর অনুরোধের জবাবে সে বলল, না বউদি, তোমরাই যাও, আমার শবীবটা ভালো লাগছে না।'

কল্যাণী বললেন, 'অনর্থক শবীরের ঘাডে দোষ চাপাচ্ছ কেন করুণা, যাওয়াব ইচ্ছে নেই সেই কথা বল। যখনই আমবা সবাই মিলে আমোদ-

আহ্লাদ করতে যেতে চাই, তুমি বেঁকে বস। এই যদি তোমার দাদার সঙ্গে, কি কমলের সঙ্গে একা-একা বেড়াবার কথা উঠত, তুমি নিশ্চয়ই যেতে। আসলে তুমি বড় অসামাজিক। তুমি মানুষ-জন ভালোবাস না। নিজের বাড়িরও না, পরের বাড়িরও না।'

করুণা মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও হেসে বলল, 'বউদি, আমার এই বয়সে তুমি সব দোষ-ত্রুটি শুধরে দেবে, তেমন সংস্কারের আশা ছাড়ো। হাজার বার ঝাঁট দিলেও সব ধুলো যাবে না। তোমরা যাও বেড়িয়ে এসো। তোমাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় পাকা হোক, আমি না হয় পরে একদিন যাব। দাদার সঙ্গে না, তোমার সঙ্গেই।'

কল্যাণী আর কোন কথা বললেন না। অমিয়ভূষণ বললেন, 'থাক থাক। ও যদি না যেতে চায়, না গেল। অনর্থক ওকে বিরক্ত করে লাভ কি।'

এনাক্ষীও একবার ভেবেছিল, যাবে না। যে কারণেই হোক মৃগাঙ্ককে তার পুরোপুরি ভালো লাগেনি। তার কথাবার্তা ধরনধারণের মধ্যে কেমন যেন একটা স্থূলতা আছে, লোক-দেখানো ভদ্রতা আছে, যা ভাঁড়ামির পর্যায়ে পড়ে। এমন একজন মানুষকে ভালো লাগা উচিত নয় এনাক্ষীর। তাতে নিজের কাছে নিজের রুচি খাটো হয়ে যায়। কিন্তু এখন যদি যাব না বলে, মা দারুণ হৈ-চৈ করবেন। সে-ও বড় লজ্জা আর অস্বস্তির ব্যাপার হবে। তার চেয়ে চুপচাপ গিয়ে চায়ের নিমন্ত্রণ সেরে আসাই ভালো।

বিভাবতী সিঁড়িঘরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কল্যাণীদের দেখে স্মিতমুখে আপ্যায়ন করে বললেন, 'আসুন।'

শতদলবাসিনীর দিকে চেয়ে বললেন, 'আসুন মা।' এনাক্ষীকেও স্বতন্ত্রভাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে হেসে বললেন, 'এসো।'

মৃগাঙ্কও মিনিট খানেকের মধ্যেই সেখানে এসে দাঁড়াল। অমিয়ভূষণ আর কমলাক্ষের দিকে চেয়ে স্মিতমুখে বলল, 'চলুন, ওপরে চলুন, বাবা আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

আজ আর মৃগাঙ্ক এনাক্ষীকে সম্বোধন করে কিছু বলল না, শতদল-বাসিনীকে অনুরোধ করল, 'চলুন।'

তিনি বললেন, 'তুমি তো চলতে বলছ ভাই, কিন্তু দোতলায় আমি যাই কি করে। অতগুলি সিঁড়ি না ভেঙে, আমি বরং নিচে বসেই গল্প-সল্প করি, তোমরা সবাই যাও ওপরে।'

মৃগাঙ্ক হেসে বলল, 'আমরা সবাই যদি ওপরে যাই, নিচে বসে আপনি কি দেওয়ালের সঙ্গে গল্প করবেন। আসুন, আমার হাত ধরুন। লজ্জা কি।'

শতদলবাসিনী হেসে উঠলেন, 'লজ্জায় মরে যাচ্ছি একেবারে। লজ্জাও নেই, জাত যাবার ভয়ও আর নেই। তবে আচমকা কেউ এসে ধরলে আজকাল ভারি সুড়সুড়ি লাগে।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বিভাবতী একবার কল্যাণীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কই, তোমার ননদ এলেন না? তাঁরও তো আসবার কথা ছিল?'

কথাটা মৃগাঙ্কের মনে হয়েছিল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে করেনি। এখন মায়ের প্রশ্নের উত্তর শোনার জন্যে অপেক্ষা করে রইল।

কল্যাণী গম্ভীরভাবে বললেন, 'ওর শরীরটা খারাপ হয়েছে।'

মৃগাঙ্ক ভাবল, করুণাকে তেমন আগ্রহ করে নিমন্ত্রণ জানায়নি বলেই কি তিনি এলেন না, নাকি এনাক্ষীর দিকে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছে বলে ভদ্রমহিলা অসন্তুষ্ট হয়েছেন?

মৃগাঙ্ক কমলেব দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'আপনার সেতারটিরও তো আসবার কথা ছিল। তিনি এলেন না কেন? তাঁরও কি শরীর খারাপ?'

তার কথার ভঙ্গিতে সবাই হাসল। এনাক্ষীও। মৃগাঙ্ক একপলকে ওর টোলপড়া গাল আর সাদা সুন্দর দাঁতের সারি দেখে নিল, 'হাসলে ওকে আরো সুন্দর দেখায়।' মৃগাঙ্ক খুশি হয়ে স্বীকার করল।

দক্ষিণ-খোলা বড় ঘরটিতে অতিথিদের নিয়ে গেলেন বিভাবতী। ফতুয়া-গায়ে খাটো ধুতি-পরনে প্রভাকরও এসে যোগ দিলেন। হাত তুলে নমস্কার বিনিময় করে বললেন, 'আসুন আসুন, কি ভাগ্য! কতদিন ভেবেছি নিজেই

যাব। আপনাদের মত গুণীজনকে এত কাছাকাছি যখন পেয়েছি, গিয়ে আলাপ-পরিচয় করে আসব। কিন্তু কাজের চাকায় একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। গণ্ডীর বাইরে একটুও এদিক-ওদিক হবার জো নেই।'

আপ্যায়নের আধিক্যে বিব্রত অমিয়ভূষণ একটু যেন বললেন, 'একদিন যাবেন সময় করে।'

প্রভাকর বললেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

মেয়েদের নিয়ে প্রভাবতী অন্দরমহলে চলে গেলেন। প্রভাকর গল্প করতে লাগলেন অমিয়ভূষণ আর কমলেব সঙ্গে। দুখানা গদি-আঁটা চেয়ারে মুখোমুখি বসলেন তাঁবা। প্রভাকর বললেন, 'আপনার খ্যাতির কথা আমি শুনেছি।'

অমিয়ভূষণ লজ্জিত হয়ে বললেন, 'আমার আবার খ্যাতি। সাধারণ গৃহস্থ মানুষ। ছেলে পড়িয়ে কোনরকমে সংসার চালাই।'

প্রভাকর হেসে বললেন, 'বিনয় বিদ্বানকেই সাজে। কিন্তু যতই বিনয় করুন, আপনাদের গুরুত্ব তাতে কমবে না। গুরুর গুরুত্ব যদি কমে, গোটা সমাজটাই যে হাল্কা হয়ে যায় মশাই।'

অমিয়ভূষণ একবার ভাবলেন বলে ফেলেন, 'শিক্ষকেব গুরুত্ব আপনারা কতটুকুই বা দিচ্ছেন।' কিন্তু প্রথম আলাপেই কোন বিতর্কের মধ্যে যেতে তাঁর ইচ্ছা হল না। তিনি স্মিতমুখে চুপ কবে রইলেন।

প্রভাকব এর পর সিগারেট কেশ খুলে ধবলেন, 'আসুন। কি আক্কেল দেখুন আমার। কথা বলছি তো কেবল কথাই বলছি।'

অমিয়ভূষণ সবিনয়ে একটু হাত ঝাড় করে বললেন, 'মাফ করবেন।'

প্রভাকর নিজের সিগারেটটি ধরিয়ে নিয়ে হেসে বললেন, 'চলে না বুঝি? আপনাব ওপর আমার আরো শ্রদ্ধা বেড়ে গেল মশাই। আমরা সারাজীবন নানা নেশাব দাসত্ব করে গেলাম। এদিক থেকে আপনারা নমস্য।'

প্রভাকরের ধূমপানের ভঙ্গি দেখে মনে হল না যে, দাসত্বে তাঁর কোনরকম দুঃখ আছে।

এর পর তিনি মৃগাঙ্ক আর কমলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা অমন আড়ষ্ট হয়ে আছ কেন? আমরা আছি বলে? আরে আমরা কি আর পুরোপুরি আছি? তুমি বরং ততক্ষণ ওকে লাইব্রেরীর ঘরটা দেখিয়ে আন। আচ্ছা, না হয় একটু পরে যেয়ো। চা-টা হোক আগে।'

তারপর কমলকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনার সঙ্গে তো এখনো ভালো করে আলাপই হল না। অবশ্য আর্টিস্টরা শুনেছি একটু লাজুক হয়ে থাকেন। তারা সকলের কাছে সব সময় মন খোলেন না। আপনাকে কিন্তু আজ বাজাতেই হবে।'

কমল এবার কথা বলবার ফুরসত পেয়ে বলল, 'মাফ করবেন। আমি আজ তৈরী হয়ে আসিনি।'

প্রভাকর একটু হেসে বললেন, 'কিন্তু আমরা যে একেবারে সেজে গুজে তৈরী হয়ে বসে আছি। ইট-কাঠ নিয়ে কারবার করি বলে কি আমাদের একটি দিনের অনুরোধ রাখবেন না?'

কমল জুতসই জবাব দিতে না পেরে শুধু একটু হাসল।

আরো বহুক্ষণ ধরে প্রভাকর একাই আসর জমিয়ে রাখলেন। মৃগাঙ্ক পর্যন্ত একটি কথা বলবার সুযোগ পেল না।

এর পর প্রভাকর কাজের কথা পাড়লেন। তাঁর ইচ্ছা, কলোনীকে ভালো করে গড়ে তুলবেন। শুধু ইট-কাঠ দিয়ে বাড়ি গড়ার কাজ নয়, সত্যিকারের মানুষ গড়ার কাজ। সেই কাজে অমিয়ভূষণ সপরিবারে তাঁকে সাহায্য করতে পারেন। এমন একটি গুণী পরিবারকে কলোনীর মধ্যে পেয়ে প্রভাকর ধন্য হয়েছেন। তাঁর অনেক স্বপ্ন, অনেক আশা। ভালো স্কুল করবেন, কলেজ করবেন, হাসপাতাল করবেন। তাঁর বাবা গাঁয়ের বাড়িতে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু এখনকার দেবমন্দির হল মানুষের এই সব কল্যাণ-মন্দির। সেবাধর্মের চেয়ে বড় ধর্ম আর নেই। এসব কাজে হাত দেবেন বলেই শহর থেকে দূরে এসে এই কীর্তিপুরের পত্তন করেছেন। এখনো নগর হয়ে ওঠেনি, সামান্য টাউনশিপ মাত্র। এখনো কলোনীর

বাসিন্দাদের তিনি সব রকম সুযোগ-সুবিধা দিতে পারেননি। কিন্তু যদি আয়ুতে কুলায়, মনের ইচ্ছাকে তিনি হাতে-কলমে গড়ে দিয়ে যাবেন। অন্তত গড়বার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে দেখবেন। ফলাফল তাঁর হাতে নয়। দীর্ঘ বক্তৃতায় তাঁর বক্তব্য শেষ করে প্রভাকর আবেগের সঙ্গে বললেন, 'আপনার সাহায্য চাই অমিয়বাবু।'

অমিয়ভূষণ খুশি হয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই। আমার যতটুকু শক্তি আছে—। দেখুন, আমিও ঠিক এই উদ্দেশ্যেই শহর ছেড়ে এখানে এসেছি। আর কতদিনই বা চাকরি করতে পারব। রিটায়ার করার সময় তো হয়ে এল। তখন কি নিয়ে থাকব। আমার রাজনীতি নেই, শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষমতা নেই। অনেককে দেখি, এ-বয়সটায় ফুলফলের চাষ নিয়ে থাকেন, অনেকে তাস খেলেন। কেউ কেউ আবার নামকীর্তন কি শাস্ত্রচর্চায় মন দেন। পড়াশুনোটা আমিও ভালোবাসি। কিন্তু শুধু পড়াশুনো নিয়ে সব সময় কাটে না। মাঝে মাঝে তাজা জীবনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারলে পুঁথিপত্রও নীরস মনে হয়। আমি দ্বৈতবাদী। কাব্য থেকে রস নিয়ে জীবনের মধ্যে ঢালব, আবার জীবন থেকে রস নিয়ে কাব্যের মুখে ঢালব। শুধু সৃষ্টি নয়, উপভোগের বেলায়ও সেই কথা। তাই রিটায়ার করার পরে—।'

প্রভাকর বাধা দিয়ে বললেন, 'রিটায়ার করার পরে নয়, তার আগের কথাই বলুন অমিয়বাবু। আপনি আমার চেয়ে বয়সে বোধ হয় ছোটই হবেন। আপনার অবসর নেওয়ার দিন এখনো অনেক দূরে। তা ছাড়া আজকালকার দিনের মানুষের বানপ্রস্থ নেই, শেষ অধ্যায়ে শুধু মহাপ্রস্থান আছে। কাজ করতে করতে মরতে হবে, যুদ্ধ করতে করতে মরতে হবে। সেই যোদ্ধার মৃত্যুই আমি চাই, অবসর চাইনে।'

অমিয়ভূষণ বলে উঠলেন, 'আশ্চর্য, আপনার সঙ্গে আমার অদ্ভুত মিল আছে, প্রভাকরবাবু।'

বিজয়ীর আনন্দে প্রভাকর দ্বিতীয় সিগারেট ধরালেন। তারপর স্বীকার

নিয়ে বললেন, 'আর কোন বন্ধুর কাছে নিজের আদর্শ, পরিকল্পনার কথা বলে তিনিও এমন আনন্দ পাননি। পৃথিবীতে কার সঙ্গে যে কার মনের মিল হবে, মতের মিল হবে, সে-কথা আগে থেকে বলা যায় না। পরিণত বয়সে সহকর্মী সমধর্মী সবচেয়ে কম মেলে। কিন্তু যদি একবার মিলে যায়, সে-জোড় সহজে ভাঙে না।'

তারপর আস্তে আস্তে উদ্বাস্তু কলোনীগুলির কথা তুললেন তিনি। গঠনমূলক কাজে এই কলোনীগুলি হয়েছে বাধা। অবশ্য কলোনীর লোকগুলি ভালোই। কিন্তু তাদের দারিদ্র্য আর অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে তাদের যারা পুতুল নাচের মত নাচায়, তারা সব সময় ভালো লোক হয় না। নানা স্বার্থে সেই সব স্বয়ম্ভু নেতারা ওদের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। কেউ কাঞ্চন, কেউ কামিনী, কেউবা নিজের রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে কর্মবীর হয়ে আসে। নির্বাচন-উপনির্বাচনে ভোটের ভিখারীরা তো আছেই। মণিময় চক্রবর্তীও তাদের একজন। তবে ওর স্বার্থ এক নয়, বহু। লোকটিও বহুরূপী।

অমিয়ভূষণ হঠাৎ বললেন, 'যতদূর জানি, মণিময় তেমন লোক নয়। সত্যিকারের আদর্শবাদী ছেলে।'

একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন প্রভাকর। ঢিলটা এমন অস্থানে পড়বে, তা তিনি ভাবেননি। একটু হেসে বললেন, 'মণিময়বাবুকে আপনি চেনেন নাকি?'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'চিনি। কোন কোন ব্যাপারে সে কিছুতেই মন স্থির করতে পারেনি। কিন্তু আর কোন অপবাদ তার বিরুদ্ধে শুনিনি।'

প্রভাকর বললেন, 'তা হবে। আমারও সব শোনা কথা। আমার সঙ্গেও তেমন আলাপ-পরিচয় নেই। আপনার সঙ্গে আলাপ আছে, ভালোই হল। একদিন আপনি তাঁকে দয়া করে এখানে নিয়ে আসুন। আমরা তাঁরও সাহায্য চাইব। তীর্থের পথে সহযাত্রী যত বাড়ে, ততই তো ভালো।'

এর পর খুব সতর্কভাবে কথা বলতে লাগলেন প্রভাকর, যেন অন্ধকারে পা টিপে টিপে এগোচ্ছেন।

'আদর্শবাদী তো এ-জীবনে কম দেখলাম না অমিয়বাবু। হিংসাবাদীদের দেখলাম, অ-হিংসাবাদীদের দেখলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলাম আদর্শটাই বাদ পড়ে। অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। যাঁরা যোগী, যাঁরা সন্ন্যাসী, কুবের, যক্ষ, উর্বশী মেনকাদের কবলে পড়বার আশঙ্কা তো তাঁদেরই বেশি। হাঁটতে গেলেই আছাড় খেতে হয়। আমাদের মত বুড়ো বয়সেও সে বিপদ কমে না, বরং বাড়ে। তাই বলে কি পড়ে যাওয়াটাই সত্যি। বার বার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টাটা কিছু নয়? মানুষের সাধনার কোন দাম দেব না, শুধু তার স্খলন-পতনকেই বড় করে দেখব? আমার অমন গোঁড়ামি নেই অমিয়বাবু।'

অন্দর মহলে খাওয়ার ডাক পড়ল। বিভাবতী এসে বললেন, 'প্রথম দিনেই তুমি যেভাবে বক্তৃতা দিচ্ছ, অমিয়বাবু আর সাহস করে আসবেন না।'

প্রভাকর হেসে বললেন, 'বক্তৃতা তো ওঁরও পেশা। তাই ভাবলাম একটু পাল্লা দিই। কিন্তু অযোগ্য ভেবে অমিয়বাবু রণক্ষেত্রে মোটে নামলেনই না।'

ঘরের মেঝেয় সারি সারি ফুলতোলা আসন পড়েছে। জলযোগের নাম করে একেবারে ভূরিভোজের ব্যবস্থা করেছেন বিভাবতী। লুচি, মাংস, ছানার পায়েস, দই, সন্দেশ কিছুই বাকি নেই।

অমিয়বাবু বললেন, 'চায়ের নিমন্ত্রণ। এ সবের তো কথা ছিল না।'

বিভাবতী বললেন' 'চায়ের নিমন্ত্রণে অতক্ষণ ধরে বক্তৃতা শোনারই কি কোন কথা ছিল? খান। এমন বেশি কিছু হয়নি।'

এত আদর আপ্যায়নের পরে ফের যখন অনুরোধ এল কমল অস্বীকার করতে পারল না। একতলার হলঘরে গান-বাজনার ব্যবস্থা হল। কমল নিজেই গেল তার সেতার নিয়ে আসতে।

আশেপাশের আরো কয়েকজন প্রতিবেশীকে আগে খবর দিয়ে রেখেছিলেন প্রভাবতী। বাঁয়া-তবলা পাশের বাড়িতে মিলল। ঠেকা দেওয়ার কাজ চালাবার মত লোক পাওয়া গেল শ্রোতাদের ভিতরেই। কিন্তু পর পর

তিনখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে এনাক্ষী শ্রোতাদের যে পরিমাণ মুগ্ধ করতে পারল কমলের কৃতিত্ব সেই তুলনায় মোটেই উল্লেখ করবার মত হল না। দেড়ঘণ্টা ধরে সেতারে মালকোষ আলাপ করল কমল। কিন্তু বাজানো শেষ হওয়ার আগেই সভার পিছনটা খালি হয়ে গেল। যাঁরা কয়েকজন বাকি রইলেন তাঁদের কেউ আর কমলকে দ্বিতীয়বার বাজাতে অনুরোধ করলে না। অবশ্য প্রভাকরবাবুরা খুবই সুখ্যাতি করলেন; উৎসাহ দিলেন। কিন্তু কমল বেশ বুঝতে পারল তাঁদের কথাবার্তার মধ্যে সৌজন্যের পরিচয় যতখানি আছে রসগ্রাহিতার উত্তাপ ততটা নেই।

ঢাকনির মধ্যে সেতারটা ভরে ক্ষুণ্ণমনে উঠে দাঁড়াল কমল। ত্রুটিটা কোথায় মনে মনে খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করছে, এনাক্ষী এগিয়ে এসে বলল, 'দাদা, তোমার সঙ্গে একজন মহিলা আলাপ করতে চান।'

কমল নিস্পৃহভাবে বলল, 'কোথায়!'

বিভাবতী পিছন থেকে বললেন, 'এদিকে।'

পাশের একটি ছোট ঘরের দিকে তিনি কমলকে নিয়ে গেলেন। নানাবয়সী আরো কয়েকজন মেয়ে তখনো দোরের কাছে বসেছিলেন, তাঁদের ভিতর থেকে একটি মেয়ে কমলের দিকে এগিয়ে এল।

বিভাবতী বললেন, 'আলাপ করিয়ে দিই। সম্পর্কে আমাদের ভাগ্নেবউ হয়। বছর সাতেক হল ভাগ্নেটি মারা গেছে। অদৃষ্টের ওপর তো হাত নেই কারো। গানবাজনায় সুপ্রীতির কিন্তু খুব উৎসাহ। বিয়ের আগে বড় ওস্তাদের কাছে শিখত।'

কমল নমস্কার বিনিময় করে সংক্ষেপে বলল, 'ভালোই তো।'

সুপ্রীতি বলল, 'আমার কথা ছেড়ে দিন মামীমা।' তারপর কমলের দিকে ফিরে তাকিয়ে স্মিতমুখে বলল, 'আপনার বাজনা কিন্তু আমার চমৎকার লেগেছে।'

কমল মনে মনে ভাবল, ভালো না লাগলেও ও কথা লোকে বলে থাকে।

বছর তিরিশেক বয়স হবে সুপ্রীতির। পরনে কালো ফিতে পেড়ে শাড়ি। হাতে একগাছি করে চুড়ি ছাড়া শরীরে আর কোথাও কোন আভরণ নেই। কিন্তু শীতের জ্যোৎস্নার মত এক ধরনের ম্লান সৌন্দর্য সারা দেহে ছড়িয়ে আছে। সুপ্রীতি জবাব না পেয়ে বলল, 'একদিন আসুন আমাদের ওখানে। আমরা কাছেই থাকি। ওই স্বপ্ননীড় বলে যে বাড়িটা, ওখানে আছি আমরা।'

কমল ঘাড় নেড়ে সংক্ষেপে বলল, 'আচ্ছা, যাব একদিন।'

সুপ্রীতি একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আপনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে। আজ আর আপনাকে বেশি বিরক্ত করব না। কিন্তু শিগগিরই একদিন বিরক্ত করতে যাব। দরকারটা আমার নিজের দিকের।'

কমল বলল, 'বেশতো আসবেন একদিন।'

গানবাজনার আসরে এ ধরনের অনেক উৎসাহী শ্রোতা-শ্রোত্রীর সঙ্গে ক্ষণিকের জন্যে আলাপ হয়। আবার গাড়ির আলাপের মত সে পরিচয় ভুলে যেতে কোনপক্ষেরই দেরি হয় না—কমল ফিরে আসতে আসতে ভাবল।

প্রভাকরবাবুদের সঙ্গে শিষ্টাচার আর সৌজন্য বিনিময়ের পালা চলল কিছুক্ষণ ধরে। তারপরে অমিয়ভূষণ তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সপরিবারে বাড়ির দিকে এগোতে লাগলেন।

১৫

নিজের ঘরের মধ্যে নিজের ছোট পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে কিছুদিনের মধ্যেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন নীলকান্ত রায়। আর ভাল লাগে না, আর সময় কাটে না। লেখার চেষ্টা করে দেখেছেন কিছুই হয় না। শুধু যন্ত্রণাই সার হয়। ছেঁড়া পাতাগুলি ঘরের কোণে জানালার বাইরে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকে। সে যেন টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে-ফেলা নিজের হৃদয়। এখন ভেবে বিস্ময় লাগে, কি করে তিনি আগে এত লিখেছেন। অবশ্য তখনকার লেখা পড়তে গিয়ে এখন খুবই কাঁচা লাগে।

অপরিণত মন, অপরিণত বুদ্ধির ছাপ প্রতিটি বাক্যে। কিন্তু সেই মন সেই সঙ্গে সন্তুষ্টি যদি ফিরে আসত যেন বেঁচে যেতেন নীলকান্ত রায়। সেই সৃষ্টি-শক্তিহীন বন্ধ্যা অতিপক্কতা তিনি চান না। কিন্তু না চাইলেও পক্কতা আসে। প্রবীণ বয়সে মাথার চুল যেমন পাকে, বিচার-বুদ্ধির পক্কতা তেমনি অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তখন ছেলেমানুষীর ভান করা যেতে পারে, কিন্তু সত্যিই ছেলেমানুষ হওয়া যায় না। স্বভাব সীসার মত ভারি হয়, মুখ থেকে তত্ত্বকথা আপনিই বেরিয়ে আসে।

শেষ পর্যন্ত লেখার চেষ্টা ছেড়ে দিলেন নীলকান্ত রায়। 'ফুরোয় যা দেরে ফুরোতে।' ভাবলেন বইপত্র কিছু পড়বেন। বিনাকষ্টে সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করবেন। স্রষ্টার সুহৃদ হয়ে, সঙ্গী হয়ে, তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে সৃষ্টির স্বাদ গ্রহণ করবেন। কিন্তু পড়তে গিয়ে দেখলেন, বহুকালের অনভ্যাসে পাঠক হিসাবেও তিনি পতিত হয়েছেন। মনের একাগ্রতা নেই, স্থৈর্য নেই। দু' একপাতা পড়েন তো নানা এলোমেলো অসম্বদ্ধ চিন্তায় পঠিত বিষয় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। প্রিয় গ্রন্থকারদের লেখা দুর্বোধ্য মনে হয় নীলকান্তের। শঙ্কিত হয়ে তিনি তাড়াতাড়ি বই বন্ধ করেন।

এক সময়ে চিঠিপত্র সঞ্চয় করা ছিল তাঁর বাতিক। দীর্ঘকাল ধরে বহু চিঠি তিনি জমিয়েছেন। তাঁর মধ্যে অপরিচিত অনুরাগী পাঠকের চিঠি, ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের পত্র-সাহিত্য তিনি সযত্নে সঞ্চয় করেছেন। যে সব সম্পর্ক মরে গেছে, কিংবা যে সব সম্পর্ক জীবন্মৃত হয়ে রয়েছে তাদের সেই উচ্ছ্বাস উচ্ছলতা প্রাণবত্তার স্পন্দন চিঠিগুলি আজও বুকে ধরে রেখেছে। তখনকার দিনের কত তাপ কতউত্তাপ জড়ানো রয়েছে এই চিঠির তাড়াগুলির মধ্যে। দু-একটি তাড়ায় আস্তে আস্তে আঙুলে ছুঁয়ে দেখান নীলকান্ত রায়। কিন্তু অতীত প্রাণ পায় না, তার আঙুলের ডগাগুলিই ধুলিময় হয়ে ওঠে। অতীতকে তিনি শুধু সুতো দিয়ে বেঁধে রেখেছেন। ভরসা করে বাঁধন খোলেননি। বহুদিন বাড়ির বাইরে বাইরে কাটিয়েছেন। তখন সময় হয়নি, খেয়াল হয়নি, অতীতের দিকে ফিরে তাকাবার ফুরসত হয়নি। আজ যখন জীবন স্রোত-হীন, বর্তমান অর্থহীন, চিঠির তাড়া আর ডায়েরির খাতার স্তব্ধ রহস্য মাঝে মাঝে নীলকান্তকে টেনে আনে। কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে তিনি থেমে যান। ভয় হয়। যে অতীতকে তিনি অতি মধুর, অত সুখকর মনে করেছেন বর্তমানের আলোয় তাকে যদি ভিন্নরূপ দেখেন, তাহলে! তা ছাড়া যে সব সম্পর্ক আজ মরে গেছে, তাদেব ক্ষীণায়ুতা যদি ধরা পড়ে! সে কাল তো আর একাল-নিরপেক্ষ নয়! অতীতকে উদ্ঘাটন করে কাজ নেই। হয়ত কতগুলি শুকনো হাড় ছাড়া কিছুই আর বেরোবে না। কবর খুঁড়ে লাভ নেই। খুঁড়লে কঙ্কাল উঠে আসবে। রক্তমাংসের মানুষটিকে আর পাওয়া যাবে না। তার চেয়ে কবরের ওপরকার সবুজ স্নিগ্ধ তৃণাচ্ছাদন ভালো। কল্পনা করা ভালো, ভিতরে এখনো সেই স্পন্দন আছে, উত্তাপ আছে। যদি কিছু থেকে থাকে নীলকান্তের নিজের হৃদয়ের মধ্যেই তা রয়েছে। মাটির গহ্বরে নেই। চিঠির তাড়ার মধ্যে কিছুই পাওয়া যাবে না, যা আছে তা স্মৃতির মধ্যে আপনিই আছে। নীলকান্ত তো আর ঐতিহাসিক নন, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ নন্ যে, নিদর্শন তাঁর কাজে লাগবে। চিঠির তাড়া খুলতে গিয়ে তাই হাত ওঠে না নীলকান্তের। ধুলো ঝেড়ে তাড়াগুলি ফের তুলে রাখেন।

একদিন নির্মলা এসে পিছনে দাঁড়ালেন। নীলকান্ত এটা নাড়ছেন, ওটা নাড়ছেন। যেন হাত-পা নাড়ার অভ্যাসটাকে কোন রকমে বজায় রাখতে চাইছেন, তাছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

নির্মলা একটু কাল চেয়ে চেয়ে দেখলেন তারপরে হেসে উঠলেন, 'বেশ আছ।'

নীলকান্ত মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'কি করে বুঝলে বেশ আছি।'

নির্মলা বললেন, 'বেশ থাকা ছাড়া কি। দিব্যি পায়ের উপর পা তুলে খাচ্ছ। চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, কোত্থেকে কি আসছে জানবার কোন দরকারও নেই তোমার। পুরোন প্রেমপত্তর পড়ে পড়ে দিনগুলি বেশ কেটে যাচ্ছে।'

নীলকান্ত তিক্তস্বরে বললেন, 'প্রেমপত্র! এর মধ্যে প্রেমপত্র কোথায় দেখলে?'

নির্মলা বললেন, 'আহা চটছ কেন? অত রাশ রাশ চিঠির মধ্যে তেমন ধরনের দু'চার দশখান চিঠি কি আর পাওয়া যায় না। পড না, পড়ে যদি আনন্দ পাও পড। দিনরাত ভরে পড। পৃথিবী আনন্দময়, যার চিত্তে যা লয়। আমি কিছুতেই তোমাকে আর বাধা দেব না— শুধু একটা কথা।'

নীলকান্ত বললেন, 'বল।'

নির্মলা বললেন, 'এমন ভূতের মত যদি দিনরাত বসে থাক বাতে ধরবে যে। ভূত প্রেতের সে ভয় নেই, কিন্তু মানুষকে বাতের ভয় করতে হয়। সত্যিই যদি অচল হয়ে পড ভুগতে হবে তো আমাকেই। আর তো কেউ শ্রীচরণে তেল মালিশ করতে আসবে না।'

নীলকান্ত উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'ফের ওই সব কথা? আমাকে দগ্ধে দগ্ধে মারবে ঠিক করেছ বুঝি?'

নির্মলা একটু হাসলেন, 'জীবনভরে কে যে কাকে দগ্ধে মারল তা সবাই জানে। যা বলছি তাই কর। আমার জ্বালায় যতদিন না পুড়ে একবারে

ছাই হয়ে যাও, রোজ দু'চার পা ঘুরে এসো। তোমাকে পয়সা আনতে বলিনে, জিনিসপত্রও কিনে আনতে বলিনে। শুধু দয়া করে হাত-পা ক'খানাকে একটু চালু রেখে আমাকে কৃতার্থ কর। জ্যান্ত মানুষ যদি দিনরাত এমন গাছের মত ঘরের মধ্যে শিকড় গেড়ে থাকে তাহলে কাহাতক আর চোখে সয়। আর যে দেখতে পারিনে আমি, এত অনাসৃষ্টি আর যে সইতে পারিনে!'

পাশের ঘর থেকে মালা বেরিয়ে এসে বলল, 'মা তুমি আবার বাবার ঘরে এসেছ?'

নির্মলা বললেন, 'এ ঘরে কি তোমার বাবার নাম লেখা আছে যে আর কেউ এখানে আসতে পারবে না?'

মালা বলল, 'এলেই যখন ঝগড়া হয়,—এসে লাভ কি বল। সকলেরই তাতে অশান্তি। চল, ওঘরে চল। যীশুবিশুদের খেতে দেবে। কতক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করছে।'

নির্মলা বলে উঠলেন, 'ডাকাডাকি করছে, তুমি দাও গিয়ে, আমি পারবো না।'

মালার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, 'তা পারবে কেন? পারবে কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করতে।'

নির্মলার আর সহ্য হল না। মুখ ঘুরিয়ে রুখে দাঁড়ালেন তিনি। তিক্ত তীব্র স্বরে বললেন, 'মালা, তুই কি আমার মেয়ে না আর কিছু? জা ননদ সতীনের মত তুই আমাকে মুখের ওপর যা তা বলবি? দুটো পয়সা রোজগার করছিস বলে এত দেমাক হয়েছে তোর? আমি চাইনে তোর টাকা, চাইনে। উপোস করে মরবো সেও ভালো, তবু তোর দেওয়া টাকা যদি ফের ছুঁই আমি বাপের বেটি নই।'

নির্মলা দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। মালা স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ডাকল, 'বাবা!'

নীলকান্ত চোখ তুলে তাকালেন।

মালা নীরস রুক্ষস্বরে বলতে লাগল, 'দোহাই তোমার,—এবার থেকে একটু

বুঝে শুনে চল। চিরকালটাই কি মানুষের একরকম কাটালে চলে? দিনরাত এমন ঝগড়াঝাঁটি লেগে থাকলে যীশুবিশুদের মনের অবস্থাই বা কি হয় বলতো। ওরা যে সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ওদেরও যে আর সামলে রাখতে পারছিনে। তার মধ্যে যীশু তো বয়ে গেল বলে। পড়া নেই, শুনো নেই। কোথায় থাকে, কি করে। কাউকে গ্রাহ্য করে না। পাড়ার যত সব বদ ছেলের সঙ্গে ওর আড্ডা।'

নীলকান্ত বললেন, 'ওকে শাসন করলেই পারিস, আমাকে যেমন শাসন করছিস।'

মালা বলল, 'ছিঃ বাবা। আমি তোমাকে কেন শাসন করতে যাব। কিন্তু মা যা বলে ভালোর জন্যেই বলে। তুমি তার কথা শুনে চল, মার সঙ্গে বনিবনাও করে চল। দুটো দিন শান্তি আসুক সংসারে।'

কথা শেষ করে মালা আর দাঁড়াল না।

নীলকান্ত শূন্যদৃষ্টিতে একটুকাল চেয়ে রইলেন। মনে মনে ভাবলেন, মালার মত একটি সুন্দরী তরুণী মেয়েকে যদি তিনি তাঁর উপন্যাসের নায়িকা করতেন তাহলে তাঁর মুখে এই রূঢ় কথাগুলি নিশ্চয়ই দিতেন না। অকর্মণ্য নিরুপায় বাপকেও সে ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখত, স্নেহকোমল সহানুভূতির সুরে কথা বলত। তার লাবণ্যের সঙ্গে সুষমার সঙ্গে দেহের প্রতিটি ভঙ্গিকে, প্রতিটি পদক্ষেপকে, মুখের প্রতিটি বাক্যকে সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলতেন নীলকান্ত। যাতে পাঠকের মনে রসাভাস না ঘটে, যাতে মানস-কমলের ওপর মানসকন্যার স্থির সৌন্দর্য অবিচল, অচঞ্চল থাকে। তিনি যদি ফের কলম ধরতেন এই তুচ্ছ, গ্লানিময়, সঙ্গতিহীন, উদ্দেশ্যহীন জীবনের পিছনে পিছনে ছুটতেন না, নতুন জীবন সৃষ্টি করতেন, নতুন গ্রহলোক গড়ে তুলতেন তিনি।

হঠাৎ পুরোনো ধুলোমাখা চিঠির তাড়াগুলির ওপর নীলকান্তের চোখ পড়ল। জ্বলে উঠল চোখ। কেন, কিসের মমতায় এই চিঠিপত্রের স্তূপ তিনি জড়ো করে রেখেছেন? কি হবে এগুলি রেখে? তিনি তো অতীতের

স্মৃতিসর্বস্ব নন, তিনি ভবিষ্যতের, তিনি আগামী দিনের। নীলকান্তর মনে হল, এই চিঠির তাড়াই তাঁর বাধা। রোজ এগুলি তাঁকে অতীত জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যায়, সামনে এগোতে দেয় না। নীলকান্ত ভাবলেন, এবার থেকে তিনি সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হবেন, অতীতের দিকে আর পিছন ফিরে তাকাবেন না, বিগত জীবনের কোন স্মৃতিচিহ্ন, কোন নিদর্শন রাখবেন না নিজের ঘরে। তিনি নবজাত সদ্যোজাত। অতীতের সঙ্গে তাঁর কোন বন্ধন নেই। বিগত জীবনের কীর্তি অকীর্তি, গৌরব অগৌরব, জয় পরাভবের সব চিহ্ন মুছে ফেলে তিনি নতুন করে যাত্রা শুরু করবেন।

কি খেয়াল হল নীলকান্তের, চিঠির তাড়াগুলি ঘরের মেঝেয় জড়ো করলেন তিনি, সুতোর বাঁধন ছিঁড়ে ফেললেন। তারপর অনেকগুলি চিঠি এলোমেলো করে, হ্যারিকেনের মুখ খুলে সেই পুরোনো চিঠি আর রাশ রাশ কাগজপত্রের ওপর কেরোসিন তেল ঢেলে দিলেন খানিকটা। বালিশের তলা থেকে দেশলাই বার করে কাঠি জ্বেলে দিলেন তার ওপর।

একটু বাদে কাগজপোড়া গন্ধ পেয়ে পাশের ঘর থেকে ছুটে এল মালা। নির্মলা ছেলেমেয়েদের খেতে দিচ্ছিলেন, ব্যস্ত হয়ে এঁটো হাতে তিনিও এলেন পিছনে পিছনে। নীলকান্তের কাণ্ড দেখে মুহূর্তকাল দুজনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মালা চিৎকার উঠল, 'একি করলে বাবা, অনেক দামী দামী চিঠি ছিল যে এর মধ্যে। কত সব নাম-করা লোকদের লেখা। সব যে নষ্ট হয়ে গেল।'

নির্মলা বললেন, 'চিঠির কথা পরে ভাবিস মালা। আগে কয়েক বালতি জল ঢেলে আগুন নেবাতে চেষ্টা কর। আমাকে সবসুদ্ধ পুড়িয়ে মারবে, ওর মতলব হল তাই। আমাকে এতকাল জ্বালিয়েও ওর সাধ মেটেনি।'

জলভরা কলসী ছিল রান্নাঘরে। নিজেই সেটা নিয়ে এল নির্মলা। মালাও আর এক বালতি জল এনে ঢেলে দিল আগুনের ওপর। একটু বাদেই অবশ্য আগুন নিভে গেল। পোড়া চিঠিপত্র আর কাগজের রাশ মালা দু'হাতে টেনে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলল।

[illegible] নির্মলা মেয়ের হাত থেকে সেই চিঠি [illegible] কেড়ে নিয়ে [illegible] দিলেন উঠানে। বললেন, 'ছাইভস্ম আর ঘরে নিয়ে যাচ্ছিস কেন মালা। দূর করে দে, দূর করে দে।'

হৈ চৈ গোলমাল শুনে আশেপাশের বাড়িগুলোর কয়েকজন বিভিন্ন বয়সী স্ত্রীপুরুষ ভিড় করে দাঁড়াল। ছেলেমেয়েব দলও এল পিছনে পিছনে। অনেকেই মজা দেখে হাসতে লাগল।

কে একজন বলল, 'ভদ্রলোক পাগল নাকি?'

আর একজন বলল, 'পাগল নয়, লেখক।'

'ওই একই কথা।'

নির্মলা প্রতিবেশীদের দিকে চেয়ে হাত জোড় কবে বললেন, 'আপনারা এবাব আসুন। আগুন আমবা নিবিয়ে ফেলেছি। আব তো আপনাদেব কোন দরকাব নেই এখানে।'

পুরুষেব দল ফিবে যেতে যেতে বলল, 'ভঙ্গি দেখ। যেন থিয়েটার করছে। আসলে ও মাগীটাবই দোষ। বাতদিন কট কট করতে করতে ভদ্রলোকেব মাথা খাবাপ কবে দিয়েছে। মেয়েমানুষেব জিভে যে বিষ আছে তাব কাছে আব সব বিষ অমৃত, বুঝেছ বনমালী?'

বনমালী হেসে বলল, 'আস্তে জলধব, আস্তে। এসব কথা তোমাব গিন্নীব কানে গেলে আর রক্ষা থাকবে না।'

জলধরেব স্ত্রী কিবণবালা। নির্মলার দিকে দু' পা এগিয়ে গিয়ে বলল, 'অমন কুকুর তাড়ান তাড়াচ্ছ কেন দিদি, আমবা এখনই চলে যাচ্ছি। কেউ কি থাকতে এসেছি এখানে। সোয়ামী স্ত্রীতে যত খুশি ঝগড়া বিবাদ কব, কেউ কিছু বলতে আসবে না। কিন্তু এসব আগুন নিয়ে খেলা তো ভালো না। ঘিঞ্জি ঘিঞ্জি সব বাড়ি। আর যা খরা, মানুষ তো এমনিতেই জ্বলে পুড়ে মরছে। এরপর আগুন টাগুন লাগলে কি আর রক্ষে থাকবে। কলোনীকে কলোনী সাফ হয়ে যাবে। কর্তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে সাবধানে

রেখো। একটু ঠাণ্ডা করে খাওয়াও। এরকম হলে বাধ্য হয়ে আমাদের ওপরে রিপোর্ট করতে হবে।'

মালা অনুনয়ের সুরে বলল, 'তার কোন দরকার হবে না মাসীমা। বাবাকে আমরা সাবধানে রাখব। আপনারা ভাববেন না।'

সবাই ভেবেছিল, এত কাণ্ডের পর নাওয়া খাওয়া নিয়ে আপত্তি করবেন নীলকান্ত। কিন্তু তেমন কিছুই হল না। এই ছোট অগ্নিকাণ্ডের পর তিনি একেবারে শান্ত হয়ে গেলেন। মেয়ের কথামত তেল মেখে স্নান করে এলেন, খেয়ে দেয়ে চুপচাপ ঘরের সামনে বসে রইলেন। মালাকে নিয়ে নির্মলা সেই পোড়া কাগজপত্রের স্তূপ থেকে কিছু চিঠিপত্র বেছে বেছে সরিয়ে রাখছেন। দেখতে পেলেন নীলকান্ত। বসে বসে দেখতে লাগলেন। দৃশ্যটি মন্দ নয়, দৃশ্যটি মধুর। জীবনের এই অংশটি লিখে রাখবার মত। কয়েকটি ফুল, কয়েকটি তারা, দু' চারটি দৃশ্য। জীবন তার চেয়ে বেশি কিছু দেয় না। তার চেয়ে বেশি কিছু আশা করতে নেই। তিলে তিলে তিলোত্তমাকে গড়ে তুলতে হয়।

হঠাৎ আক্ষেপে অনুশোচনায় নীলকান্তের মন ভরে উঠল। গড়বার শক্তি আর তাঁর নেই। ধ্বংসের নেশায় পেয়ে বসেছে তাঁকে। ছি ছি ছি, এ কি করলেন তিনি। চিঠিপত্র আর পুরোনো মাসিক সাপ্তাহিকের কাটিং জমিয়ে জমিয়ে তিনি যে সঞ্চয় করেছিলেন তার মধ্যে তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিবরণ কমই ছিল। তার চেয়েও বেশি ছিল গত পঁচিশ-ত্রিশ বছরের বাংলা সাহিত্যের উপাদান। নীলকান্ত ভেবেছিলেন, এসব উপকরণ যদি তিনি নিজে ব্যবহার করতে না পারেন, কোন যোগ্য উত্তরাধিকারীর হাতে দিয়ে যাবেন। তাঁর নিশ্চয়ই কাজে লাগবে। কিন্তু এতদিনের সঞ্চয় তিনি এক মুহূর্তের ভুলে নষ্ট করে দিলেন। কে বলে অতীতের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই? নিশ্চয়ই আছে। কয়েকখানি চিঠি পুড়িয়ে তিনি সব সম্পর্ক নষ্ট করতে পারেন? না কি সব বাঁধন ছিঁড়ে ফেলবার শক্তি আছে? চিন্তায় ভাবনায় ধ্যানে ধারণায় অতীত ইতিহাসের সঙ্গে তিনি কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বন্ধনে জড়িত।

সে ইতিহাস তাঁর ব্যক্তিজীবনের ইতিহাস নয়, মানুষের জীবনধারার ইতিহাস, তার সভ্যতা, সংস্কৃতি বিকাশের ইতিহাস। শুধু অতীতে নয়, ভবিষ্যতেও চলে গেছে সেই ইতিহাসের শিকড়। নীলকান্তের আর্যদৃষ্টি নেই, তিনি ত্রিকালজ্ঞ নন। তবু নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁর তিনকালে বাস। তিনি শুধু কোন একটি বিশেষ কালের নন। কারণ কোন কালই সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র নয়, বিচ্ছিন্ন নয়। এক কাল আর এক কালের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। বুঝতে সুবিধা হয় বলে মানুষ তাকে ছক কেটে কেটে আলাদা করেছে। কালো স্লেটের ওপর শিশু যেমন চক-খড়ি দিয়ে দাগ কাটে।

এলোমেলো অসম্বদ্ধ চিন্তার স্রোতে ভেসে চললেন নীলকান্ত। সে ধারার কোন কূল নেই, কিনারা নেই। সে কি তাঁকে অতলান্ত নীল সমুদ্রের দিকে নিয়ে যাবে?

কিন্তু বিকেলবেলায় মাল যখন ডিউটিতে যাওয়ার জন্যে তৈরী হল, নীলকান্ত বললেন, 'আমিও তোর সঙ্গে যাব।'

মালা বিস্মিত হয়ে বলল, 'তুমি কোথায় যাবে বাবা?'

নীলকান্ত বললেন, 'কলকাতায়। একা একা বসে বসে আর ভালো লাগছে না। যাই দু' একজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করে আসি। কাজকর্মের কোন সন্ধান যদি মেলে তাও দেখা যাবে।'

মালা খুশি হয়ে বলল, 'কাজকর্মের জন্যে তোমাকে এখনই ভাবতে হবে না বাবা। তবে একটু ঘুরে টুরে যদি আসতে চাও, ত বরং ভালো। আমরা তো তোমাকে অনেকদিন আগে থেকেই বলছি। লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করলে মানুষের মন ভালো থাকে। মানুষ ছাড়া কি মানুষ থাকতে পারে?'

নীলকান্ত হেসে বললেন, 'আমি কি মানুষের মধ্যে বাস করছিনে?'

মালাও হাসল, 'আমাদের কথা বলছ তো? কিন্তু আমরা তো তোমার কাছে থেকেও নেই। ছায়ার ছায়া। শুধু আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে থাকলেই

হয় না। যে কোন বয়সের মানুষের পক্ষেই বাইরের কারো কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশা ভালো।'

নীলকান্ত বললেন, 'কোন কোন বয়সের পক্ষে এই মেলামেশাটা বেশি দরকার, কি বলিস?'

মৃদু হাসলেন নীলকান্ত।

মালা একটু লজ্জিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। তবে কি কমলাক্ষের সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাতের কথা বাবার কানে গেছে? কিন্তু যাওয়ার তো কথা নয়। তিনি তো এখানকার কারো সঙ্গে মেশেন না, কথাবার্তা বলেন না বড় একটা। তবে? এ নিশ্চয়ই তাঁর অনুমান।

কমলাক্ষের সঙ্গে হাসপাতালে আরো কয়েকদিন দেখা হয়েছে মালার। বন্ধুপত্নীর খবর নিতে গেছে কমলাক্ষ। সেই উপলক্ষে মালার সঙ্গে কথা বলেছে। অতি তুচ্ছ কথা। কুশলপ্রশ্নের আদান-প্রদান। অজয়ের স্ত্রী আর শিশুপুত্র সম্বন্ধে দু' একটি মন্তব্য। কিন্তু তাই বড় কথা নয়। তার চেয়েও বড় তাদের দুজনের ভালো লাগা। মালাকে যে কমলাক্ষের ভালো লেগেছে তা ওর তাকাবার ভঙ্গিতে কথা বলবার ভঙ্গিতে বুঝতে বাকি নেই মালার। অথচ সে তো সামান্য ম্যাট্রিক পাশ একটি নার্স ছাড়া কিছু নয়। তার মধ্যে কমলাক্ষের মত গুণী শিল্পী কী দেখেছে সেই জানে। সেদিন বাসে আসতে আসতে বলেছিল, 'আপনি সামান্য নন। ভিতরে ভিতরে আপনার একটা অদ্ভুত শক্তি আছে। আমি আর কারো মধ্যে তা দেখিনি।'

মালা জবাব দিয়েছিল, 'আপনার যত বানানো কথা। এই ক'দিনে আমার কী এমন শক্তির পরিচয় আপনি পেলেন? হাসপাতালের কাজে আমি খুব খাটতে পারি। কাজে ফাঁকি দিইনে। আপনি কি সেই কথা বলছেন?'

কমলাক্ষ বলেছিল, 'সে কথাও বলছি। কাজে ফাঁকি না দেওয়া কি সহজ কথা? নিজের কাজে নিজে সৎ থাকতে পারা কম শক্তির পরিচয় নাকি? কিন্তু শুধু তাই নয়, আমি অন্যরকম বলছিলাম। আপনার দুঃখ

সহ্য করবার শক্তি আছে। আর সেই দুঃখ আপনাকে শুকিয়ে ফেলেনি বরং ফুটিয়ে তুলেছে।'

কোন্ দুঃখের কথা বলছিল কমলাক্ষ জিজ্ঞাসা করবার সময় পায়নি মালা। নিশ্চয়ই তাদের আর্থিক অভাব অনটনের ইঙ্গিত করেছে। সেই অনটনে অসময়ে পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে মালাকে অল্প টাকার মাইনের চাকরি নিতে হয়েছে—সেই কথা বলতে চেয়েছে। মালার বাবার কাজকর্ম নেই, সাংসারিক বুদ্ধি নেই, সমাজে প্রতিষ্ঠা নেই, এও অবশ্য কম দুঃখ নয়। কিন্তু এই অস্বাচ্ছন্দ্য মালাকে কি আত্মবিকাশের সত্যিই সুযোগ দিয়েছে। এর চেয়ে সে যদি এনাক্ষীর মত পড়াশুনোর সুবিধা পেত, সচ্ছল সংসারে বড় হয়ে উঠত, তাহলে কি মালাকে এর চেয়েও ভালো দেখাত না? তবে কেন মানুষ অমন করে দুঃখের প্রশস্তি গায়? চাওয়ার সময় তো সুখই চায় জীবনে। জীবনে সুখী হওয়া ছাড়া আর কোন্ বড় কাম্য আছে মানুষের। কিন্তু মানুষ তা কিছুতেই স্বীকার করে না। শিল্পে সাহিত্যে সে কেবলই অন্য কথা বলে, উল্টো কথা বলে। বলে, সুখের চেয়ে দুঃখ বড়, সুখের চেয়ে দুঃখ গভীর। কমলাক্ষেরও সেই ধারণা, সেও করুণ সুরের পক্ষপাতী। মানুষ কেন এমন উল্টো কথা বলে জিজ্ঞাসা করতে হবে কমলাক্ষকে। আজও তার সঙ্গে দেখা হবে মালার। মনে পড়তেই মুখে একটু হাসি ফুটল তার। 'ফুটিয়ে তুলেছেন' কথাটা বলে ফেলে কমলাক্ষ বেশ একটু লজ্জা পেয়েছিল। তার সেই লজ্জিত মুখখানা মালার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ভারি ভালো লেগেছিল তার ওই 'ফুটিয়ে তোলার' কথাটা।

নীলকান্তের যাওয়ার প্রস্তাবে নির্মল কোন বাধা দিল না। কিন্তু যাওয়ার সময় তাকের উপর থেকে মলাট-খোলা শেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলীখানা যখন নীলকান্ত সঙ্গে নিয়ে চললেন, নির্মলা একবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'বইখানা আবার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন? যাতায়াতে এইটুকু তো পথ। তার জন্যে আবার বইয়ের দরকার হয় নাকি?'

নীলকান্ত মালার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পড়বার জন্যে নিচ্ছিনে,

[illegible]
যায় না।'

কথাটা কিছুদিন ধরেই বলছেন নীলকান্ত। র‍্যাকে দামী বই প্রায় নেই বললেই চলে। যে দু' চারখানা আছে অব্যবহার্য হয়ে উঠেছে। ভালো করে বাঁধিয়ে না নিলে একটি পাতাও পরে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

নির্মলা মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বই বাঁধাবার মত এখন টাকা কোথায় ঘরে ?'

মালা বলল, 'আচ্ছা, সেজন্তে তুমি ভেব না মা। টাকা আমি পরে জোগাড় করে দেব। আজই তো আর টাকা লাগছে না। বাঁধাতেও তো দু' চারদিন সময় লাগবে, তখন টাকা দিলেই হবে।'

নির্মলা আর কোন কথা বললেন না। কারো সঙ্গেই বেশি কথা কাটাকাটি করতে আজকাল আর ভালো লাগে না তাঁর। অল্পেই শ্রান্ত হয়ে পড়েন।

বাসে উঠে মেয়ের পাশে বসে বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগলেন নীলকান্ত। মালা বাবার মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু কোন কথা বলে তাঁর নিবিষ্টতা ভঙ্গ করল না।

বয়সের চেয়ে বেশি বয়স্ক দেখায় নীলকান্তকে। সারা মুখে ক্লান্তির ছাপ। এই মুখের দিকে তাকালে কমলাক্ষ নিশ্চয়ই বলতে পারত না দুঃখ ওঁকে ফুটিয়ে তুলেছে। অথচ মালা জানে, তার চেয়েও বেশি দুঃখী তার বাবা। ওঁর দুঃখের সঙ্গে মালার নিজের দুঃখের কোন তুলনাই হয় না। মালার মনে কোন অনুশোচনা নেই, কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই, তার সব দুঃখই তার বাবার দেওয়া। সব দুঃখই বাইরের। কিন্তু মালার বাবার তো তা নয়। তাঁর সব দুঃখই তাঁর নিজের সৃষ্টি। নিজের ভুল ভ্রান্তি, লক্ষ্যভ্রষ্টতা, অসার্থকতার দুঃখে তিনি যে রাতদিন কিভাবে পুড়ে মরছেন তা মালা জানে। বোধ হয়, নিজের মায়ের চেয়েও বেশি করে জানে। দেখে দেখে, কষ্ট পেয়ে পেয়ে বাবার সম্বন্ধে মায়ের অনুভূতি খানিকটা অসাড় হয়ে গেছে বলে মনে হয় মালার। তাই বাবার প্রতিটি সঙ্গতিহীন কাজের, সামঞ্জস্যহীন কথার মধ্যে তাঁর যে বেদনা আর অন্ত-

বিদ্রূপের আভাস সে পায়, তার মায়ের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। বাবার উপর মণিমামারও সহানুভূতি কম। যিনি ইচ্ছা করে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছেন, স্বেচ্ছায় অধঃপাতের পথে গেছেন, স্ত্রীপুত্রের দুর্গতির কারণ হয়েছেন, তাঁর ওপর মণিমামার কোন মমতা নেই। তাঁর মন অঙ্কের মত সহজ সরল। তিনি অন্নের বস্ত্রের অভাব বোঝেন, শিক্ষার স্বাস্থ্যের অভাব বোঝেন, কিন্তু মানুষের স্বেচ্ছাকৃত স্খলন-পতনকে বুঝতে পাবেন না। বাবাব পক্ষ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে মালা তাই তাঁর কাছে মুখ পায়নি। কিন্তু কমলাক্ষ হয়ত বুঝলেও বুঝতে পারে। সে হয়ত স্বীকার কবতে পাবে, নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারাব চেযে বড় দুঃখ আব নেই। মানুষ চবম দুঃখ নিজেব কাছেই নিজে পায়। তেমন দুঃখ আব কেউ তাকে দিতে পারে না। যে দুঃখে মানুষ ফুটে ওঠে না, যে দুঃখ মানুষকে মহৎ কবে না, তার চেয়ে মর্মান্তিক দুঃখ আব কি আছে। দুঃখেব বন্দনা গাইবাব আগে কমলাক্ষ যেন একবার মালাব বাবাব দিকে তাকিয়ে দেখে।

কণ্ডাক্টর এসে টিকেটেব পয়সা চাইতেই মালাব চমক ভাঙল। নীলকান্ত তাড়াতাড়ি অভ্যাসবশে পকেটে হাত দিলেন। কিন্তু পকেট শূন্য। ঝুল পকেট, বুক পকেট, ঘড়ি পকেট কোন পকেটেই একটিমাত্র পয়সা নেই। মালা তাঁর অপ্রতিভ ভাব দেখে একটু হেসে বলল, 'আমি দিচ্ছি বাবা।'

তাবপব বঙীন বটুয়াব্যাগেব ভিতব থেকে ছোট্ট আব একটি ব্যাগ বেব করল মালা। একখানা আধুলি কণ্ডাক্টবেব হাতে দিয়ে শ্যামবাজারেব দু'খানা টিকেট চাইল। আর একটি টাকা নীলকান্তেব দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমার কাছে বেখে দাও। তোমাব জামাব পকেটে পয়সা নেই। ধোপাবাড়ি থেকে এনে আজই তো পাট ভাঙা হল। তাছাড়া, শিগ্‌গিব তো তুমি কোথাও বেরোওনি, টাকা পয়সার তোমাব দরকারও ছিল না। নোটখানা বেখে দাও বাবা। এতেই হয়ে যাবে বোধ হয়। আব পাব তো বাকি পয়সা দিয়ে রীণাদের জন্যে কিছু লজেন্স টজেন্স নিয়ে যেয়ো। তোমার হাত থেকে কিছু পেলে ভারি খুশি হবে ওরা।'

নীলকান্ত গম্ভীর মুখে বললেন, 'হুঁ।' তারপর একটাকার নোটখানা নিয়ে ঘড়ি পকেটে গুঁজে রেখে শেক্সপীয়রখানা সশব্দে বন্ধ করে ফেললেন।

মালা বিস্মিত হয়ে বলল, 'কি হল?'

বাবার এই আকস্মিক ভাবান্তরের কারণ সে খুঁজে পেল না।

কিন্তু নীলকান্ত হঠাৎ টের পেয়েছেন তিনি কত অসহায়, তিনি কত পরাধীন। যাকে বলে কপর্দকহীন, ঠিক তাই।

১৬

মালা তার হাসপাতালের সামনে নেমে গেল। যাওয়ার সময় বলল, 'তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরে যেয়ো বাবা। নইলে সবাই তোমার জন্যে চিন্তায় থাকবে।'

নীলকান্ত ঘাড় কাত করে বললেন, 'আচ্ছা।'

শ্যামবাজারের নেমে নীলকান্ত কলেজ স্ট্রীটের বাস ধরলেন। লোকজন, যানবাহন কলকোলাহল সব যেন নতুন লাগছে। ঠিক নতুন নয়, পূর্বজন্মের স্মৃতির মত। একই জন্মে মানুষ যে কত বার জন্মান্তর গ্রহণ করে তার কি ঠিক আছে। যেতে যেতে প্রথম যৌবন, মধ্য যৌবনের কথা নীলকান্তের মনে পড়তে লাগল। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে করতে এই পথ দিয়ে কতবার যে তিনি যাতায়াত করেছেন তার ঠিক নেই। তিনি পথের দিকে তাকাননি, চারদিকের পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন থাকেননি, শুধু যে-বন্ধুর তিনি সান্নিধ্য পেয়েছেন, সেই সময়ের জন্যে তার মধ্যে ডুবে রয়েছেন। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কি তার কথা শুনতে শুনতে তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন, তন্ময় হয়ে রয়েছেন। কিন্তু এই তন্ময়তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আস্তে আস্তে তাঁর বন্ধুরা সরে গেছে। এক একটি বন্ধুবিচ্ছেদ তাঁকে কাতর করে তুলেছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি সেই বিচ্ছেদের মূল বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। একেকবার ভেবেছেন তিনি অনুক্ষণ যে হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেন ওদের পক্ষে সে হাওয়া উপযোগী নয়। কোন কোন সময় তাঁর মনে হয়েছে যাকে যতটুকু দেওয়া দরকার তিনি তার চেয়ে বেশি দিতে চেয়েছেন। 'বেণীর সঙ্গে মাথা' সবাইকে দেওয়া যায় না, সবাই নিতেই কি পারে? মাথার কথা মনে হতেই চমকে উঠলেন নীলকান্ত। তাঁর বন্ধুত্ব কি শুধু মস্তিষ্কের বন্ধুত্ব ছিল, শুধু বাণী বিনিময়ের বন্ধুত্ব ছিল, তার মধ্যে হৃদয়ের কোন স্পর্শ ছিল না?

আর সেই জন্যেই তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি ? কিন্তু একথা মেনে নিতে মন সরল না নীলকান্তের। যাদের সঙ্গে তিনি মিশতেন তারাও তো কেউ হৃদয়ের কাঙাল ছিল না। তারাও প্রত্যেকে ছিল বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিলাসী। তারাও তখনকার মত জীবন আর সাহিত্যকে একাত্ম করে নিয়েছিল। সেই বন্ধুত্ব নরনারীর যৌন-সম্পর্কের মত যেমন শরীরনির্ভর ছিল না, তেমনি প্রয়োজননির্ভরও ছিল না। সাংসারিক উপকার-অপকারের তাঁরা উর্ধ্বে ছিলেন। নীলকান্তের ধারণায় জীবনে সাহিত্য শিল্পের যে স্থান তাঁর শিল্পী বন্ধুদের সেই স্থান ছিল। তাঁর কোন সৌহৃদ্যই বস্তুর মধ্যে রূপ পায়নি, যেমন বাণীব মধ্যে পেয়েছে। আর বাণীই ছিল তাঁর সব। যাঁরা কর্মী, যাঁরা সাধু মহাত্মা তাঁদের জীবনই তাঁদের বাণী, কিন্তু যাঁরা লেখক তাঁদের বাণীই তাঁদের জীবন। তাঁরা বাঙ্ময়। তাঁদের বাণী শুধু বাক্য নয় তাঁদের চিত্ত বুদ্ধি হৃদয়—সব। তাঁরা বাকসর্বস্ব, কারণ বাক্যই তাঁদের সত্তা।

'কলেজ স্ট্রীট !'

কণ্ডাকটরের গলার শব্দে আর একবার চমক ভাঙল নীলকান্তের। এই পর্যন্তই তাঁর টিকিটের মেয়াদ। তিনি তাড়াহুড়া করে নেমে পড়লেন। নেমে এসে দেখলেন তার পরেও বাসট অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। অত তাড়াতাড়ি করবার দরকার ছিল না।

বইয়ের পাড়া। অত্যন্ত প্রিয় পরিচিত পাড়া নীলকান্তের। এখানে কতজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, আলাপ-পরিচয় বন্ধুত্ব হয়েছে। কোন কোন প্রকাশকের দোকানে বসে সাহিত্যের আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছেন। এ পাড়ার প্রকাশকরাই তাঁর সৃষ্টিকে তাঁর পাঠক-সমাজের সামনে উপস্থিত করেছেন। প্রথম প্রথম তিনি তাতেই কৃতজ্ঞ ছিলেন। এর চেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার যেন আর নেই। নিজের চিন্তার এই গ্রন্থবদ্ধ আক্ষরিক রূপ দেখেই তিনি পরিতৃপ্ত। আর কিছু কামনা করা, যাচনা করা অবান্তর, অশিষ্টতা। তাঁর সৃষ্টিকে যাঁরা প্রকাশ করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই শিল্পী। মুদ্রাকর শিল্পী, দপ্তরী শিল্পী, প্রকাশক শিল্পী। প্রত্যেকের শিল্প-

ভাবনা তাঁর প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে মিশে আছে। ভেবে বিস্মিত হতেন নীলকান্ত। তিনি একা নন, একক নন। এক অর্থে সব সৃষ্টিই যৌথ সৃষ্টি। যে ভাষায় তিনি লেখেন সে ভাষা একটি জাতির, যে চিন্তার ধারা তিনি অনুসরণ করেছেন তার মধ্যে যুগযুগান্তব, দেশ-দেশান্তরের মানুষের ভাবনার ধারা এসে মিশেছে। তাঁদের কেউ কেউ খ্যাতনামা, অনেকেই অজ্ঞাতনামা অখ্যাতনামাব দলে। যে উপাদান তিনি ব্যবহাব করেন তাও পাঁচজনের। জীবন মানেই সমষ্টি জীবন। মানুষেব সঙ্গে মানুষেব, বস্তুর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের কাহিনী। এব মধ্যে তাঁব ব্যক্তিত্ব কোথায়, নিজত্ব কোথায়, মাঝে মাঝে খুঁজতে চেষ্টা কবতেন নীলকান্ত। অনুসন্ধানেব কোন্ পদ্ধতি নিলে এই জনসিন্ধুব ভিতবে সেই ব্যক্তি বিন্দুকে তিনি প্রত্যক্ষ কবতে পাববেন? নাকি সৃষ্টিব সেই বিন্দু দৃষ্টিগোচব না, তা শুধু অনুভব্য। নিজেব অবয়বী আকৃতিব দিকে চেয়ে দেখতেন নীলকান্ত। তিনি যেমন মানব সমাজেব একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ, তেমনি একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিও। যে ব্যক্তি কোন দিন ছিল না, কোনদিন হবে না, সমদ্বিবাহু ত্রিভুজেব মত আর একটি ত্রিভুজেব সঙ্গে এক হয়ে কোনদিন যে মিলে যাবে না তিনি সেই বিশিষ্ট মানুষ। একই দেহে তাঁব এই দুই রূপ। একই সময়ে তিনি অখণ্ড ব্যক্তি, আবার জনসমাজেব ভগ্নাংশ। এ এক মজাব কথা যাব মধ্যে ব্যক্তিত্ব যত বেশি জনসমাজের সে তত বড প্রতিনিধি। যে দশজনেব একজন সেই একজনে একসহস্র জন। নীলকান্ত ভাবতেন তাঁব লেখাও তেমনি। তা যৌথসৃষ্টি হয়েও তাঁর একক সৃষ্টি। তিল প্রমাণ ব্যক্তিমানুষেব সৃষ্টি। যে সৃষ্টির মধ্যে এই ব্যক্তিত্বকে পাওয়া যায় না তা লবণহীন ব্যঞ্জনের মত, লাবণ্যহীন রূপেব মত বিস্বাদ, ব্যর্থ।

রাস্তা পাব হতে হতে দু'একজন পথচারীর সঙ্গে ধাক্কা লাগল নীলকান্তের, দু'একজন ড্রাইভারের গালাগাল খেলেন। কিন্তু তাতে তিনি তেমন লজ্জা বোধ করলেন না। তিনি ফের তাঁর চিন্তালোকে ফিরে গেছেন। সেই তাঁর স্বদেশ, স্বলোক। এই বাস্তব পৃথিবী তাঁর কাছে পরলোক মাত্র।

কলেজ স্ট্রীটের বড় বড় বইয়ের দোকানগুলির সামনে হঠাৎ থেমে গেলেন নীলকান্ত। কোথায় যাচ্ছেন তিনি, কোথায় যাবেন? বহু কৃতী লেখক বন্ধুর নাম মনে পড়ল। যাঁরা পরে সাহিত্যক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে কৃতী হয়েছেন, ধনী হয়েছেন, নামী হয়েছেন এমন কয়েকজনের কথাও ভাবলেন নীলকান্ত। কিন্তু কারো কাছে যেতেই মন সরল না। যাঁর কাছে যাবেন তিনি যদি নীলকান্তকে দেখে তৃপ্তি না পান, স্বস্তি না পান তাহলে তিনি দ্বিগুণ অস্বস্তিবোধ করবেন। তার চেয়ে এই জনারণ্যের নির্জনতা ভালো। বাড়ি থেকে যখন বেরোন, নীলকান্তের আশঙ্কা হয়েছিল পাছে কোন চেনা মানুষের মুখোমুখি হয়ে পড়েন। তাহলে তাঁর এখনকার জীবন আর জীবিকা সম্বন্ধে বহু কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। অনেক প্রশ্নেরই সদুত্তর দিতে পারবেন না। তার চেয়ে পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা না হওয়াই ভালো। কিন্তু চলতে চলতে সত্যিই যখন দেখলেন কারো সঙ্গেই দেখাসাক্ষাৎ হচ্ছে না, এই পরিচিত শহরের পুরোন পাড়ায় তিনি একেবারে অচেনা মানুষ হয়ে পড়েছেন, তখন আর তেমন ভালো লাগল না নীলকান্তের। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধান, নিষ্ক্রিয়তায় তিনি সাহিত্যলোক থেকে একেবারে নির্বাসিত হয়ে গেছেন। তাঁর সম্বন্ধে পাঠক, লেখক, প্রকাশক কারোরই যেন আর কোন কৌতূহল নেই, উৎসাহ নেই। রবীন্দ্রনাথের কাদম্বিনীর মত তাঁকেও কি মরে প্রমাণ করতে হবে তিনি তার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন? নিজের অস্তিত্ব প্রমাণের আর কোন উপায়ই কি নেই অস্তিত্বহীন হয়ে যাওয়া ছাড়া। হঠাৎ কেমন যেন অসহায় বোধ করলেন নীলকান্ত। তাঁর মনে হল যেন সত্যিই বিদেহী হয়ে গেছেন। তিনি সবাইকে দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু আর কেউ তাঁকে দেখতে পারছে না। দেখতে পারলে কি এমন উদাসীন হয়ে থাকত? ব্যক্তি মানুষ হিসাবে এমন করে অবজ্ঞা করতে পারত! এই ভিড়ের মধ্যে তিনি কি করে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করবেন? কোন গাড়ির তলায় চাপা পড়ে? কোন অঘটন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে, নাকি, কাউকে ধাক্কা দিয়ে? হঠাৎ হো হো ক'রে হেসে উঠে, কি

হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে তিনি সবাইকে জানিয়ে দেবেন যে তিনি আছেন। এর প্রত্যেকটি কাজ করে দেখবার ইচ্ছা হল নীলকান্তের আর প্রত্যেকটি ইচ্ছাকেই নিজে জোর ক'রে চেপে রাখলেন। সত্যিই কি কোন ভূত এসে তাঁর ওপর ভর করেছে? এ সব বাজে কথা কি ভাবছেন তিনি? তিনি কি মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন? একবার ইচ্ছা হল কোন পুরোন প্রকাশকের দোকানে গিয়ে ওঠেন, কোন পরিচিত মানুষের আশ্রয় পেলে স্বীকৃতি পেলে তিনি বেঁচে যাবেন। কিন্তু যদি তারা স্বীকৃতি না দেয়, যদি তাদের চোখেও অনাদর অবহেলার দৃষ্টি ফুটে ওঠে তাহলে কি করবেন নীলকান্ত? তার চাইতে এই অজ্ঞাতবাস, নির্জন আত্মগোপন অনেক ভালো। পরিচিত লোকের অবজ্ঞার চেয়ে অপরিচিতের ঔদাসীন্য ঢের বেশি সহনীয়।

বড় বড় দোকান আর বড় রাস্তা ছেড়ে তিনি বাঁদিকের গলির মধ্যে ঢুকলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, বাংলার ঔপন্যাসিকদের আদিপুরুষের নামে রাস্তা। কিন্তু যেতে যেতে পথচারীদের মধ্যে কজনেই বা এই নামটি পড়েছে, কজনেরই বা নামটির অর্থগৌরবের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। অনেকের কাছেই নামটি শুধু অক্ষরের সমষ্টি, নিতান্তই একটি রাস্তার নামের অংশ। নাম সব সময় বিশেষ অর্থের ব্যঞ্জনাকে যে বয়ে আনবেই তার কোন মানে নেই। নীলকান্তের মনে হল বরং অনেক সময়েই তা আনে না। দেহের মধ্যে মানুষ যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষুধা-তৃষ্ণা আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বাঁচে, নামের মধ্যে কি কৃতকর্মের মধ্যে তেমন করে বাঁচবার উপায় নেই। তবে কাজের ফলটা থেকে যায়। বৃক্ষ লতা পাতা সব বাদ দিয়ে শুধু ফল।

সংস্কৃত কলেজের সামনে ফুটপাতের ওপর দু'তিনজন লোক রাশ রাশ পুরোন বই বিছিয়ে বসেছে। এই বইগুলি নেড়ে-চেড়ে দেখা, মাঝে মাঝে পছন্দমত দু'একখানা পুরোন বই কিনে নেওয়া নীলকান্তের বহুকালের অভ্যাস। আজও সেদিকে এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ তাঁর নিজের হাতের বইখানা সম্বন্ধে খেয়াল হল। এই বইখানাই বা তিনি বয়ে বয়ে বেড়াচ্ছেন কেন। মনে পড়ল বাঁধাতে দেবেন বলে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন মাত্র

ক' আনার পয়সা অবশিষ্ট আছে। তাও মালার দেওয়া। মালা তাকে যাতায়াতের বাসভাড়া ছাড়া আরো আনা চারেক পয়সা দিয়েছে। তার বেশি দেয়নি। ইচ্ছা করেই দেয়নি, নাকি ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দেয়নি। যাই হোক, নীলকান্তের পক্ষে তা একই কথা। এই অবস্থায় বইখানা বাঁধতে দিয়ে তিনি কি করবেন। মালা যদি পয়সা না দেয় তো তাঁর মূল্যবান শেকস্‌পীয়র-খানা দপ্তরীর কাছেই পড়ে থাকবে।

শেষ পর্যন্ত সেই দপ্তরী হয়ত আর কাউকে বিক্রি করে দেবে। তার চেয়ে তিনি বইখানা বিক্রি করে দিলে আরো ভালো হয়। পকেটে কয়েকটা টাকা আসে। আর সেই টাকায় তিনি আরো কয়েকবার কলকাতায় যাওয়া-আসা করতে পারেন। সেই ভালো। তিনি বইখানা নিয়ে এগিয়ে গেলেন দোকান-দারের কাছে।

'বইখানা বিক্রি করতে চাই। নেবে?'

দোকানী বইখানা তাঁর হাত থেকে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার বই?'

নিজে না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছেন না, তবু শেকস্‌পীয়রের গ্রন্থাবলী বিক্রি করতে এসেছেন এর চেয়ে লজ্জার কি আছে? নীলকান্ত বললেন, 'না, ঠিক আমার নয়। আমারই জানাশোনা। আমাকে বিক্রি করতে দিয়েছে।'

দোকানী মৃদু হেসে বলল, 'বুঝেছি। কিন্তু আমি তো ইরেজী বই রাখিনে। আপনি ওই বিনোদের কাছে যান।'

নীলকান্ত বিনোদের কাছে গিয়ে ফের বললেন, 'বইটা বিক্রি করতে চাই।'

বিনোদ পুরোন বইয়ের কারবার করতে করতে বইয়ের নাম আর দাম চেনে। শেকস্‌পীয়রখানা পেয়ে সে খুশীই হল। কিন্তু উৎসাহের ভাব না দেখিয়ে উদাসীনের ভঙ্গিতে বলল, 'ছিঁড়ে ফিড়ে বইটা তো আপনি শেষ করে এনেছেন। এ বই নিয়েই বা কি হবে? কত চান আপনি?

নীলকান্ত বললেন, 'পাঁচ টাকা।'

বিনোদ হেসে বলল, 'কি যে বলেন, বইয়ের যা অবস্থা এর দাম পাঁচসিকেও

হবে না। এ বই বিক্রি করতে হলে আমাকে ফের বাঁধিয়ে নিতে হবে। আমি আপনাকে একটি টাকা দিচ্ছি।'

নীলকান্ত বললেন, 'এক টাকায় শেকস্‌পীয়র হয় না।'

এই প্রথম জিনিস বিক্রি করতে এসেছেন নীলকান্ত। কিন্তু পাকা ব্যবসায়ীর মত দরাদরি শুরু করলেন। নতুন কাজ, নতুন ভূমিকা, নতুন জন্ম। আর নতুনত্বে সব সময়েই আনন্দ। শেষপর্যন্ত তিন টাকা দাম দিতে বাধ্য হল বিনোদ। নীলকান্ত ভাবলেন জীবনের সব জায়গায় হেরে হেরে এই একটি জায়গায় তিনি জিতে গেছেন। এবার থেকে তাঁর জয়ের পালা শুরু হল, আর ভয় কি।

নীলকান্ত তিনটি টাকা পকেটে ফেলে ভাবলেন এখন আর তিনি কপর্দক-হীন নন। এই তিনটাকা তাঁর স্বোপার্জিত। এ টাকা দিয়ে তিনি যা খুশি তাই করতে পারেন। কিন্তু তিনটাকায় কতটুকু খুশিই বা কেনা যাবে। পরমুহূর্তে নীলকান্তের মনে অনুশোচনা এল। ছি ছি ছি, এ কি করলেন তিনি। এমন প্রিয় এমন মূল্যবান বইখানা বিক্রি করে দিলেন? আর কি ফের তিনি একখানা শেকস্‌পীয়র কিনতে পারবেন? এখনো বইখানা ফিরিয়ে আনা যায়। এখন আস্ত টাকাগুলি তাঁর পকেটে আছে। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরে আর থাকবে না। মানুষের দুখানা হাত দু'খানা পা। কিন্তু টাকার হাত পা অনেকগুলি। টাকার পাখা আছে। নীলকান্ত ইচ্ছে করলে এখনো বইখানা ফিরিয়ে আনতে পারেন। কিন্তু আনতে গেলে লোকটি নিশ্চয়ই পাগল বলে তেড়ে আসবে। তিনি তো আর সত্যিই পাগল নন। নীলকান্ত পাগল হতে চান না। শুধু নতুন মানুষ হতে চান। নিজেকে দিয়ে নতুন চরিত্র সৃষ্টি করতে চান। সেই সৃষ্টির ক্ষমতা তাঁর এখনো আছে। তার জন্যে কাগজ কলমের দরকার হয় না। নীলকান্ত ইচ্ছা করলেই বরদাকান্ত হতে পারেন কি প্রিয়লাল পোদ্দার। শেষ নামটাই ভালো। আর নামান্তর মানেই রূপান্তর, রূপান্তর মানেই জন্মান্তর। একই জন্মে বহু জন্ম নেওয়া, এত সহজ, এত সহজ। নীলকান্ত হঠাৎ বেশ খুশী হয়ে উঠলেন।

ফিরে গেলেন বাংলা বইয়ের দোকানে। খ্যাত অখ্যাত অনেক পুরোন বই এখানে ছড়ানো। নীলকান্ত ইচ্ছা করলে দু'এক খানা বই এখন কিনে নিতে পারেন। কিন্তু বই যদি কিনবেনই তো বিক্রি করলেন কেন। নীলকান্ত বিখ্যাত দু' চারখানা বই সরিয়ে রাখলেন। অখ্যাতনামাদের বইগুলিই নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলেন। কামাখ্যাচরণ তালুকদারের লেখা সুহাসিনী, সুরেন্দ্র-মোহন মিত্রের গল্পসংগ্রহ পঞ্চপ্রদীপ। দু তিন কপি করে আছে। নিজের লেখা দু' একখানা বই খুঁজতে লাগলেন নীলকান্ত, পেলেন না। কিন্তু পাওয়াই সম্ভব ছিল। তিনি না পেলেও আর একজন পাবে। কিংবা এই মুহূর্তেই হয়ত পাচ্ছে। এই শহরেরই অন্য কোন ফুটপাতের দোকানে হয়ত নীলকান্তেরই কোন বই কোন রাধাকান্ত কি সুধাকান্ত এমনি করে নেড়ে চেড়ে সরিয়ে রাখছে। নীলকান্ত নামটি কোন অর্থ বহন করছে না তার কাছে। কারণ বাংলা সাহিত্যে নীলকান্তের নাম এখন বিস্মৃত। দু'চারজন পাঠক হয়ত দয়া করে মনে রেখেছেন। নীলকান্ত জানেন তার সমসাময়িকদের মধ্যে এই দশা অনেকেরই হবে দুদিন আগে আর পরে। তাঁর মত অনেকেরই নামের কোন মানে থাকবে না। কিন্তু নাম অর্থহীন হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লেখাও কি অর্থহীন হবে? কোন অজ্ঞাতনামা পাঠক তাঁর মত অজ্ঞাতনামা একজন লেখকের লেখা যখন নিতান্ত সময় কাটাবার জন্যে, কি বইখানা হঠাৎ হাতের কাছে পড়েছে বলে উলটে পালটে দেখবে তখন কি তা একেবারেই নিরর্থক মনে হবে? তা হবে না। নামের মানে যত তাড়াতাড়ি ক্ষয় পায়, একটা ভাষার অর্থ তত দ্রুত বদলায় না। সেও হয়ত গল্পটা বুঝবে। যে সব মানুষের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ নীলকান্ত নিজের লেখার মধ্যে ধরে দিতে পেরেছেন তাদের সুখদুঃখ হাসিকান্নায় সেই পাঠক হয়ত কিছুক্ষণের জন্যে আবিষ্ট হবে। তার কাছে নীলকান্ত নামের কোন মানে থাকবে না, কিন্তু তার সৃষ্ট চরিত্র-গুলির কিছু অর্থ কিছুক্ষণের জন্যে কোন পাঠকের মনে হয়ত তখনো থাকবে। তারপর সেই কিছুত্বও মিছে হয়ে যাবে। বেশির ভাগ লোকই তাই যায়, ভবিষ্যতে এমনি মিছে হয়ে যায়। তাই বলে বর্তমানটাও কি মিছে? ভবিষ্যতের

ভাবনা ছেড়ে দিয়ে বর্তমানের এই ক্ষণটিকে কি নীলকান্ত মাহেন্দ্রক্ষণ করে তুলতে পারেন না? সেই এক একটি দুর্লভ ক্ষণকে কি তিনি মহাকালের হাতে তুলে দিয়ে যেতে পারেন না? না, আর সময় নেই, তাঁর আর সময় নেই। জীবনের বহু মূল্যবান ক্ষণকে তিনি ব্যর্থ করে দিয়েছেন। বেঁচে থেকেও তিনি বেঁচে থাকেননি, এই মুহূর্তেই তিনি বেঁচে নেই। শুধু শারীরিকভাবে বেঁচে থাকা শুধু অভ্যাসবশে শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়াটা জীবনধারণ হ'তে পারে, জীবনযাপন নয়।

নীলকান্ত ভাবলেন ভুলতে হবে। ব্যর্থতা অকৃতকার্যতা এমনি সব ভুলে যাওয়া চাই। তাঁকে সবাই ভুলে গেছে। কিন্তু তিনি তো নিজেকে ভুলতে পারেন নি।

বই বিক্রি করা কটি টাকা ঝুল পকেটে এখনো রয়েছে। এই সম্বল নিয়ে এক রাত্রির জন্য তিনি এই মহানগরীর মধ্যে হারিয়ে যেতে পারেন না?

তাঁর মনের মধ্যে সেই পুরোনো অভ্যাস নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সেই পুরোনো দুর্নিবার ইচ্ছার মধ্যে নীলকান্ত নব যৌবনের স্বাদ পেলেন।

আর একবার হয়তো শেষ বারের মত নীলকান্ত নিরুদ্দেশ হবার পথে পা বাড়ালেন। তিনি হারিয়ে যেতে চান। কেউ যেন তাঁকে আর খুঁজে না পায়।

সারা রাত দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় জেগে কাটালেন নির্মলা। আ জাগল মালা। ওর ছোট ভাইবোনেরা সব ঘুমিয়ে পড়ল। রাত বারটা বাজল, একটা বাজল, নীলকান্তের ফেরার নাম নেই। নির্মলা বললেন, 'হাসপাতাল থেকে খেটেখুটে এসেছিস, তুই আর কতক্ষণ বসে থাকবি। তুই খেয়ে নে মালা।'

মালা বলল, 'আমার খেতে ইচ্ছে করছে না মা। কিছুই ভালো লাগছে না আমার।'

নির্মলা বললেন, 'তোর ভালো লাগছে না, আর আমি বুঝি সুখের সাগরে ভাসছি। যা বলছি শোন। আমাকে আর অনর্থক জ্বালাসনে।'

ভারি একগুঁয়ে মেয়ে। একবার না বললে আর হাঁ করানো যাবে না। শত বকাবকি করলেও মালা জেদ ছাড়বে না। সারারাত না খেয়ে চুপ ক'রে পড়ে থাকবে।

অগত্যা নির্মলা নিজেই উঠে পড়লেন। স্বামীর ভাত থালায় করে বেড়ে শোবার ঘরে এনে ঢেকে রাখলেন। তারপর একই থালায় দুজনের ভাত বেড়ে মেয়ের হাত ধরে টেনে এনে বললেন, 'আয় খেয়ে নিই আমরা না খেয়ে থাকলে তো আর ভাগ্য ফিরবে না। বহুদিন তা থেকে দেখেছি।'

ছোট রান্নাঘর। একপাশে একখানা ইটের ওপর কেরোসিনের ডিবেটা জ্বলছে। ইচ্ছা ক'রেই এঘরে হ্যারিকেনটা জ্বালেননি নির্মলা। তাতে বেশি তেল পোড়ে। এমনি প্রত্যেকটা কাজে হিসাব ক'রে ক'রে চলেন নির্মলা। জীবনভর এমনি হিসাব করেই এলেন। আর একজন তার শোধ নিল সমস্ত জীবনটাকে বেহিসাবে অপচয় করে। আতসবাজির মত শুধু নিজের জীবনটাই পোড়াল না, আশেপাশে যারা এসেছিল তাদেরও পুড়িয়ে ছারখার করে দিল। আস্তে একটা নিশ্বাস চাপলেন নির্মলা।

মালা বলল, 'সব ভাত-তরকারি আমার দিকে ঠেলে দিচ্ছ কেন মা। তুমি কিছুই খাচ্ছ না যে।'

নির্মলা বললেন, 'খাচ্ছি খাচ্ছি। আর কত খাব।'

মালা বলল, 'রাস্তার মোড় থেকে শেষ বাসটা দেখে এলাম। এত রাত্রে ফিরতি ট্রেনও আর নেই। কোথায় যে রইলেন।'

নির্মলা বললেন, 'কোথায় আর থাকবে। সেই চুলোয় ছাড়া আর যাওয়ার জায়গা আছে নাকি কোথাও ?

মেয়ের কাছেও কিছুই আজকাল আর গোপন করেন না নির্মলা। মালার কাছে কোন কথা গোপন আর নেইও। না বলতেই সে সব জেনেছে, না বললেও সব বুঝবে। প্রথম প্রথম সংকোচ হ'ত। মেয়ের কাছে তার বাপের চরিত্রহীনতার কথা প্রকাশ করলে শুধু তো নীলকান্তই অপদস্থ হবেন না, নির্মলার নিজের মর্যাদাতেও যে ঘা লাগবে। কিন্তু বড় হয়ে মালা যখন সব বুঝতে পারল, নিজের কানে সব শুনল, নিজের চোখে অনেক কিছু দেখল, অনেক না-দেখা, না-শোনা ব্যাপার মনে মনে অনুমান করে নিল, অনুভব করে নিল, তখন নির্মলাও আর মুখ বুজে রইলেন না। সকল দুর্ভোগ মেয়ের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন। স্বামীর সমস্ত দুষ্কৃতির কথা মেয়েকে আস্তে আস্তে একটু একটু করে দীর্ঘকাল ধরে জানিয়ে দিলেন। ঠিক জানিয়ে দেওয়া নয়, জানতে দেওয়া। মেয়ের সঙ্গে একই ঘরে যেমন বাস করেন, একই শাড়ি যেমন বদলে পরেন, এও প্রায় তেমনি। একই দুর্ভোগ আর দুর্ভাগ্যকে ভাগ করে নেওয়া। আস্তে আস্তে নির্মলা ভুলে গেলেন মালা তার মেয়ে। সঙ্গিনী হলেও সমবয়স্কা নয়, অভিজ্ঞতার সমভাগিনী নয়। মালা মাঝে মাঝে তার বাপের পক্ষ নিয়ে কথা বলে, বাপের ওপর পক্ষপাত দেখায়। স্বামীর অনাচার অত্যাচার আর দুষ্কৃতির কথা উদ্ঘাটন করে তার সেই পিতৃপ্রেমের যেন শোধ নিতে চান নির্মলা। মালা বুঝুক তার মা-ই শুধু চরিত্রহীন স্বামীর স্ত্রী নয়, মালা নিজেও চরিত্রহীন বাপের মেয়ে।

মালা বোঝে। অল্প বয়স থেকেই অতিরিক্ত মাত্রায় বোঝে। মাঝে

মাঝে সত্যিই নিজেকে তার মার সমবয়সী মনে হয়। ছোট ভাইবোনদের যখন আদরযত্ন শাসন করে তখন তারা মার সঙ্গে দিদির তুলনা দেয়। মালার একেক সময় মনে হয় সংসারের তিক্ততায় কুশ্রীতায়, কৃচ্ছ্রতায় সে নিজেই যেন তার দ্বিতীয় মা। তার বয়সের গাছপাথর নেই, অভিজ্ঞতার সীমা পরিমাণ নেই, জীবনের সব গোপন রহস্যই যেন তার কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে। এইজন্যে মণিমামার সঙ্গেও সে তাল রেখে চলতে পারে। সব প্রৌঢ় আর বৃদ্ধের সে সমবয়সী, নিজের বয়সীরা কেউ তার কাছে ঘেঁষে না। মালা নিজেও তাদের কাছে যেতে ভয় পায়। তাদের উচ্ছ্বাস উচ্ছলতা তারল্যে চাপল্যে কখনো বিরক্ত হয়, কখনো বা ঈর্ষা বোধ করে।

নির্মলার কথার জবাবে মালা বলল, 'কিন্তু মা, তুমি যা ভাবছ তাতো নাও হ'তে পারে। ওসব খাওয়ার মত টাকাতো বাবার হাতে নেই। আমি মাত্র একটি টাকা তাঁকে পথখরচা দিয়েছি। যদি এমন হয় কোন বিপদ আপদে পড়েছেন। কলকাতার যা রাস্তা যা গাড়িটাড়ির ভিড়, অ্যাকসিডেণ্ট হ'তে কতক্ষণ। আমার কেবল সেই ভয়ই হচ্ছে মা।'

নির্মলা হাসলেন, 'ভয়! তোর মুখে সোনা ফলুক মালা। তাহলে তো বাঁচি। সে ডাইনী মাগীটার ঘরে না গিয়ে সে যদি হাত-পা ভেঙে হাসপাতালে গিয়ে পড়ে থাকে আমার কোন দুঃখ থাকে না।'

মায়ের এই উৎকট ঈর্ষায় একটু হাসি পেল মালার। এতকাল হয়ে গেল তবু নীরজাবালার নামগন্ধ মা সহ্য করতে পারে না। তাদের আর কত ক্ষতি করবে, কত অনিষ্ট করবে সেই মুটকী বুড়ী অভিনেত্রী। যা করবার তাতো করেই ফেলেছে। আজ মালার বাপ সত্যিই যদি তার বাড়িতে না গিয়ে রাস্তায় গাড়িচাপা পড়ে থাকে তাহলে কি মালাদের দুঃখ দুর্ভোগ কিছুমাত্র কম হবে?

রাত নটার পরেও নীলকান্ত ফিরে না আসায় মালা ছোট ভাই যীশু বিশুকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে অনেক ছুটোছুটি করেছে, হ্যারিকেন নিয়ে গেছে রাস্তার মোড় অবধি। বাস থেকে নেমে-আসা প্রত্যেকটি লোকের মুখের দিকে আশান্বিত

হয়ে তাকিয়েছে, তবু কোন কৌতূহলী প্রতিবেশীকে আসল কথা বলতে পারেনি, আশঙ্কার কথা জানাতে পারেনি। পাড়াপড়শীদের কেউ কেউ নিজেরাই উপযাচক হয়ে এসে খোঁজ নিয়েছে। কেউ বলেছে, 'নীলকান্তবাবু গেলেন কোথায়?' কেউ জানতে চেয়েছে, 'এত রাত্রেও রায় মশাই ফিরে এলেন না যে?' মালা কি তার ভাইবোনেরা কিছু জবাব দেওয়ার আগেই নির্মলা বলে ফেলেছেন, 'সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবদের কাছে গেছে। গল্পে গল্পে কি আর রাতের খেয়াল থাকে! বন্ধুর তো আর অভাব নেই কলকাতা শহরে।'

আর একজনকে জবাব দিয়েছে, 'কি জানি বাপু, সভা-সমিতির ব্যাপার। ওসব বক্তৃতা আরম্ভ হলে কি আর তা শেষ হতে চায়? গানবাজনাই বল, আর এই সাহিত্য-টাহিত্যই বল, সব হ'ল নেশার জিনিস। এতে কি আর সকাল সন্ধ্যা জ্ঞান থাকে?'

শ্রোতা আন্তরিকতার ভান করে বলেছেন, 'তা তো ঠিকই মাসীমা। মেসোমশাই বুঝি কোথাও সভাপতিত্ব করতে গেছেন?'

নির্মলা মুখে হাসি টেনে বলেছেন, 'হ্যাঁ বাবা। যেতে চান না, শরীরে কুলোয় না, তবু ধরাধরি করলে একেকদিন না গিয়েও পারেন না। আহা, কত দূর-দূরান্তর থেকে কত আশা করে মানুষ আসে।'

শুনতে শুনতে মালা লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। ছি-ছি, এই মিথ্যা কথাগুলি ফটিকের কাছে কেন অমন করে বলছেন মা। ফটিক চালাক ছেলে। ওর কি কিছু বুঝতে বাকি আছে? ও হয়ত সরে গিয়ে এখনই হো-হো করে হাসবে। ওর বন্ধুদের নিয়ে কৌতুক করবে? নীরজাবালাই শুধু অভিনেত্রী নয়, তার চেয়েও বড় অভিনেত্রী মালার মা। অনর্থক এই আত্মপ্রতারণার কি দরকার ছিল। মালার বাবা যে জ্যোতিহারা মরা তারা, নিবন্ত আগ্নেয়গিরি, একথা কি এ-পাড়ার কারো জানতে বাকি আছে? যারা লেখাপড়া জানে না, তারাও জানে, মালার বাবা আজকাল আর লেখেন না, লিখতে পারেন না। তার বাবাকে যে সবাই ভুলে গেছে, যারা আজকাল

মনে রেখেছে, তারা যে ঘৃণা, অনুকম্পা, উপহাসের পাত্র বলেই মনে রেখেছে, একথা কি মা নিজেও জানেন না ? তবু কেন ওসব কথা বললেন তিনি ? বলে সকলেরই মুখ হাসালেন ? মায়ের ওপর মালার খুবই রাগ হয়েছিল তখন।

কিন্তু এখন কেরোসিনের ডিবার স্বল্প আলোয় এই গভীর রাত্রে মায়ের সঙ্গে একই থালায় বসে খেতে খেতে, মায়ের না খাওয়া দেখতে দেখতে, তাঁর চিন্তাগ্রস্ত চোয়ালজাগা মুখখানার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ভারি মায়া হল মালার মনে। মালা ভাবল, মা যদি অভিনয় করে থাকেন, ঠিকই করেছেন, তাতে দোষের কিছু হয়নি। সে প্রতারণায় কারো কোন ক্ষতি হয়নি। অথচ সেই অভিনয়ই মালার মার জীবনে কিছুক্ষণের জন্যে সত্য হয়ে উঠেছে। যা হয়নি, অথচ যা হতে পারত, যা হওয়ার কথা ছিল, যা হলে সুখের সীমা ছিল না, ছলনার মধ্যে সেই অপরিতৃপ্ত আশাকেই প্রকাশ করেছেন মা।

সেই সব গৌরবের দিনের এক আধটু স্বাদ পেয়েছেন নির্মলা। ছোটখাট সাহিত্য সভা থেকে যখন নীলকান্তের ডাক পড়ত, মালা পড়ত গলায়, সেই আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ, মান-মর্যাদার দিনগুলি দেখতে শুরু করেছিলেন নির্মলা। কিন্তু শুরুতেই সব শেষ হয়ে গেল। সেই মানুষ রইল, কিন্তু মন রইল না। সেই ফুল রইল, কিন্তু গন্ধ রইল না।

ভোর হওয়ার আগেই ঘুম ভাঙল মালার। উঠে দেখল নির্মলা আরো আগে উঠে পড়েছেন। মালাকে দেখে বললেন, 'সত্যি, কি যে কাণ্ডটা হল, কিছুই বুঝতে পারছি না। যা চলাফেরার ছিরি, নিশ্চয়ই কোন একটা অঘটন ঘটিয়ে বসেছে। আমার কপালে তো সুখের সীমা নেই। এখন ওইটুকু হলেই সব পূর্ণ হয়।'

মালা বলল, 'অত ভাবছ কেন মা। অনেকদিন পরে কলকাতায় গেছেন। নিশ্চয়ই কোন বন্ধু-টন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাঁদেরই কেউ নিয়ে গেছেন বাড়িতে।'

নির্মলা মাথা নেড়ে বললেন, 'না রে না। এতকাল একসঙ্গে আছি, তাকে

চিনতে কি আমার কিছু বাকি আছে? এখন আর কোন বন্ধু-বান্ধব তার নেই। থাকবে কি করে? বন্ধুদের সে শত্রুর মত এড়িয়ে চলে। মানুষ-জনের কাছে গেলে কি আর এমনভাবে কপাল পুড়ত? তাহলে কাজকর্ম জুটত, স্বভাব-টভাবও অন্যরকম হত। সে কারো কাছে যায়নি মালা।'

মায়ের উদ্বেগ আর ব্যাকুলতা মালার মনেও যেন সংক্রামিত হল। সত্যি যদি তেমন কোন বিপদ-আপদ ঘটে, তাহলে কি উপায় হবে? কি করে খুঁজে বার করবে বাবাকে? হাসপাতালগুলিতেই আগে খোঁজ করবে, না থানায় খবর দেবে? মালা যেন বিমূঢ় হয়ে পড়ল।

নির্মলা বললেন, 'তোর ডিউটি তো সেই বিকেল বেলা। কি করবি, বিকেলের ভরসায় বসে থাকবি, না সকালেই গিয়ে একবার খোঁজখবর করবি?'

মালা বলল, 'দু-একটা বাস আগে দেখি। যদি এসে না পৌছেন, যেতেই হবে। নাকি মণিমামাকে খবর দিতে কাউকে পাঠিয়ে দেব? কলকাতায় যাবে-আসবে, তাতেও তো অনেক সময় লাগবে।'

নির্মলা বললেন, 'যা হয় কর বাপু। আমার মাথায় কিছু আর আসছে না। এরা সবাই মিলে আমাকে পাগল করে তবে ছাড়বে। আমার সুখ-শান্তির তো কোন সীমা নেই। অত সুখ তো কারো সহ্য হচ্ছিল না।'

বিশু, নীশু আর ছোট মেয়ে বীণাকে ডাকাডাকি করে প্রায় টেনে তুললেন নির্মলা, 'ওঠ তোরা সব। আর কত ঘুমুবি। একজন মানুষ সারা রাতের মধ্যে ফিরে এল না, তা বলে একটুও যদি তোদের চিন্তা-ভাবনা কিছু থাকে।'

ছোট ছেলেমেয়েদের যে অত বেশি বুঝবার মত বয়স হয়নি, বাইরে রাত্রি-বাসও নীলকান্তের এই প্রথম নয়, সেকথা এই মুহূর্তে নির্মলার মনে পড়ল না। অমঙ্গলের আশঙ্কাটাই তার বড় হয়ে উঠল। নিশ্চয়ই খারাপ কিছু ঘটেছে।

প্রথম বাস আর প্রথম ট্রেন আসবার সময় চলে গেল। কিন্তু সেই বাঞ্ছিত যাত্রীটি তখনো এসে পৌছলেন না।

কাকে খবর দেবে? কার সাহায্য চাইবে মালা? মণিমামা তো অনেক দূরে। হঠাৎ আর একজনের কথা মনে পড়ল। সে-ও খুব কাছের মানুষ

নয়। আলাপ-পরিচয়, আত্মীয়তা, বন্ধুতা কোন দিক থেকেই তাঁকে নিকটবর্তী বলা চলে না। তবু মালা তাঁকেই ডেকে পাঠাল। বিশুকে আড়ালে ডেকে বলল, 'শোন্, কীর্তিপুরে অমিয়বাবুদের বাড়ির কথা মনে আছে তোর? চিনে যেতে পারবি?'

বিশু বলল, 'পারব না কেন দিদি? সেই যে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলাম, সেই বাড়ি তো? আমাকে চোখ বেঁধে দিলেও সেখানে যেতে পারব। আমি একবার যা দেখি, তা কিছুতেই ভুলি না।'

বলল, 'থাক, তোর আর বাহাদুরি দেখাতে হবে না। সেখানে সেই বাড়িতে কমলাক্ষবাবুকে—তাঁকে চিনিস তো?'

বিশু বলল, 'চিনব না কেন? সেতার বাজায় তো?'

মালা এবার একটু হেসে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাজায়। তুই নিজের পড়া-শুনোর কোন খোঁজ খবর রাখিসনে। কিন্তু পরের কোন খবর জানতে বাকি থাকে না তোর।'

'তাঁকে গিয়ে বলবি—।'

বিশু মালাকে থেমে যেতে দেখে বলল, 'কি বলব দিদি? বাবা কাল সন্ধ্যার আগে বেরিয়ে গেছেন, আর ফেরেননি। এসব কথা বলব তাঁকে? বলা কি ঠিক হবে?'

মালা বলল, 'না, অত সব তোকে বলতে হবে না। ওসব বলে কাজ নেই তোর। বলবি—শুধু ব বি—মানে আমার নাম করে বলবি, আমাদের খুব দরকার। বিশেষ দরকার। তিনি যেন এক্ষুনি চলে আসেন।'

গেঞ্জিটা গায়ে দিয়ে বিশু তখনই ছুটে বেরিয়ে গেল। সে চলে যাওয়ার পর মালার যেন খেয়াল হল। ছি-ছি, কেন সে বিশুকে কমলবাবুর কাছে পাঠাল। আর অমন আকারে-ইঙ্গিতেই বা কথা বলতে বলল কেন? যদিও তাঁর বাবা মালার বাবার বন্ধু, তবু তেমন তো আসা-যাওয়া, যোগাযোগ নেই। তাছাড়া মালাদের তুলনায় কমলাক্ষরা কত ধনী। চালচলন, আদব-কায়দা সব আলাদা। বলতে গেলে একেবারে ভিন্ন সমাজের, অন্তত ভিন্ন স্তরের

মানুষ। নিজেদের আপদে-বিপদে কি ওঁদের ডাকা চলে? তাছাড়া আপদ-বিপদই বা এমন কি। বাবা কলকাতায় গিয়ে ফেরেননি, নিশ্চয়ই কোন বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধ এড়াতে পারেন নি তাই। এই সামান্য কারণে বিচলিত হয়ে মালা কমলাক্ষকে ডাকতে পাঠিয়েছে, একথা কি তিনি বিশ্বাস করবেন? না কি ভাববেন, এটা মালার ছল, নেহাতই একটা ছুতো, উপলক্ষটা কিছু নয়, কমলাক্ষকে ডেকে পাঠানোই লক্ষ্য। ছি, ছি, ছি, একথা যদি তিনি ভাবেন, তাহলে মালার লজ্জার আর শেষ থাকবে না। আর কি আক্কেল মালার। পাড়ায় এত লোক থাকতে, নিশীথ, পরেশদের মত সব জানাশোনা ছেলের থাকতে মালা একেবারে পাড়া ছাড়িয়ে গ্রাম ছাড়িয়ে অন্য কলোনীর মানুষকে ডাকতে গেল কেন। কারণে অকারণে ডাকবার মত আলাপ-পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা যে তাঁদের সঙ্গে হয়নি, বিশুকে পাঠাবার আগে এই বুদ্ধিটুকুও মালার হল না? মালা ভাবল, কমলাক্ষ যদি সত্যিই এসে পড়ে, তাঁর আসবার মত জরুরী একটা ব্যাপার যেন সত্যিই ঘটে যায়। যেন মালার মান বাঁচে, যেন তাকে কারো কাছে অপ্রস্তুত হয়ে না পড়তে হয়।

নির্মলা এগিয়ে এসে বললেন, ‘বিশুকে কোথায় পাঠালি মালা?’

একটু ইতস্তত করে মালা বলল, ‘বড় রাস্তায়। সেকেণ্ড বাসটা দেখবে। যদি সে বাসেও বাবা না আসেন, বিশুকে অমিয় কাকার বাড়িতে একটা খবর দিয়ে আসতে বলে দিলাম। তিনি তো বাবার পুরনো বন্ধু।’

নির্মলা বললেন, ‘ভালোই করেছিস। অমিয়বাবু এখনো আমাদের ভুলে যাননি। অমন ভালোমানুষ আর ভদ্রলোক এখনকার দিনে হয় না।’

তাঁর ছেলে যে আরো ভদ্রলোক আর তাঁর সঙ্গে যে বাসে আর হাসপাতালে মালার বেশ কয়েকদিন দেখা-সাক্ষাৎ কথাবার্তা হয়েছে, সে-কথা মালা সম্পূর্ণ চেপে গেল।

খানিক বাদেই চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্তি পেলেন নির্মলা। নীলকান্ত বাড়িতে এসে পৌঁছলেন। বেশবাস যতটা সম্ভব ভদ্র করতে চেষ্টা করেছেন। তবু চোখের লালচে ভাবটা এখনো যায়নি। পাঞ্জাবির আস্তিনে কিসের

একটা দাগ লাগা রয়েছে। স্বামীর দিকে একবার তাকিয়েই নির্মলা সব বুঝতে পারলেন।

যীশু আর রীণা বলে উঠল, 'বাবা ফিরে এসেছে রে, বাবা এসেছে।'

রীণা কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'বাবা, কাল রাতে কোথায় ছিলে তুমি? আমরা কত ভেবেছি।'

নীলকান্ত একটু হেসে আদর করে মেয়েকে কোলে টেনে নিতে গেলেন। কিন্তু নির্মলা বাঘিনীর মত মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন, খবরদার, ছুঁয়ো না তুমি, ওকে ছুঁয়ো না। ওই নোংরা হাত নিয়ে, নোংরা স্বভাব নিয়ে, লজ্জা করে না আমার ফুলের মত মেয়েকে ছুঁতে?'

মালা বাধা দিয়ে বলল, 'মা, এখন ওসব কথা থাক, এখন থামো।'

কিন্তু নির্মলা মেয়ের কথা কানে তুললেন না, থামলেনও না। স্বামীকে হাত ধরে টানতে টানতে ঘরের ভিতরে নিয়ে চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাত্রে কোথায় ছিলে সত্যি করে বল।'

নীলকান্ত মুখে হাসি টেনে মোলায়েম স্বরে বলতে গেলেন, 'আরে শোনো। সে-এক গল্প লিখবার মত ব্যাপার। আমার এক পুরোন ভক্ত হঠাৎ—।'

নির্মলা বাধা দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ভক্তের তো তোমার পথে-ঘাটে ছড়াছড়ি। মদ খেয়ে কোথায় ছিলে রাত্রে, তাই আগে শুনি?'

নীলকান্ত মৃদুস্বরে প্রতিবাদ করে বললেন, 'কি যে বল। মদ খাব কেন, ওসব তো ছেড়েই দিয়েছি—।'

নির্মলা চেঁচিয়ে উঠলেন, মুখ থেকে ভুর ভুর করে গন্ধ বেরোচ্ছে, তবু মিথ্যে কথা বলছ খাইনি? আশ্চর্য, লজ্জা করে না তোমার? গলায় দড়ি দিয়ে মরতে পার না তুমি? আমি ভেবেছিলাম, গলায় দড়ি দিয়ে মরতে না পারলেও গাড়িচাপা পড়ে মরেছে। তাতে কোন কষ্ট নেই। তাতে তো আর টাকা-পয়সার দরকার হয় না, বিদ্যেবুদ্ধির দরকার হয় না। তবে তাই কেন করলে না? কেন ফিরে এলে? কেন গাড়ির তলায় পড়ে মরলে না?'

নীলকান্ত স্ত্রীর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর হাসিতে স্নেহ মিশিয়ে বললেন, 'অতটা ভেবে দেখিনি। সেই সৌভাগ্যটুকু তোমার হতে পারত বটে।'

নির্মলা তেমনি উঁচু আর কর্কশ গলায় বলতে লাগলেন, 'ফের কথা বলছ? লজ্জা করে না কথা বলতে, লজ্জা করে না ওই সব করে ফের বাড়ী আসতে? মেয়ের রোজগার-করা টাকায় মদ খেয়ে বেশ্যা বাড়ি যেতে লজ্জা করে না তোমার?

মালা আর একবার এসে মাকে ধমক দিল, 'থামো মা থামো। কি যা-তা বলছ তুমি আশে পাশের সবাই যে শুনতে পাচ্ছে।'

নির্মলা বললেন, 'পাক পাক। আমি যা বলছি, সত্যি কথাই বলছি। সবাই তা জানে, তুইও জানিস। তুইও জানিস, তোর এত কষ্টের টাকা নিয়ে তোর বাবা মদ খেয়ে ওড়ায়, রাত্রে বেশ্যা বাড়িতে গিয়ে পড়ে থাকে।'

মালা কি বলতে যাচ্ছিল, বিশু এসে খবর দিল, 'দিদি কমলাক্ষবাবু এসেছেন। কিছুতেই ভিতরে ঢুকতে চাইছেন না। উঠানের একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তুমি যদি দেখা করতে চাও তো এসো।'

মালা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল। ছি, ছি, ছি। মার যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে। নিশ্চয়ই সব কথা ওঁর কানে গেছে। কি হবে। কি ওঁকে এখন গিয়ে বলবে মালা।

কমলাক্ষ সত্যিই কুণ্ঠিত হয়ে একপাশে দাঁড়িয়েছিল। তার গায়ে পুরোন আধ-ময়লা একটা সাদা পাঞ্জাবি। চুলটা আঁচড়ে আসবার সময় পায়নি, এমনি জোর তাগিদ ছিল বিশুর—এমনি ব্যস্ত আর বিমূঢ় হয়ে ছুটে এসেছে কমলাক্ষ।

মালা তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল তাঁর দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'আপনি এসেছেন।'

কমলাক্ষ একটু হেসে বলল, 'হাঁ, না এসে পারলাম কই। যা তাগিদ আপনাদের বিশুর। কি ব্যাপার বলুন তো? কেন ডেকেছেন?'

মালা তাঁর দিকে তাকিয়ে স্মিতমুখে বলল, 'কোন দরকারে নয়, এমনই।'

কমলাক্ষ একটু বিস্মিত হয়ে বলল, এমনিই।'

মালা অস্ফুটস্বরে বলল, 'হ্যাঁ, এমনিই।'

মালার বাবা-মার তখনো ঝগড়া আর প্রতিবাদ চলেছে। রাগ হয়ে গেলে নির্মলার আর কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। তিনি পরিবেশ আর পারিপার্শ্বিকতার কথা সম্পূর্ণ ভুলে যান।

কিন্তু নির্মলা যদি ভুলতে পাবেন, মালা কি তা পারে? এই ক্লেদ, গ্লানি, কুশ্রীতাকে আড়াল করে দাঁড়াতে কি পারে না মালা? অন্তত সেই চেষ্টাই সে করল। একটু হাসি দিয়ে, একটু কথা দিয়ে সে সব ঢেকে দিতে চাইল।

মালা হেসে বলল, 'এমনি কি ডাকতে নেই? এমনি কি আসতে নেই? চলুন ভিতরে গিয়ে বসবেন?'

ঝগড়া চেঁচামেচির শব্দ একটু কমে এলেও কমলাক্ষ তা এখনো শুনতে পাচ্ছে। সে একটু ইতস্তত করে বলল, 'না, আজ থাক। আর একদিন আসব। আজ সত্যিই আমার একটু কাজ আছে।'

মালা স্মিতমুখে বলল, 'আপনার কাজের ক্ষতি অবশ্য করতে চাইনে।'

কমলাক্ষ মৃদু হেসে বলল, 'তা জানি। কারো কোন ক্ষতি করাই আপনার পক্ষে সম্ভব নয়।'

কমলাক্ষ আর দাঁড়াল না। নমস্কার জানিয়ে মালার কাছ থেকে এবার সে বিদায় নিল।

দিনভর নীলকান্ত আর নির্মলার মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি চলল। মালা বারবার তাঁদের থামাবার চেষ্টা করেও থামাতে পারল না। চড়া গলায় নির্মলার চেঁচামেচিটাই অবশ্য বেশি শোনা যেতে লাগল। নীলকান্ত চুপ করে থাকলেও বাপের ওপর আজ আর মালার সহানুভূতি রইল না। বরং একটা তীব্র ঘৃণাই সে অনুভব করতে লাগল। কিন্তু এই ঘৃণা, বিদ্বেষ, কুশ্রীতা তার মনকে আজ আর পুরোপুরি অস্থির করে রাখতে পারল না। সকালে কমলাক্ষের

সঙ্গে যে দেখাটুকু তার হয়েছে, তা অল্পস্থায়ী হলেও বারবার সেকথা তার মনে পড়তে লাগল। সেই সাক্ষাৎ আর আলাপের মাধুর্যটুকু এই প্রতিকূল বিপরীত পরিবেশেও মালার মন থেকে মুছে গেল না। মালা ভাবল, মায়ের ওপর তার সহানুভূতি আছে, কিন্তু তাঁর রুচি আচার অভিজ্ঞতার সঙ্গে পুরোপুরি মিল নেই। বাবা-মার মেয়ে হয়েও সে যে বাবা-মার মত নয়, সে যে আলাদা, তা কি কমলাক্ষ লক্ষ্য করেনি? মালা ভাবল, নিশ্চয়ই সে তা লক্ষ্য করেছে? নইলে ছুটে আসবে কেন। মালার বাবা যে মদ খেয়ে এসেছে, তার চেয়ে অনেক বড় ঘটনা যে কমলাক্ষের এভাবে ছুটে আসা; মালা তা নিজের কাছে স্বীকার করে আনন্দ পেল।

কথাটা শতদলবাসিনীই প্রথমে পাড়লেন। মৃগাঙ্কের সঙ্গে এনাক্ষীর বিয়ে দিলে কেমন হয়। বিদ্যা, বুদ্ধি, বিত্ত প্রতিপত্তি সবদিক থেকেই মৃগাঙ্ক সুপাত্র। তাছাড়া বয়স আর স্বাস্থ্যেও ওর সঙ্গে এনাক্ষীকে চমৎকার মানাবে। ছেলে, ছেলের বউ, মেয়ে, নাতি নাতনীর চায়ের আসরে কথাটা তুলে শতদলবাসিনী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের মত আছে কিনা তাই বল।'

কল্যাণী বললেন, 'মার যেমন কথা। প্রভাকরবাবু আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ করবেন কেন। ওঁরা কত বড়লোক।'

শতদলবাসিনী বললেন, 'আহা, ভগবানের ইচ্ছায় তোমরাও তো কেউ না খেয়ে নেই। আর আমাদের পুনটুরীই কি মেয়ে হিসাবে ফেলনা নাকি?'

কল্যাণী হেসে বললেন, 'নিজের জিনিসকে কেউ কি খারাপ বলে মা?'

শতদলবাসিনী প্রতিবাদ করে বললেন, 'ভালোকে সবাই ভালো বলে। তার আবার নিজেরই বা কি, পরেরই বা কি। রূপে গুণে গানে বাজনায় পুনটুরী কারো চেয়ে কম নাকি। ও যার ঘরে যাবে সে ভাগ্য করে এসেছে।'

এনাক্ষী চায়ের টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমি চললুম ওঘরে। এসব ছাড়া কি তোমাদের আর কোন আলোচনার বিষয় নেই ঠাকুরমা?'

শতদলবাসিনী স্বীকার করে বললেন, 'নেই-ই তো। তোদের দুজনের বিয়ে দিতে পারলেই আমি এখন নিশ্চিন্ত। আর কোন্ কাজ আছে আমার?

উঠছিস কেন পুনটুরী, বোস। মৃগাঙ্ককে তোর নিজের পছন্দ হয়েছে কিনা তাই আগে বল।'

'তোমার ওসব বাজে কথা শোনবার মত আমার সময় নেই ঠাকুরমা।'

চায়ের কাপ রেখে এনাক্ষী যেন বিরক্ত হয়েই অন্য ঘরে চলে গেল।

করুণা বলল, 'মেয়েটাকে তাড়ালে তো মা।'

শতদলবাসিনী বললেন, 'বেশিদূর যাবে না। এখান থেকে পাশের ঘরে গিয়ে আড়ি পাতবে। সব বুঝি বাপু, সব বুঝি।'

তাঁর বলবার ভঙ্গিতে করুণা আর কমলাক্ষ হেসে উঠল। গম্ভীর স্বভাব অমিয়ভূষণও মৃদু হাসলেন। তিনি বললেন, 'যাই বল মা, প্রভাকরবাবুদের সঙ্গে আমাদের ঢের তফাৎ। ওঁরা আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ করতে রাজী হবেন কেন?'

শতদলবাসিনী বললেন, 'আহা, সম্বন্ধ কি লোক কেবল বাড়ি গাড়ি দেখে করে নাকি? মান-মর্যাদায় তুমি কি কারো চেয়ে কিছু কম? আর তোমার মেয়েও কালো কুচ্ছিৎ, মুখ্যু সুখ্যু নয়। এ সম্বন্ধ তাদের পক্ষেই বা অকরণীয় কিসে? আমি তাদের মনের ভাব জেনেই বলছি।'

কি করে ওপক্ষের মনের ভাব জেনেছেন, সে-কথাও খুলে বললেন শতদলবাসিনী। মৃগাঙ্ক যে এনাক্ষীকে পছন্দ করেছে সে-কথা তাদের বাড়িতে গোপন নেই; এমন কি, চাকর-বাকরদের মধ্যেও একথা আলোচনা চলছে। আর সে আলোচনায় মৃগাঙ্কের মা বিভাবতী বাধা দেননি। হেসে বলেছেন, 'বিধাতার নির্বন্ধ যদি থাকে বিয়ে হবে, তার আর বিচিত্র কি। পালটি ঘর। মেয়েটিও দেখতে শুনতে চমৎকার।' আর সে ইঙ্গিতে শতদলবাসিনীকে তিনি জানিয়েছেন, এনাক্ষীকে পুত্রবধূ করতে তাঁর আপত্তি নেই, বরং আগ্রহই আছে।

করুণা বলল, 'তেমন যদি গরজ থাকে ওঁরা নিজেরাই তো কথাটা পাড়তে পারেন।'

শতদলবাসিনী ধমক দিয়ে উঠলেন, 'তুই কী যে বলিস করুণা। তারা শত

হলেও পাত্রপক্ষ। তারা কি এগিয়ে এসে কথা বলতে পারে? মনের ভাব বুঝে এগোতে হয় আমাদেরই।'

করুণা বলল, 'কেন। কী এমন দায় পড়েছে?'

কল্যাণী একটু হেসে বলবেন, 'সারা জীবন লেখাপড়া নিয়ে রইলে। ঘর-সংসারের ধার তো তোমাকে আর ধারতে হল না ভাই। দায় একটু আছে বইকি। বি এ-ই পাশ করুক আর এম এ-ই পাশ করুক, মেয়ে মেয়েই। সময় মত দেখে শুনে বাপ মার গরজ করে তার বিয়ে দেওয়া ভালো। তা নইলে ঝামেলা ঝক্কি শেষে আরো বাড়ে।'

ইঙ্গিতটা যে কা'র সম্বন্ধে করুণার তা বুঝতে বাকি রইল না। মুহূর্তকাল গম্ভীর হয়ে থেকে বলল, 'তা জানি বউদি। ঝামেলা ঝক্কি বেশি বাড়ুক তা আমিও চাইনে। যা ভালো বুঝবে তাই করবে, এসব ব্যাপারে আমার কথা বলতে যাওয়াটাই অন্যায়।'

কল্যাণী বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কথায় কথায় যদি অমন খুঁত ধর তাহলে তো এক বাড়িতে বাস করাই কঠিন হয়ে পড়ে।'

ঝগড়ার সূত্রপাতে কমলাক্ষ বাধা দিয়ে বলল, 'থামো মা, থামো। তোমরা কি বিনা তর্কে কোন কথা বলতে পার না।'

অমিয়ভূষণ বোনের পক্ষ নিয়ে বললেন, 'করুণা ঠিকই বলেছে। ওদের পক্ষে যদি সম্বন্ধের কথা তোলা সম্ভব না হয়, আমিই বা যেচে তা বলতে যাব কেন?'

শতদলবাসিনী বললেন, 'তোমার কিছু বলতে হবে না বাপু, যা বলবার আমিই বলব। তুমি শুধু আমার কথা শুনে চল তাহলেই হবে।'

অমিয়ভূষণ হেসে বললেন, 'তা না হয় চললাম, কিন্তু টাকা পয়সার প্রশ্নও তো আছে। বাড়ির দরুণ অতগুলি টাকা দেনা রয়েছে। এখন মেয়ে বিয়ে দেওয়ার অবস্থা আমার নয়। কিছুদিন অপেক্ষা করতেই হবে।'

কল্যাণী প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'অপেক্ষা করতে হয় তুমিই করবে। মেয়ের বয়সও অপেক্ষা করবে না, সুপাত্ররাও তোমার মেয়ের জন্য হা পিত্যেশ ক'রে

বসে থাকবে না। বিয়ে দেওয়া তোমার ক্ষমতায় কুলোবে কিনা সে-কথা আলাদা।'

শতদলবাসিনী বললেন, 'আগেই অত তর্ক করছ কেন তোমরা। সম্বন্ধ যদি হয়ই তাহলে কি টাকার জন্যে বিয়ে আটকে থাকবে? কথায় বলে, উকিলের টাকা, ডাক্তারের টাকা আর মেয়ে বিয়ের টাকা ভূতে-যোগায়। টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবেই। এখন তোমাদেব ভাগ্য। প্রজাপতির নির্বন্ধ থাকলে হয়েও যেতে পারে।'

কিন্তু শতদলবাসিনী যাই বলুন, অমিয়ভূষণ কথাটাকে বিশেষ আমল দিলেন না। প্রভাকরবাবুর সঙ্গে তাঁর আর্থিক অবস্থাব ব্যবধান এত বেশি যে, তাঁর সঙ্গে কুটুম্বিতা করার প্রস্তাবটা অমিয়ভূষণেব মোটেই মনঃপূত হল না। শুধু আর্থিক ব্যবধানই নয়, রুচিগত ব্যবধানও আছে। ছেলেবেলা থেকে তিনি লেখাপড়াব চচা করে আসছেন। এখনো তাই নিয়েই আছেন। অন্য কোন বিষয়ের চেয়ে পড়াশুনাব অনুশীলন, বস্তুবাহুল্যবর্জিত অনাড়ম্বর জীবনযাত্রাই তাঁর আদর্শ। ছেলেমেয়েকেও তিনি সেই লক্ষ্যের দিকেই চালিত করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রভাকরবাবুর সঙ্গে আলাপপরিচয় করে অমিয়ভূষণের ধারণা হয়েছে, তাঁর আদর্শ আলাদা। বিদ্যার চেয়ে তিনি অর্থকে বেশি মূল্য-বান মনে করেন। বিষয়-সম্পত্তি আর প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তোলাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য, পৌরুষের একমাত্র সুখ, বেঁচে থাকার একমাত্র আনন্দ। অনেক সময় ছেলে রুচি বুদ্ধি-ব্যক্তিত্বে বাপের চেয়ে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। পছন্দ-অপছন্দে জীবনযাপনের ধরনধারণে ভিন্নতার পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি বাপের চেয়ে স্বভাবে-চরিত্রে সে একেবারে বিপরীতধর্মী হয়। আত্মভোলা শিল্পী সাহিত্যিকের ছেলে বিষয়নিষ্ঠ হয়ে ওঠে, আবার বিষয়ী মানুষের ছেলেকে উদাসীন, ভাবুক প্রকৃতির হতে দেখা যায়। কিন্তু মৃগাঙ্ককে যতটা লক্ষ্য করেছেন, তাতে অমিয়ভূষণের মনে হয়েছে, মৃগাঙ্ক তার বাপের ছাঁচেই তৈরী। অর্থসঞ্চয় আর সম্পত্তি-বৃদ্ধির কাজে সে প্রভাক..র ডান হাত। কেউ কেউ বলে, মৃগাঙ্ক বিষয়বুদ্ধিতে তার বাবার চেয়েও পাকা। বিচক্ষণ, হিসাবী মানুষ।

ভাবী জামাতার যে আদর্শ মনের মধ্যে অমিয়ভূষণের, তাঁর সঙ্গে মৃগাঙ্কের কোনরকম মিল নেই।

এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে অমিয়ভূষণের প্রায়ই কথান্তর চলতে লাগল। কল্যাণী বলেন, 'তোমার ইচ্ছাটা কি, মেয়েকে ফকির বাউলের হাতে দিতে চাও নাকি?'

অমিয়ভূষণ বলেন, 'আমি কি তাই বলি?'

কল্যাণী বলেন, 'মুখে না বললেও তোমার ভাবভঙ্গিতে তাই বোঝা যায়। তোমার ধারণা পৃথিবীতে মানুষ কেবল তোমরাই, যারা ছেলে চরিয়ে খাও। যাঁরা ডাক্তার, উকিল, কি যাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে আছেন, তাঁরা যেন তোমার কাছে মানুষই নন।'

অমিয়ভূষণ বলেন, 'আমি তা বলছিনে। তাঁদের পছন্দ অপছন্দ একটু আলাদা ধরনের। তাঁরা যাকে কাম্য বলে মনে করেন, হয়ত আমি তাকে কাম্য বলে ভাবিনে।'

কল্যাণী চটে ওঠেন, 'দেখ, বাজে কথা বল না। যখন তখন অত সাধুপনা আমার সয় না। তুমি তাঁদের চেয়ে কিসে আলাদা, তাই শুনি? তুমি কি সন্ন্যাসী, গেরুয়াধারী, না কৌপীন আর লোটা-কম্বল সম্বল করে গাছতলায় বসেছ। তোমারও ঘর-সংসার আছে, তাঁদেরও তাই। অর্থ অর্থ করে তাঁরাও যেমন ব্যস্ত, তুমিও তেমনি। টাকা-পয়সা ছাড়া কোন কাজটা হয় বল তো? প্রভাকরবাবু চুণ-সুরকির করবার করেন। আর তুমি তোমার বিদ্যাবুদ্ধিকে চূণ-সুরকির সামিলই বিক্রি কর। রাত জেগে ছেলেদের জন্যে নোট লেখ। আমি তো আর কোন পার্থক্য দেখিনে।'

অমিয়ভূষণ হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারেন না। স্ত্রীর কথাগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করতে থাকেন।

কল্যাণী আবার বলেন, 'যাই বল, প্রভাকরবাবু ইট-কাঠ, চুণ-সুরকির কারবারী বলে তাঁকে তোমার ঘৃণা করবার কোন অধিকার নেই। যে যা পারে, সে তাই করে খায়। আমার বাবা বলেন, চুরি-ডাকাতি আর ভিক্ষা

ছাড়া সব কাজই ভালো কাজ। তুমি যাই ভাব না কেন, আমি আমার মেয়েকে কোন মাস্টার-টাস্টারের হাতে দেব না। তা সে স্কুলের মাস্টারই হোক্, আর কলেজের মাস্টারই হোক্। সারাজীবন আমি যে জ্বালায় জ্বললাম, আমার মেয়েও সেভাবে জ্বলুক, তা আমি চাইনে।'

অমিয়ভূষণ বলেন, 'বেশ তো, শুধু তোমার আমার কথায় তো কিছু হবে না, মেয়ে বড় হয়েছে। লেখাপড়া শিখেছে। ওর নিজের স্বাধীন মতামত আছে। ও কি চায়, তাই শোন।'

কল্যাণী বলেন, 'আমি কি কিছু না জেনেই তোমাকে এত কথা বলছি।'

অমিয়ভূষণ জিজ্ঞাসা করেন, 'ও কি তোমাকে নিজের মুখে কিছু বলেছে?'

কল্যাণী বলেন, 'মুখে আবার কি বলবে। মা হয়ে মেয়ের মনের কথা কিছু বুঝতে পারব না, আমি কি এতই বোকা?'

তারপব কল্যাণী তাঁর অনুমানের কারণটা খুলে বললেন। মৃগাঙ্ক আরো দু'দিন এ বাড়িতে এসেছিল। না, কোন কাজকর্মের উপলক্ষে নয়, এমনিই বেড়াতে পাড়াপড়শীর খোঁজখবর নিতে। কল্যাণী তাকে যত্ন করে ঘরে নিয়ে গিয়ে চা-টা খাইয়েছিলেন। সেই উপলক্ষে এনাক্ষীর সঙ্গে দু'দিনই বহুক্ষণ ধবে আলাপ ক'রে গেছে মৃগাঙ্ক। স্কুলকলেজে পড়লে হবে কি, মেয়ে তো তেমন মিশুকে নয়, লাজুক মুখচোরা ধরনেরই স্বভাব। অচেনা অজানা পুরুষেব সঙ্গে তেমন করে কথা বলতে পারে না। কিন্তু মৃগাঙ্কের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ বসে বসে আলাপ করেছে। কথায় কথায় মুখ নিচু করে হেসেছে। মৃগাঙ্ক গান শুনতে চাইলে একটু ওজর আপত্তি করে শেষ পর্যন্ত গানও গেয়েছে। এতটা দাক্ষিণ্য এনাক্ষীর আর কারো বেলায় দেখা যায়নি।

অমিয়ভূষণ বললেন, 'বল কি, এত কাণ্ড ঘটে গেল আর আমরা কিছু টেরও পেলাম না।'

কল্যাণী বললেন, 'কি করে পাবে। তুমি কতটুকু সময়ই বা বাড়িতে থাক। করুণা আর কমলও সেদিন বাইরে ছিল। অতিথির আদর যত্ন, আলাপ

আপ্যায়ন তোমার মেয়ে একাই করলে। যাই বল, পুনটুরীকে মৃগাঙ্কের খুব পছন্দ হয়েছে।' মুখ টিপে হাসলেন কল্যাণী।

অমিয়ভূষণ একটু গম্ভীরভাবে বললেন, 'সেইটাই তো ভাবনার কথা। বড়লোকের ছেলের অত চট্‌পট্‌ পছন্দ হয়ে যাওয়া কি ভালো?'

কল্যাণী বিবক্ত হযে বললেন, 'তোমাব সব ব্যাপাবেই খুঁতখুঁতি। পছন্দ যখন হয় তখন অমন তাডাতাডিই হয়। আমাকে পছন্দ কবতে তোমাব ক'মিনিট লেগেছিল? ভালো করে চোখ তুলে তো তাকিয়েও দেখনি। আমাদেব দেশে এই বকমই বিধি। বছবেব পব বছব ছেলেমেয়েব মধ্যে কোর্টশিপ্‌ চলবে, আমবা কি তেমন সমাজে বাস কবি। যাই বল, বিয়েব আগে বেশি মিলতে মিশতে দেওয়াটা আমাব তেমন পছন্দও নয়। মেলামেশাব পবিণামটা তো চোখেব সামনেই দেখতে পাচ্ছি।'

কল্যাণী যে করুণাব পরিণামেব কথাটাই ইঙ্গিতে বললেন, অমিয়ভূষণের তা বুঝতে বাকি বইল না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীব হয়ে গেলেন। মেয়েব চেয়ে বোনের ভবিষ্যতেব ভাবনাই তাঁব বেশি। করুণাব সমস্যাই আগে সমাধান কবা দবকার। কিন্তু কি করে কববেন অমিয়ভূষণ? যে জট ওবা পাকিয়ে তুলেছে তা ওরা নিজেবা না খুললে তা খোলাব সাধ্য আব কার আছে।

১৯

অমিয়ভূষণ মণিময়ের এই ব্যবহারে খুবই বিরক্ত হয়েছেন। এমন কোন্ ব্রহ্মা বিষ্ণু হয়েছে সে যে, কয়েক মিনিটের জন্যেও এসে দেখা করতে পারে না? মণিময় ডাকা মাত্র অমিয়ভূষণ সবাইকে নিয়ে তার সভায় গেলেন আর মণিময় একবারের জন্যে আসতে পারল না। এত বড় অশিষ্ট আর অভদ্র হয়েছে মণিময়? নাকি সে ভেবেছে, সে এ বাড়িতে এলে অমিয়ভূষণ জোর করে তাঁর বোনকে মণিময়ের ঘাড়ে গছিয়ে দেবেন? তেমন যদি প্রবৃত্তি থাকত অমিয়ভূষণের, অনেকদিন আগেই তা করতেন। এতকাল অবধি বোনকে আইবুড়ো হয়ে থাকতে দিতেন না। ছোট বড় প্রত্যেকের স্বাধীন ইচ্ছাকে তিনি সম্মান করে চলেন ব'লে তাঁর ইচ্ছাকে কেউ সম্মান করে না। সংসারের নিয়মই এই। যারা জবরদস্ত দুনিয়ায় তাদেরই ভক্ত বেশি। অন্যের কাছ থেকে মান-মর্যাদা তারাই বেশি আদায় করে। করুণাও ব্যাপারটা শুনে রাগ করেছিল। বলেছিল, 'মোটেই ভালো কাজ করনি দাদা। নিজের মান-সম্মান খুইয়ে তাকে ডাকতে যাওয়া তোমার মোটেই উচিত হয়নি। আমাকে আগে জানালে এরকম আমি কিছুতেই ঘটতে দিতাম না।'

অমিয়ভূষণ বলেছিলেন, 'আমার এই শেষ শিক্ষা হয়ে গেল। আর তার সঙ্গে আমি কোন সংস্রব রাখব না। তার কোন কাজকর্মের মধ্যেও আমি আর যাব না, তা সে যতই সৎকাজ হোক না কেন? কিন্তু তুই কেন তার জন্যে জীবনভর অপেক্ষা করবি?'

দাদার এই সরাসরি প্রশ্নে করুণা লজ্জিত হয়ে পড়েছিল। মুখ নিচু করে করে বলেছিল, 'কে বলে আমি তার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

অমিয়ভূষণ রাগ করে বলেছিলেন, 'তাহলে বিয়ে করছিস না কেন? এখনো তো করতে পারিস। পাত্রের কি অভাব আছে নাকি?'

করুণা এবার অমিয়ভূষণের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলেছিল, 'তা একটু

আছে দাদা। পাত্রের অভাব আছে। পুন্টুরী কি কমলের ঘরে ছেলে না হওয়া পর্যন্ত আমার যোগ্য পাত্র জন্মাবে না। এতকালই যখন গেছে আর এই ক'টা দিন আমাকে অপেক্ষা করতে দাও।'

অমিয়ভূষণ বলেছিলেন, 'হতভাগী কোথাকার।'

সত্যি, করুণাকে দেখে তাঁরও শিক্ষা হয়েছে। এনাক্ষীর বেলায় আর বেশি দেরি করা ঠিক হবে না। যোগ্য পাত্র দেখে যত তাড়াতাড়ি পারেন মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবেন অমিয়ভূষণ।

কিন্তু বিয়ে দেওয়ার কর্তৃত্বটা দেখা গেল কল্যাণীই নিজের হাতে নিয়েছেন। তিনি আর শতদলবাসিনী। শাশুড়ী-বউতে নানা বিষয় নিয়েই মনান্তর মতান্তর আছে। কিন্তু এনাক্ষীর বিয়ে সম্বন্ধে দু'জনেরই খুব মতের মিল হল। প্রভাকরের ছেলে মৃগাঙ্ক যে যোগ্যতম পাত্র সে সম্বন্ধে কারোরই কোন সন্দেহ রইল না। এই নিয়ে আলাপ-আলোচনা এবং আনাগোনা চলতে লাগল। মৃগাঙ্কের মাও এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন এবং স্ত্রীর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর প্রভাকরবাবুও এতে আর বাধা দিলেন না। কারণ বিয়ের কথায় মৃগাঙ্ক এতদিন কানই পাতেনি, এবার যখন নিজের মুখে এনাক্ষীকে তার পছন্দ হওয়ার কথা জানিয়েছে তখন আর অন্য কিছু বিবেচনা করা উচিত নয়। নিজেদের অবস্থার তুলনায় একটু গরীবের ঘরের মেয়ে আনাই ভালো। সে মেয়ে দেমাক দেখাতে ভয় পায়। শ্বশুর শাশুড়ীর বাধ্য হয়ে চলে। স্বামীকে বোঝালেন বিভাবতী। প্রভাকরবাবু খানিকক্ষণ মনে মনে কি হিসাব ক'রে বললেন, 'বেশ, তোমরা যা ভালো বোঝ তাই কর।'

শতদলবাসিনী ওবাড়ি থেকে আরো সুসংবাদ বয়ে নিয়ে এলেন। পাত্র-পক্ষের কোন দাবি দাওয়া নেই। বরপণ ওঁরা চান না। যৌতুকের ভারও অমিয়ভূষণের সাধ্যের ওপরই তাঁরা ছেড়ে দিতে রাজী আছেন।

কল্যাণী স্বামীকে বললেন, 'দেখ, কি উদার মন। প্রভাকরবাবু যদি সত্যিই অতিরিক্ত বিষয়ী আর অর্থলোভী হতেন তাহ'লে কি এমন কথা বলতে পারতেন। নিজে অত বড়লোক, তারপর ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করা ছেলে

ইচ্ছা করলে দশ হাজার টাকা পণ নিতে পারতেন উনি। জানো তো, টাকায় টাকা আনে।'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'কিন্তু পণ না নিলেও অন্য খরচ তো আছে। শুধু হাতে তো আর মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায় না।'

কল্যাণী বললেন, 'সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার মা বাবা এখনো বেঁচে আছেন সে কথা ভুলে যেয়ো না। দরকার হলে একটি কেন, অমন পাঁচটি বিয়েও আমার বাবা দিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু টাকা তো আমি তাঁর কাছ থেকে দান হিসেবে নেব না, ধার হিসেবেই নেব। বাবার সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেছে আমার। তিনিও বলেছেন, এত ভালো সম্বন্ধ কিছুতেই হাতছাড়া করা উচিত না। অতকাল ধরে ওকালতি করেছেন, বুদ্ধি শুদ্ধি তোমার চেয়ে কম রাখেন বলে ভেব না। মানুষকেও তিনি তোমার চেয়ে ভালোই চেনেন। প্রভাকরবাবু যে একজন গণ্যমান্য লোক সে খোঁজখবর তিনিও নিয়েছেন।'

তবু মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল অমিয়ভূষণের। প্রভাকরবাবুর সম্বন্ধে তিনি যতটা শুনেছেন তা খুব প্রীতিকর নয়। কলোনীর বাসিন্দাদের কাছে জনপ্রিয় হতে পারেননি প্রভাকরবাবু। তিনি তাঁদের কাছে কম দামী জমি বেশি টাকায় বিক্রি করেছেন। বাড়ি তৈরী করবার কনট্রাক্ট নিয়ে ঠকিয়েছেন। বাসিন্দাদের পাকা নর্দমা, রাস্তা আব বৈদ্যুতিক আলোর সুযোগ সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও কথা রাখেননি। কলোনীর অনেক অভিযোগ প্রভাকর দত্তগুপ্তের বিরুদ্ধে।

কল্যাণী বললেন, 'তাতে তোমার কি ? সে সব বোঝাপড়া ওঁর কলোনীর লোকদের সঙ্গে হবে। নর্দমা আর ইলেকট্রিসিটির সঙ্গে কুটুম্বিতার কি সম্পর্ক। কলোনীর লোকজনদের সঙ্গে তাঁর যদি বনিবনাও একটু কমও হয়, ছেলের বউ হিসাবে তিনি কি তোমার মেয়েকে কম ভালোবাসবেন, নাকি তোমাকেই আদর যত্ন কম করবেন ? পাবলিশারদের সঙ্গে তোমার দরকষাকষি হয় না ? তাই বলে মানুষ কি তুমি খারাপ নাকি ?'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'কিন্তু মৃগাঙ্কের স্বভাবচরিত্র নিয়েও কেউ কেউ নানারকম কথা বলে।'

কল্যাণী প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'যত সব বাজে কথা। একেই বলে শত্রুতা। আইবুড়ো ছেলেমেয়ের নামে কুৎসা রটানোর মত পাপ আর কিছু নেই। বিয়েতে ভাংচি দেওয়ার মত একদল কুচক্রী লোক চিরকাল ধরেই আছে। আমি নিজে মৃগাঙ্কের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দেখেছি। অমন ভালো ছেলে আর দেখিনি। দেমাক নেই, অহঙ্কার নেই। যেমন মিষ্টি স্বভাব, তেমনি মিষ্টি কথা-বার্তা। এমন ছেলের যারা নিন্দা করে তারা আসলে বিশ্বনিন্দুক।'

তবু দ্বিধা ঘুচতে চায় না অমিয়ভূষণের। কমলাক্ষ এ বিষয়ে নির্লিপ্ত, নিরপেক্ষ। তার সঙ্গে আলাপ করে লাভ নেই। বোনকে ডেকে অমিয়ভূষণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'করুণা, তোব কি মত। এখন কি এই বিয়ে টিয়ের মধ্যে যাওয়া উচিত?'

করুণা বলল, 'টাকার জন্যে ভেব না দাদা। হাজার পাঁচেক টাকা তো আমার একাউন্টেও আছে। পুনটুরীর বিয়েতে তাই খরচ কর। আর যে যাই ভাবুক, তুমি তো আমাকে আর পর ভাব না।'

অমিয়ভূষণ মাথা নেড়ে বললেন, 'টাকার কথা নয়। এ সম্বন্ধ করা ঠিক হবে কিনা। তাই তোর কাছে জানতে চাইছি।'

মতামতটা স্পষ্ট কবে জানাতে করুণা একটু ইতস্তত করল। ইতিমধ্যে কথাবার্তা অনেকদুর এগিয়ে গেছে। বিযেব আড়ম্বর অনুষ্ঠান কিরকম হবে তা নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলছে রোজ। জিনিসপত্র কেনার জন্যে কল্যাণী তাঁর বাবার কাছ থেকে কিছু টাকাও নিয়ে এসেছেন। গয়নার প্যাটার্ন বাছাই করা চলছে। ৪—ব

করুণা ঠিক সরাসরি জবাব দিল না। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'দাদা, সবাই তো দেখে শুনে জেনে শুনেই এ সম্বন্ধ চাইছেন। আর পুনটুরীও তো ছোট্ট নয়। তারও যথেষ্ট বয়স হয়েছে, বুদ্ধিবিবেচনা হয়েছে। মতামতটা তার কাছেই তুমি জিজ্ঞেস কর।'

বেশ বোঝা গেল, করুণার আপত্তি আছে। কিন্তু সেকথা সে স্পষ্ট করে বলে না কেন? আপত্তির কারণই বা খোলাখুলিভাবে আলোচনা করে না কেন। বোনের ব্যবহারে অমিয়ভূষণ খুশি হ'তে পারলেন না। একটু রুষ্টভাবে বললেব, 'বেশ তাই করব'। পুনট্বীকেই জিজ্ঞেস করব।'

প্রভাকরবাবুকে পাকা কথা দেওয়াব আগে নিজেব মেয়েব সঙ্গেই বিষয়টা নিয়ে ভালো কবে আলোচনা করবেন বলে ঠিক করলেন অমিয়ভূষণ। এ বিয়েতে এনাক্ষীব সম্মতি যে আছে তা তে কোন সন্দেহ নেই। কেন আছে সে কথাটা জেনে নেবেন।

২০

করুণা আর এনাক্ষী একই ঘরে শোয়। দু' দিকের দুই দেয়াল ঘেঁষে দু'খানি তক্তপোষ পাতা। মাথার কাছে টেবিল ল্যাম্প জেলে করুণা অনেক রাত অবধি পড়াশুনা করে। এনাক্ষী বেশি রাত জাগতে পারে না, বইয়ের দু' একখানা পাতা ওল্টাতে না ওল্টাতেই তার চোখ বুজে আসে। কিন্তু আজ এনাক্ষীর ঘুম আসছিল না। একটু আগে বইপড়া বন্ধ ক'রে করুণা তার সঙ্গে যে আলাপ করেছে সেই সম্বন্ধেই এনাক্ষী নিজের মনে ভেবে দেখছিল। অমিয়ভূষণের সঙ্গে করুণার যে কথাবার্তা হয়েছে সে কথা সে এনাক্ষীকে জানিয়ে দিয়েছে। এনাক্ষী যাতে ভেবে দেখবার সময় পায় যাতে বুঝে শুনে জবাব দিতে পারে করুণা তাই চায়।

এনাক্ষী হেসে বলল, Question out করে দিলেই হবে না পিসীমা, জবাবটাও শিখিয়ে দাও। বসে বসে মুখস্থ করি।'

করুণা বলল, 'তুমি তো নোট মুখস্থ করা মেয়ে নও পুনটুরী। নিজের জবাব তুমি নিজেই দিতে পারবে। ভুল হোক শুদ্ধ হোক নিজের জীবনের সমস্যা নিজে মেটাবার চেষ্টা করা ভালো।'

এনাক্ষী বলল, 'সে কি পিসীমা, আমার চার অভিভাবকের মধ্যে তুমিও তো একজন। আমার জীবন তো আমার একার নয় তোমাদের সকলেরই।'

করুণা বলল, 'তাতো ঠিকই তুমি আমাদের সবাইর আদরের। তবু এম-এ পড়বার সময় তুমি যেমন নিজের বিষয় নিজে বেছে নিয়েছিলে বর বাছাই করবার ভারও তেমনি তোমার নিজেরই নেওয়া উচিত। বিশেষ করে আমাকে এসব কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা। আমাকে তো দেখতেই পাচ্ছ। এসব ব্যাপারে আমার পরামর্শ কারো কোন কাজে লাগবে না। নিজে যদি মন স্থির করতে না পার, দাদা বউদি যা বলেন তাই কর।'

এরপর আর কথা এগোয় নি। এনাক্ষী মশারী ফেলে দিয়ে পাশ ফিরে

শুয়েছে। পিসীমার এই নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যকে মাঝে মাঝে নিষ্ঠুরতা বলে মনে হয় এনাক্ষীর। সংসারে থেকেও যেন পাঁচজনের মধ্যে নেই পিসীমা। এক কোণে নিজের মন নিয়ে পড়ে আছে। কে জানে বিয়ে না করার এই পরিণতি কিনা। বুড়ো বয়স অবধি আইবুড়ো থাকলে মানুষ বোধহয় এমনি আত্মসর্বস্ব হয়—এনাক্ষী ভাবে। মেয়েরা আরো বেশি। নিজের স্বামী ছেলেমেয়ে না থাকলে হাত পা নাক চোখ আর নিজের মন ছাড়া কাউকে আপন ভাবা যায়! পিসীমাকে দেখে এই কথাই মনে হয় এনাক্ষীর। না, এরকম শুধু নিজেকে নিয়ে সংসার গড়বার কথা, এমন একক শূন্যতার মধ্যে সারাজীবন কাটাবার কথা এনাক্ষী ভাবতেও পারে না। এর চেয়ে বিয়ে করা ভালো। এমন কি ভালো না বেসেও বিয়ে করা ভালো। কি হবে? বড় জোর বনিবনাও হবে না, ঝগড়াঝাঁটি হবে, যেমন বাবা মার মধ্যে হচ্ছে। তারচেয়ে আর বেশি কি হতে পারে? শুধু পিসীমা নয়, বান্ধবী তপতী ব্যানার্জীর কথাও মনে পড়ল এনাক্ষীর। সেও বিয়ে না ক'রে ভালো করেনি! কাজকর্ম চাকরি বাকরি সবই করছে কিন্তু তবু তার শূন্যতা যাচ্ছে না, শুষ্কতা দূর হচ্ছে না। তপতীর সঙ্গে দু' মিনিট আলাপ করলেই বোঝা যায় সে একটি মূর্তিমতী সিনিক। পৃথিবীর সব কিছুর মধ্যেই সে খুঁত দেখে। আসলে ও.তার নিজেরই খুঁত-খুঁতি। এতে তপতী কি নিজেই শান্তি পায়? পায় যে না তা তার মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। কিসের একটা জ্বালায় যেন তপতী সব সময় জ্বলছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, সে যেন কোথাও দাঁড়াবার মত, অবলম্বন করবার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। সব সময় একটা শূন্যতা নিয়ে দিন কাটছে তার। কিছুদিন আগেও এই কথা জানিয়ে তাকে চিঠি লিখেছে তপতী। তার চিঠিখানা আব একবার খুলে পড়ল এনাক্ষী। তপতী লিখেছে যতদিন ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম ভালোই ছিলাম এনাক্ষী। পরীক্ষা ছাড়া আর কোন ভয় ছিল না। এখন বেরিয়ে এসে কি ফ্যাসাদেই না পড়েছি। কিছু যেন ধরবার মত খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ সবই করি। চাকরি করি, বাপ মা ভাই-বোনদের নিয়ে মিলে মিশে থাকি, কফি হাউসে গিয়ে আড্ডা দেই কিন্তু সব

যেন গোঁজামিলের ব্যাপার। শূন্যতা ভরাট করবার তাগিদ। নিজের ইচ্ছায়, নিজের আনন্দে কিছু যেন করবার মত নেই। তুই কি বলবি জানি। তুই বলবি, ফের কারো প্রেমে পড়, না হয় চোখ বুজে কাউকে বিয়ে করে ফেল। কিন্তু তুইতো জানিস এনা, ওভাবে গায়ে পড়বার মত করে প্রেমে পড়া যায় না। ওটা দু'পক্ষের ব্যাপার একপক্ষের নয়। প্রেম জীবনে এলো তো ভালো, না এলে মাথা খুঁড়েও তাকে আনা যাবে না। আমি প্রেমাস্পদের অভাবের কথা বলছিনে, প্রেমের অভাবের কথাই বলছি। যে সব ছেলে কাছে ঘেঁষে তাদের খুঁত ছাড়া আমি কিছু দেখতে পাইনে। দেখলেই হাসি পায়। অথচ একথা ভালো করেই জানি এত যদি হাসি গোটা জীবনটাই পরিহাস হয়ে দাঁড়াবে। তবু তো না হেসে পারিনে, পারিনে কাউকে পুরোপুরি পছন্দ করতে, ভালোবাসা তো দূরের কথা। আর চোখ বুজে বিয়ে করার কথা বলছিস। চেয়ে চলবার এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, ঘুমের মধ্যেও চোখ বুজতে পারিনে। আমার তো, মনে হয় খরগোসের মত আমিও চোখ চেয়েই ঘুমোই এনাক্ষী। যারা পাণিপ্রার্থী হয়ে আসে তাদের হাতে জীবন তো ভালো একটা চুলের কাঁটাও সঁপে দিতে ভরসা হয় না। মনে হয় সব বোকা, আর উজবুক। কেউ নির্ভরযোগ্য নয়। আমি জানি এটা স্বাভাবিক অবস্থা নয়। এ একরকমের বিকৃতি কিংবা কমপ্লেক্স। আমি আমার রোগ চিনি। কিন্তু চেনা আর চিকিৎসা তো এক ব্যাপার নয়। তোকে সাবধান করে দিই এনাক্ষী, খবরদার তুই যেন আমার পথ ধরিসনে। তাহলে আমার মত তোরও দুর্গতির শেষ থাকবে না। তার চেয়ে আশীর্বাদ করি তোর সুমতি হোক। 'ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে।' এ ছাড়া শূন্যতা আর অস্বস্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার অন্য কোন উপায় নেই। একথা ঠিক জানবি কিছু না করার চেয়ে ভুল করাও ভালো।'

এনাক্ষী বেশ বুঝতে পারছে করুণা পিসী নির্লিপ্ত আর নিরপেক্ষ থেকে এ বিয়েতে তার অমত জানাচ্ছে। আর এক ভুক্তভোগী তপতী। সে এনাক্ষীকে বিয়ে করতে প্রেরণা দিচ্ছে। প্ররোচনাও বলা যায়।

মাঝামাঝি কোন পথ নেই। এর কোন একটি এনাক্ষীকে বেছে নিতে হবে। হয় গ্রহণ না হয় বর্জন। এবার মৃগাঙ্কের কথাটা ভেবে দেখতে চেষ্টা করল এনাক্ষী। মৃগাঙ্ক যে তাকে পছন্দ করেছে একথা জানতে তার বাকি নেই। প্রথম দৃষ্টিতে ভালোবাসা হয় না। কিন্তু পছন্দ অপছন্দটা দু'চারদিনের আলাপেই বোঝা যায়। মৃগাঙ্কের হাসির ভঙ্গিতে, তাকাবার ভঙ্গিতে, আর কথা বলবার ধরনে এই পছন্দের কথা সে গোপন রাখেনি। এর মধ্যে দু'তিন-বার একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব করেছে। এনাক্ষী অবশ্য রাজী হয়নি। কোন-না-কোন অজুহাতে পাশ কাটিয়ে গেছে। এ কি তার স্বাভাবিক সঙ্কোচ, না কি নিজেকে দুর্লভ করবার সহজাত প্রবণতা। যাই হোক, মৃগাঙ্ক তাতে থেমে যায়নি বরং এনাক্ষীর কাছে আসবার জন্যে তার আগ্রহ এতে আরো বেড়ে গেছে। বেশ লাগে এই লুকোচুরি খেলা, ধরা দিতে দিতে ধরা না দেওয়া, কিংবা ধরা না দিতে দিতে হঠাৎ একদিন ধরা পড়ে যাওয়া। এনাক্ষী ভেবেছিল এই পালাটা দীর্ঘ হবে। কিন্তু তার মা আর ঠাকুমার গরজ বেশি। তাঁরা বিয়ে ছাড়া আর কিছু বোঝেন না। মৃগাঙ্কই বা কিরকম। সেই বা এত অল্প পরিচয়ে বিয়েতে রাজি হয়ে গেল কেন। সে কি এরই মধ্যে ক্লান্ত হয়ে হার স্বীকার করে ফেলল। সে বোধ হয় ধরে নিয়েছে পুরোহিতের সাহায্য ছাড়া এনাক্ষীকে সে কিছুতেই ধরতে পারবে না। কিন্তু হার যদি মেনে থাকে তা সে এনাক্ষীর কাছে স্বীকার করছে না কেন? লজ্জা পাচ্ছে? তাই সুবোধ বালকের মত আড়ালে বাপ মার কাছে গিয়ে লুকিয়েছে? এনাক্ষী যদি অরাজী হয়? যদি স্পষ্ট না করে বলে? যদি বলে মৃগাঙ্ককে সে পছন্দ করে না? এ বিয়ে অবশ্য এনাক্ষী এক কথায় ভেঙে দিতে পারে। সে ক্ষমতা তার আছে। কিন্তু যা সহজে করা যায়, সে কাজ করতে এনাক্ষীর মন সায় দেয় না। তার চেয়ে কঠিন কিছু করা দরকার। কিন্তু বিয়ে করাটা কি আরো সহজ, শুধু হুঁ করলেই হল। আর যা করবাব বাবা মা করবেন। না, ভাঙার চেয়ে গড়াটা কঠিন। সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়াটা শক্ত কাজ। তাতে সাহসের দরকার বেশি। এই বড়লোকের

ছেলে মৃগাঙ্ক কেমন লোক তা এনাক্ষী ভালো করে জানে না। তার সঙ্গে বনিবনাও হবে কিনা, রুচির মিল, মনের মিল হবে কিনা তাও অনিশ্চিত। তবু যে এনাক্ষী ঝাঁপিয়ে পড়ছে এতে সে নিজেকে সাহসীই বলবে। সে যদি চৌদ্দ পনের বছরের মেয়ে হত তাহলে বিয়েতে রাজি হওয়া তার পক্ষে কঠিন ছিল না। কিন্তু এখন কঠিন, রীতিমত কঠিন। কিন্তু কঠিন বলে সে পিসীমার মত এক পাশে সরে থাকতে চায় না, এগিয়ে যেতে চায় না, বরং ঝুঁকি নিতে চায়। এতদিন পুরোপুরি তৈরি হয়ে ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাগুলি দিয়েছে এনাক্ষী। কিন্তু এবার তৈরী না হয়েই পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে। দেখা যাক, এতেই বা কেমন নম্বর ওঠে। কিন্তু এবার এনাক্ষী শুধু পরীক্ষার্থিণী নয়, সেই সঙ্গে পরীক্ষক। সেও মৃগাঙ্কের পবীক্ষা নিতে পারবে, আব একটি মানুষকে একেবারে সবদিক থেকে যাচাই কবে দেখতে পারবে। স্ত্রী না হয়ে যা কেউ করতে পারে না।

আজ আর করুণা পিসীর পড়ায় মন নেই। আলো নিবিয়ে দিয়ে সে এবই মধ্যে শুয়ে পড়েছে। নিস্তব্ধ অন্ধকাব ঘবে নিজের মনের সঙ্গে কথা বলতে লাগল এনাক্ষী। তার চিন্তাব এই বা কোন্ ধারা। বিয়েটাকে কেন অমন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উল্টোদিক থেকে দেখছে এনাক্ষী! কেন সহজ স্বাভাবিকভাবে দেখতে পারছে না যা আরো পাঁচজনে দেখে। মৃগাঙ্ক সুদর্শন, বিদ্বান, বিত্ত সম্পত্তি আছে, কথা বলতে জানে, হাসিপরিহাস ভালোবাসে। মা ঠিকই বলে, এমন ছেলে সহজে মেলে না। সবচেয়ে বড কথা এনাক্ষী তার অনুরাগের পরিচয় পেয়েছে। অনুরাগই হোক, আকর্ষণই হোক, কিছু একটা আছে। তাকে অবলম্বন করে এনাক্ষী স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যেতে পাবে। কতজনের যে এটুকু পরিচয়ও থাকে না। একেবারেই অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে তাদের এগোতে হয়।

মৃগাঙ্ক নির্দোষ নয়, নিখুঁত নয়। একটু গায়ে-পড়া ভাব তার আছে। কিন্তু ওটা বোধ হয় পুরুষের স্বভাব। তাদের লজ্জা সঙ্কোচ একটু কম। মৃগাঙ্ককে নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ, উদাসীন পুরুষ হিসাবে দেখলেই কি এনাক্ষী খুশী হত?

বরং নিজের লুব্ধতা আর আগ্রহে সে কিছু পরিমাণে এনাক্ষীর মর্যাদা বাড়িয়েছে।

মৃগাঙ্কের আরো একটা দিক এনাক্ষীর তেমন পছন্দ হয়নি। বিষয় সম্পত্তি সম্বন্ধে মৃগাঙ্ক বড় সচেতন। নিজের কাজ সে গুছিয়ে করতে ভালোবাসে, মনে হয় মৃগাঙ্ক কাজের লোক। শিল্প সাহিত্য চর্চার চেয়ে বিষয়কর্মটাকে সে পছন্দ করে বেশি। তার স্বভাবের এই দিকটা সমালোচনা করায় এনাক্ষীর মা বলেছেন, 'পুরুষের কাজই তো তাই। সে বিষয়আশয় দেখবে। শক্ত শক্ত কাজ করবে। তা নয়তো সবাই কি তোর দাদার মত হবে? কেবল গান গেয়ে আর হাওয়া খেয়ে বেড়াবে?'

তা ঠিক। দাদাকে যত ভালোইবাসুক এনাক্ষী, তার স্বামীও ঠিক তার মত হোক, এমনকি এনাক্ষীর বাবার মত শুধু পুঁথিপত্র নিয়ে থাকুক তা সে চায় না। পৌরুষের সঙ্গে কোথায় যেন বৈষয়িকতার সম্বন্ধ আছে। যা কিছুটা রূঢ়, স্থূল কাঠখোট্টা শক্ত রকমের বস্তু পুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক যেন তারই সঙ্গে। কর্মক্ষেত্র থেকে পুরুষ গলদঘর্ম হয়ে আসছে—সেই স্বেদবিন্দুর মধ্যেই তার রূপ। তার চারদিক জুড়ে কিছুটা হৈ-চৈ থাকবে, কোলাহল উঠবে তাতে সব সময় সুর থাকবে সঙ্গতি থাকবে তার কোন মানে নেই। জয়ধ্বনি তো কোকিলের ডাকে নয় মানুষের হাজার রকমের গলায়। এদিক থেকে মার রুচির সঙ্গে এনাক্ষীর মিল আছে। বাবা আর দাদার কোমল নমনীয় স্বভাবের জন্যে তাঁদের এনাক্ষী অবশ্যই ভালোবাসে। সে ভালোবাসার মধ্যে খানিকটা যেন স্নেহের মিশ্রণ আছে। কিন্তু ভাবী স্বামীকে এনাক্ষী স্নেহ করতে চায় না। সে হবে শক্ত জবরদস্ত বিপরীত স্বভাবের মানুষ। প্রতিপক্ষ হয়ে যার সঙ্গে লড়াই করে সুখ আছে। মৃগাঙ্কের রূপ নয়, বিত্ত সম্পত্তি নয়, তার এই স্বভাবগত স্থূলতাই এনাক্ষীকে আকর্ষণ করেছে। একথা অবশ্য স্বীকার করতে তার রুচিতে বাধে। কিন্তু মৃগাঙ্ক যে এনাক্ষীর বাবা আর দাদার মত নয়, সে যে অন্য ছাঁচের, অন্য ধাঁচের মানুষ এই বৈচিত্র্য আর বিভিন্নতাই এনাক্ষীকে ভিতরে ভিতরে উল্লসিত করেছে। মৃগাঙ্কের মধ্যে আছে

যেন এক অজ্ঞাত অপরিচিত দেশ আবিষ্কারের আনন্দ। সে দেশের জলবায়ু তার পক্ষে হয়ত সম্পূর্ণ উপযোগী হবে না, কিন্তু নতুন আর বৈচিত্র্যপূর্ণ হবে।

অমিয়ভূষণ পরদিন এনাক্ষীকে সত্যিই তাঁর লাইব্রেরী ঘরে ডেকে পাঠালেন। এনাক্ষী তাঁর টেবিলের সামনে এসে মাথা নিচু ক'রে দাঁড়াল।

'আমাকে ডেকেছ বাবা?'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'হ্যাঁ। কি জন্যে ডেকেছি তাও বোধ হয় তুমি জানো।'

কোন গুরুতর বিষয়ের আলোচনার সময় অমিয়ভূষণ ছেলেমেয়েকে তুমি বলেন।

এনাক্ষী ঘাড় কাত ক'রে বলল, 'জানি।'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'আগেকার দিনে বিয়ের ব্যাপারে বাবা মা মেয়ের মতামত জানবার দরকার বোধ করতেন না। তখন অল্পবয়সেই বিয়ে-থা হত। আমার বাবা আমার মতামত জিজ্ঞাসা করেননি। নিজে সব ব্যবস্থা পাকাপাকি করে তারপর ডিটো দিতে ডেকেছিলেন। কিন্তু আমি তা করতে চাইনে। এই বিয়ে সম্বন্ধে আমি তোমার মত স্পষ্ট করে জানতে চাই।'

সাহিত্য রাজনীতি, শিক্ষা সংস্কৃতি নানা বিষয় নিয়ে বাবার সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনা করেছে, তর্ক করেছে এনাক্ষী, কিন্তু নিজের বিয়ের সম্বন্ধে মনে মনে যতই ভাবুক, যতই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করুক বাবার সামনে মুখ ফুটে কিছু বলতে তার কেমন একটু সঙ্কোচবোধ হল। পুরোন আমলের অল্পবয়সী একান্ত বাধ্য মেয়ের মতই বলল, 'আমি কি বলব। তুমি যা ভালো বোঝো তাই কর বাবা।'

মেয়ের এই আনুগত্যে অমিয়ভূষণ মনে মনে খুশী হলেন। মৃদু হেসে বললেন, 'না, এ তো শুধু আমার বোঝা-বুঝির ব্যাপার নয় মা। তোমার

নিজেরও বুঝে দেখতে হবে। তুমি বরং তোমার দাদার সঙ্গেও পরামর্শ করতে পার। সে তো একই সঙ্গে তোমার ভাই আর বন্ধু। সে কোথায়? তাকে তো ক'দিন ধরে দেখতেই পাচ্ছিনে।'

এনাক্ষী বলল, 'দাদা তার কলেজ নিয়ে ব্যস্ত আছে।' অমিয়ভূষণ বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কলেজ! কলেজে পড়াবার মত বিদ্যা তার হয়েছে নাকি?'

'পড়াবার কলেজ না বাবা।' মৃদু হাসল এনাক্ষী। তারপর বাবাকে বিষয়টা সব খুলে বলল।

কমল অবশ্য গোপন করতেই বলেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা এমন কিছু গোপনীয় বলে মনে হল না এনাক্ষীর। কমলাক্ষ তার বন্ধুদের নিয়ে টালিগঞ্জ অঞ্চলে একটি গানের কলেজ খুলবার জন্যে উদ্যোগ আয়োজন করছে। তাতে গান, নাচ, সেতার, এস্রাজ, গীটার সব কিছুই শেখাবার ব্যবস্থা থাকবে। তার আশা কলেজটাকে যদি দাঁড় করাতে পারে, তার আর অন্য চাকরি করতে হবে না। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রদের না শেখালেও চলবে।

অমিয়ভূষণ বললেন, 'কলেজ না ছাই হবে। মাঝখান থেকে চাকরিটা যাবে। অত কামাই করলে কি চাকরি-বাকরি কিছু থাকে?'

ছেলে সম্বন্ধে বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন অমিয়ভূষণ। এতখানি বয়স হল কিন্তু অর্থ উপার্জনের কোন ক্ষমতা হল না। যা রোজগার করে তাতে একজন ভদ্রলোকের ছেলের কি চলে? অমিয়ভূষণ চোখ বুজলে কি উপায় হবে সংসারের? শিল্পের দোহাই দিয়ে কি জীবনের কাছ থেকে সে রেহাই পাবে? আরো একটা ব্যাপারে ছেলের ওপর অপ্রসন্ন হয়েছেন অমিয়ভূষণ। বোনের বিয়ে সম্বন্ধে কমলের এই ঔদাসীন্য, তার এই সহযোগিতার অভাব তাঁকে দুঃখিত করেছে। অর্থসাহায্য সে তো করতে পারবেই না, বাপের পাশে দাঁড়িয়ে সে যে এ বিষয়ে দু'দণ্ড আলোচনা পরামর্শ করবে সেটুকু সময়ও তার নেই। এ নিয়ে তার মা একটু গঞ্জনা দেওয়ায় কমলাক্ষ নাকি কৌতুকের ভঙ্গিতে বলেছে, 'বিয়েটা পুনটুরীর, বর বাছাই করবার ভার তার নিজের।

বাকি থাকে টাকার ভাবনা। তাতো বাবাই ভাবছেন। এর মধ্যে আমি থেকে কি করবো।'

কল্যাণী বলেছেন, 'হতভাগা ছেলে। তোর কি কিছুই করবার নেই?'

কমলাক্ষ বলেছে, 'নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণের ভারটা আমার ওপর দিতে পার।'

কল্যাণী রাগ ক'রে বলেছেন, 'তুমি তাও পার না। তোমার মত অপদার্থকে দিয়ে তাও হবার জো নেই বাপু।'

কমলাক্ষ রাগ করেনি, হেসে বলেছে, 'তা হ'লে তো তুমি সব জানোই মা। তাইতো ভাবি, মা হয়ে ছেলেকে চিনতে পারছ না। কী তাজ্জব ব্যাপার।'

স্ত্রীর কাছ থেকে সব খবরই পেয়েছেন অমিয়ভূষণ। কিন্তু কমলের মা ব্যাপারটা যেমন হেসে উড়িয়ে দিতে পেরেছেন তিনি তা পারেন নি।

এনাক্ষী খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'আমি তাহলে যাই বাবা।'

'কিন্তু যা জিজ্ঞাসা করলাম তার জবাব তো দিলে না।'

এনাক্ষী বলল, 'দিলামই তো। তুমি যা ভালো বুঝবে তাই করবে।'

কল্যাণী দোরের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, এবার ঘরের ভিতরে ঢুকে বললেন, 'আঃ কেন মেয়েটাকে বারবার বিরক্ত করছ? তুমি কি ন্যাকা? তুমি কি কিছুই বুঝতে পারছ না?'

অমিয়ভূষণ আস্তে আস্তে বললেন, 'পারছি বেশ, তুমি যা ভালো বুঝবে তাই করবো।'

২১

মৃগাঙ্ক যে এত সহজে বিয়েতে রাজী হয়ে যাবে, প্রভাকর আর তাঁর স্ত্রী সেকথা ভাবতে পারেন নি। এর আগে বড় বড় ঘর থেকে যেসব সম্বন্ধ এসেছে, মৃগাঙ্ক এক কথায় তা নাকচ করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কথাবার্তা খানিক-দূর এগোবার পর বলেছে মেয়ে পছন্দ হয় নি। কখনো বা বলেছে বিয়ে করবার তার ইচ্ছা নেই। অন্তত আপাতত নয়। কিন্তু এনাক্ষীর বেলায় মৃগাঙ্ক তেমন জোর আপত্তি করল না। দেখে তার বাবা-মা খুশীই হলেন।

মেয়ের বাবা অমিয়ভূষণের মত ছেলের বাবা প্রভাকরেরও খুঁতখুঁতি কম ছিল না। তাঁর ইচ্ছা ছিল বৈবাহিক হবেন তাঁর সমপর্যায়ের, বিত্ত-প্রতিপত্তিতে সমকক্ষ, সমশ্রেণীর। যাতে আরো দশজন বন্ধু কি আত্মীয়স্বজনের কাছে মুখ উঁচু করে কুটুম্বিতার কথাটা বলতে পারেন। কিন্তু স্ত্রীর পীড়াপীড়ির জন্যে সে সাধ পূর্ণ হল না।

বিভাবতী বললেন, 'দেখ, বেশি আশা করতে যেয়ো না। বিয়ের কথায় ছেলে তো আগে মাথাই পাতত না। এখন যে পেতেছে তাকেই ভাগ্য বলে মেনো। গরীব হোক, যাই হোক এনাক্ষী তবু আমাদের স্বজাতির ভদ্রঘরের মেয়ে। দেখতে সুন্দরী, এম-এ পাশ। ছেলের বউ হিসেবে তোমার ঘরে মোটেই বেমানান হবে না। আ·ীয় বল, বন্ধু বল সবাই তোমার বউই দেখতে আসবে, বেয়াই দেখতে আসবে না।'

প্রভাকর হেসে বললেন, 'বেয়াই দেখব.র জন্যে তো তুমিই আছ। আমার তো মনে হয়, বেয়াই দেখেই তুমি ওখানে ছেলের বিয়ে দিতে এমন উঠে-পড়ে লেগেছ। হাজার হোক আমার চেয়ে অমিয়বাবুর বয়স কম, রঙটা ফর্সা, এখনও বেশ শক্তসমর্থ আছেন।'

বিভাবতী লজ্জিত হয়ে বাধা দিয়ে বললেন 'কি যা তা বলছ! কেউ শুনে-টুনে ফেলবে। আমি যেমন বেয়াই পাব, তোমারও তো একখানা বেয়ান হবে।'

প্রভাকর বললেন, 'ওরে বাবা। তিনি তো একখানা গন্ধমাদন পর্বত।'

বিভাবতী এবার পাল্টা খোঁচা দিলেন, 'তাই বল। সেই পর্বতের ভয়েই তুমি এভাবে পিছিয়ে আসতে চাইছ। কিন্তু এত ভয়ই বা কিসের। আজ কালকার দিনে হনুমানদের গাড়ি আছে, লরী আছে, গন্ধমাদন পর্বত মাথায় করে তো আর বয়ে আনতে হবে না।'

স্ত্রীর রসিকতায় খুশী হলেন প্রভাকর। হেসে বললেন, 'শেষ পর্যন্ত হনুমান বানিয়ে দিলে। মানমর্যাদা আর কিছু রইল না তোমাব কাছে।'

খেতে বসতে স্বামীকে আরো কয়েকদিন পরামর্শ দিলেন বিভাবতী। 'মৃগাঙ্কের সম্মতি পাওয়া গেছে এই সুযোগ কিছুতেই ছাড়া উচিত হবে না। যা একখানা ছেলে তোমার, মত পাল্টে ফেলতে কতক্ষণ। তাছাড়া ওর কি মতিগতির কিছু স্থির আছে। হয়ত কোত্থেকে ভিন্ন জাতের ভিন্ন ধর্মের কালো-কুচ্ছিত একটা মেয়েকে সঙ্গে কবে নিয়ে এসে বলবে, মা তোমার বউ নাও। তার চেয়ে অমিয়বাবুর মেয়ে ঢের ভালো।'

প্রভাকর হেসে বললেন, 'তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু ব্যাপাব কি বল তো। তোমার ছেলের রাতারাতি এমন সুমতি হবাব কারণ কি ?'

বিভাবতীও হাসলেন, 'কারণ আবাব কি। মেয়েটিকে দেখেছে, তাব সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করেছে, দুজনকে দুজনের পছন্দ হয়েছে। তোমার মত বুড়ো তো আর সবাই নয় যে, টাকার মুখ ছাড়া আব কিছুর মুখ দেখতে জানবে না।'

প্রভাকর বললেন, 'সবই জানতাম। এককালে আমাদেবও তো বয়সকাল ছিল। কিন্তু একজনের মুখের দিকে তাকিয়ে—' বিভাবতী স্বামীকে আব একবার মিষ্টি ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন, 'ছি ছি ছি। কে কোত্থেকে শুনে ফেলবে। তোমাব কি মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেল ?'

ছেলের বিয়েকে উপলক্ষ্য করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ ধরনের দাম্পত্য আলাপ প্রায়ই চলতে লাগল। এই দীর্ঘকালের বিবাহিত জীবনে তাঁদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি, মন-কষাকষি কম হয়নি ; কিন্তু নতুন বউ আসার সম্ভাবনায় তাঁরা

সব ভুলে গেলেন। বিভাবতী নিজেই যেন নবজন্ম নিয়েছেন। তাঁর চলাফেরা উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে তাই সকলের মনে হতে লাগল। বাজারের ফর্দ, গয়নার দোকানের সচিত্র ক্যাটলগ সাগ্রহে দেখতে লাগলেন বিভাবতী, নিমন্ত্রণযোগ্য আত্মীয়স্বজনের তালিকা তৈরী করতে লাগলেন। তারপর একদিন স্বামীর সঙ্গে এনাক্ষীকে পাকা দেখার আশীর্বাদ করে এলেন। জড়োয়ার হার দিলেন আশীর্বাদী। একটু অবসর পেলেই প্রভাকরবাবু সস্ত্রীক নিজের ক্যাডিলাক গাড়িখানায় কলকাতায় যান, আর একরাশ জিনিসপত্র নিয়ে ফেরেন। তাঁর মধ্যেও যেন এক নতুন যৌবনচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। বিষয়-কর্ম ছাড়া অন্য কোন কাজকর্মে এত উৎসাহ কেউ কোনদিন তাঁর মধ্যে দেখে নি।

মৃগাঙ্ক একদিন খাওয়ার টেবিলে বসে বলল, 'মা, তোমাদের রকমসকম দেখে কিন্তু মনে হয় আসলে বিয়েটা তোমাদেরই।'

বিভাবতী লজ্জিত হয়ে বললেন, 'কথা শোন পাগলা ছেলের।'

প্রভাকরবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'বিয়ে নয়, বিয়ের অ্যানিভারসারি বলতে পার। সত্যিকারের অ্যানিভারসারি এইভাবেই হয় ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়ে। নিজেদের বিয়ের তিথি স্মরণ করে আমরা কোনদিন হৈ-চৈ করিনি।'

মৃগাঙ্ক যেন নিজেই নিজের ফাঁদে পড়ে গেছে। বিয়ের কথায় প্রতিবারই আপত্তি করে। আপত্তি আর প্রতিবাদটা যেন একঘেয়ে হয়ে গেছে। তার চেয়ে চুপ করে থাকলে, তার যন বিয়েতে সম্মতি আছে, এমন একটা ভাব দেখালে, ব্যাপারটা একটু নতুন ধরনের হতে পারে। তারপর যথাসময়ে না করে দিলেই হবে। কিন্তু সেই যথাসময়ে পৌছতে কেবলই অযথা দেরি হতে লাগল মৃগাঙ্কের। বলি বলি করেও বলতে পারল না যে, আসলে মতটা সে সত্যিই দেয়নি: কৌতুক করেই দিয়েছে।

কিন্তু বিয়ের দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল, বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের ভিড় আর হৈ-চৈ যত বাড়তে লাগল, মৃগাঙ্কের অস্বস্তি তত তীব্র হয়ে উঠল। এ কি করল সে? শেষ পর্যন্ত বন্ধনকে স্বীকার করে বসল? এ স্বীকৃতির

মানে যে কি, তা তো তার অজানা নেই। একটি মেয়েকে ভালো লাগুক কি না লাগুক, তাকে সারাজীবন সহ্য করে যেতে হবে। নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকে, ইচ্ছামত চলবার, যা খুশি তাই করবার সুযোগ-সুবিধাকে অনেকখানি খর্ব করে আনতে হবে। পাখা গুটিয়ে স্বেচ্ছায় খাঁচার মধ্যে বসবাসের পাকা ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে মৃগাঙ্ককে। তাকি সে পারবে? দম কি বন্ধ হয়ে আসবে না তার? শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে কি উঠতে হবে না? তার চেয়ে এখনো ফিরে আসা ভালো। এখনো সে সময় আছে।

কিন্তু বাবা-মার মুখের দিকে তাকিয়ে যেন মায়া হল মৃগাঙ্কের। সে যদি এই মুহূর্তে অমত করে, তাঁদেব উৎসাহ-উদ্যম নিমেষের মধ্যে শুকিয়ে যাবে। কিন্তু দিতে যেন ইচ্ছা করে না। তাঁদের সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজন পণ্ড হয়ে যাবে। অমিয়বাবুদের কাছে তাঁরা মুখ দেখাতে পারবেন না। কথা দিয়ে কথার খেলাপ করতে বাধ্য হবেন তাঁরা। অবশ্য জমি বেচা-কেনা এবং বাড়ি তৈরীর কণ্ট্রাক্ট নেওয়ার কাজে মৃগাঙ্কের বাবা বহুবার কথার খেলাপ করেছেন। কিন্তু সে হল ব্যবসায়ের একরকম অঙ্গ। বিয়ে করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে মৃগাঙ্ক এখন যদি তা ভাঙে, তাহলে অবশ্য অন্য পক্ষের আর্থিক ক্ষতি বিশেষ কিছু হবে না। কিন্তু আশাভঙ্গের দুঃখ তাঁদেব ভোগ করতে হবে। সেই দুঃখ আর লজ্জায় কেমন বঙ বদলাবে এনাক্ষীর মুখের? মৃগাঙ্ক নিজের মনে তা একবার কল্পনা করে দেখতে লাগল। ভারি নবম, ভারি সবল ওই এনাক্ষী নামে মেয়েটি। কেবল পড়া মুখস্থ করে করে পাশ করেছে। সংসারের কোন উত্তাপ তাব মনে লাগেনি। পুরুষের স্পর্শ থেকে সে সভয়ে সযত্নে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। মৃগাঙ্কের জগতে সে একেবারে নতুন। অচেনা-অজানা ভীরু একটি পাখি। শিকারী মৃগাঙ্ক যে-কোন মুহূর্তে বন্দুকের গুলীতে তার বুকের ধুকধুকানি বন্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু গুলী ছুঁড়তে কিছুতেই হাত এগোয় না। কেমন যেন আলস্য আর ঔদাস্য পেয়ে বসে মৃগাঙ্ককে। কি হবে গুলী ছুঁড়ে। তার চেয়ে এই রঙীন পাখিটি আকাশে উড়ুক, এ ডাল থেকে ও ডালে উড়ে বসুক, সবুজ পাতার সঙ্গে কিছুক্ষণ

লুকোচুরি খেলুক। তারপর নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে মৃগাঙ্কের সোনার খাঁচার মধ্যে চিরদিনের জন্যে বন্দিনী হয়ে থাকুক। মৃগাঙ্ক এতক্ষণ খাঁচার কথা কল্পনা করে কষ্ট পাচ্ছিল। কিন্তু তার নিজের তো দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। খাঁচা একটি তৈরি করতে হবে সে কথা ঠিক। কিন্তু সে খাঁচায় মৃগাঙ্ক নিজে থাকবে কেন। তার জন্যে বিশাল আকাশ, ঘন অরণ্য তো খোলাই রইল। যে আকাশকে ভয় করে, অরণ্যকে সন্দেহ করে, সেই ভীরু পাখি থাকবে তার খাঁচায়। মৃগাঙ্কের তাতে ভয় কিসের।

মৃগাঙ্ক মনে মনে ভাবল, হ্যাঁ পাখিই। পাখির সঙ্গেই তুলনা দেওয়া যায় এনাক্ষীর। এমন ভীরু মেয়ে সে আর দুটি দেখেনি। দিনকয়েক আগে বাস-স্টপে সে দাঁড়িয়েছিল। মৃগাঙ্ক যাচ্ছিল নিজের গাড়িতে কলকাতায়। ড্রাইভারকে পাশে বসিয়ে রেখে সে নিজেই ড্রাইভ করছিল। এনাক্ষীকে দেখতে পেয়ে গাড়ি থামাল মৃগাঙ্ক। মুখ বাড়িয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে দাঁড়িয়ে কি করছেন?'

এনাক্ষী আরক্ত হয়ে বলল, 'কলকাতায় যাব। বাসের জন্যে অপেক্ষা করছি।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'অপেক্ষা করবার কি দরকার। আমার গাড়িতে চলুন না, আমিই পৌঁছে দেব।'

এনাক্ষী তাড়াতাড়ি বলল, 'না না, আমি বাসেই যেতে পারব। কিছু মনে করবেন না। আমি—'

মনে আর কি করবে মৃগাঙ্ক। অন্য কোন মেয়ের কাছ থেকে এমন প্রত্যাখ্যান পেলে মৃগাঙ্ক মরীয়া হয়ে উঠ .। যেভাবেই হোক তাকে গাড়িতে তুলবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করত। কিন্তু এনাক্ষীর বেলায় তেমন কিছুই করল না। শুধু ওর ভীত বিব্রত লজ্জিত মুখের দিকে তাকিয়ে ফের স্টার্ট দিল গাড়িতে। নিজের লজ্জায় এনাক্ষী নিজেই যেন লজ্জিত হয়ে পড়েছে। তার অসৌজন্য যে অসমীচীন হয়েছে তা ব ঝতে পেরে যেন এনাক্ষীর অস্বস্তির অবধি নেই।

মৃগাঙ্ক আর একবার অনুরোধ করলেই এনাক্ষী হয়ত উঠে আসত। কিন্তু তা করল না মৃগাঙ্ক। জীবনে সে এই প্রথম সংযমের পরিচয় দিল। তার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির হয়ে যাওয়ার পরও এনাক্ষীর এই দ্বিধা সঙ্কোচ অস্থিরতা উপভোগ্য মনে হল মৃগাঙ্কের। দু'দিন বাদে এনাক্ষী তার কাছে একান্তভাবে ধরা দেবে, কিছুমাত্র ব্যবধান আর থাকবে না। তবু পুরোহিতের মন্ত্র পড়বার আগে এই দূরত্বটুকু বজায় রাখবার জন্যে এনাক্ষীর আপ্রাণ চেষ্টা এক পলকের জন্যে উপভোগ করে নিল মৃগাঙ্ক। এসব বিষয়ে তার নিজের কোন সংস্কার নেই। তবু অন্যের সংস্কারকে প্রশ্রয় দিতে মাঁঝে মাঝে মন্দ লাগে না। মার এমন অনেক অর্থহীন আচারকেও তো মৃগাঙ্ক হাসিমুখে মেনে নেয়।

এনাক্ষীকে এখনো সে আপনি বলে সম্বোধন করছে। দু'দিন বাদে তারা পরস্পরকে বিনা ভূমিকায় তুমি বলে ডাকবে। এনাক্ষীর মুখে প্রথম তুমিটা কেমন শোনাবে? যে লজ্জাবতী মেয়ে, প্রথম প্রথম স্পষ্ট করে কথাটা উচ্চারণ করতে পারবে তো?

নিজের চিন্তাধারা সম্বন্ধে একটু সচেতন হতেই মৃগাঙ্ক অবাক হয়ে গেল। আশ্চর্য, হল কি তার? তার মত বেপরোয়া বস্তুবাদী মানুষের এমন রূপান্তর হ'ল কি ক'রে? বিয়ে-বাড়ির জাঁকজমক, সাজসজ্জা, উৎসব-উল্লাসের ছাপ কি তার মনকেও এমনভাবে বদলে দিল। ভাবালু স্বপ্নালু করে তুলল মৃগাঙ্ককে?

তা যে তোলেনি নিজের কাজে তা স্পষ্ট করে প্রমাণিত করবার জন্যেই যেন মার কাছে মৃগাঙ্ক কথাটা পেড়ে দেখল। বিভাবতীকে ডেকে বলল, 'আচ্ছা মা।' তিনি ফর্দের কাগজ থেকে মুখ তুলে বললেন, 'কি রে।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'ব্যাপারটা তোমরা এমন সত্যি বলে ভেবে নিলে কেন? আমি ঠাট্টাও করতে পারি, সেকথা তোমার একবারও মাথায় ঢুকল না?'

বিভাবতী বললেন, 'কি নিয়ে ঠাট্টা?'

'কেন বিয়ে নিয়ে?'

বিভাবতী বললেন, 'বিয়ে নিয়ে আমার সঙ্গে ঠাট্টা। এই তো তুমি বলতে

চাও বাপু? তা তুমি করতে পার। তোমার অসাধ্য কোন কাজ নেই। অমন সর্বনেশে চিন্তা মনেও এনো না।'

মৃগাঙ্ক হেসে বলল, 'সর্বনেশে কিসের?'

বিভাবতী বললেন, 'সর্বনাশ নয়তো কি? এখন যদি এসব কথা ওঁদের কানে যায়, ওঁদের মনের অবস্থা কি হয় বলতো? যত সব জাতমারা কাণ্ড।'

মৃগাঙ্ক কৌতুক বোধ করে বলল, 'কি হয়, হঠাৎ যদি সব বন্ধ করে দেওয়া যায়? ছেলের মত বিগড়ে গেছে এই খবরটা যদি ওপক্ষের কানে তোলা যায় কেমন মজাটা হয় একবার ভেবে দেখ।'

বিভাবতী রাগ করে বললেন, 'দেখবার হয় তুমিই দেখ গিয়ে। আমি কিছু জানিনে বাপু।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু টাকা অমিয়বাবুর হাতে তুলে দিলেই বোধ হয় ওপক্ষ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তারপর সেই টাকা বরপণের মধ্যে ভরে এই কীর্তিপুর থেকেই ওঁরা আর একটি ছেলেকে পাকড়াও করতে পারেন। আর আমি পাণিগ্রহণের দায় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে পেট ভরে লুচি মাংস খেয়ে পানের খিলি হাতে নিয়ে নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরতে পারি। নিমন্ত্রণটা বোধ হয় এসবের পরেও ওরা করবে মা, কি বল?

বিভাবতী বললেন, 'তুমি আমার সামনে থেকে উঠে যাও বাপু। ওসব ঠাট্টা-তামাসা আমার ভালো লাগে না। শুনলে গা কাঁপে।'

মৃগাঙ্ক মার মুখের দিকে চেয়ে একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'কোন্‌টা যে তামাসা আর কোন্‌টা যে তামাসা নয়, তা তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না মা। অবশ্য আমিও যে পারছি তা জোর করে বলতে পারিনে।'

অনেকটা ঠিক এইরকম দ্বিধা আর সংশয় এনাক্ষীর মনকে পীড়া দিতে লাগল। বিয়ের দু'দিন আগে সে তার মার কাছে স্বীকার করে বলল, 'আমার বড় ভয় করছে মা।'

কল্যাণী সস্নেহে মেয়ের পিঠে হাত রেখে বললেন, 'দূর পাগলী। ভয়

আবার কিসের। এই তো এখান থেকে এখানে। দু'পা বাড়ালেই তোর শ্বশুরবাড়ি। আমার গরজ তো এইজন্যেই বেশি। ইচ্ছা করলে রোজ দু'বেলা তোকে দেখে আসতে পারব। কুটুম্ববাড়ি বলে নিজে যদি নাও যেতে পারি লোক পাঠিয়ে খবর নিতে তো কোন বাধা থাকবে না। ছাদে দাঁড়ালেই দু'জনে দু'জনকে দেখতে পাবব। আমাব ববং ভয় ছিল না জানি কতদূরে গিয়েই পড়বি। ছ' মাসে ন' মাসেও চোখেব দেখাটা দেখতে পারব না। তাব চেয়ে এ অনেক ভালো হলো পুনটুবী।'

এনাক্ষী আস্তে আস্তে বলল, 'আমি সেই দূব আব কাছেব কথা ভাবছি না মা।'

'তবে কি ভাবছিস ?'

এনাক্ষী মুখ নীচু কবে বলল, 'ভাবছি, কেমন হবে সেই লোকটি ? জানা নেই, শোনা নেই, চেনা নেই—'

কল্যাণী হেসে আদব কবে বললেন, 'ও দুষ্টু মেয়ে। চেনাশোনাব আর বাকি কি আছে শুনি। তুই তো মৃগাঙ্ককে কতদিন ধবে দেখলি, আলাপ করলি, গল্প কবলি। আব বিয়েব আগে আমি তোব বাবাব সঙ্গে কথা বলা তো ভালো, চোখ তুলে তাকাতেও তো পারিনি। তবু তো চেনা-পরিচয় সবই হয়েছে।'

এনাক্ষী বলল, 'কিন্তু তোমাদেব মধ্যে অমিলও তো যথেষ্ট।'

কল্যাণী লজ্জিত হয়ে একটু হাসলেন, তাবপব বললেন, 'হতভাগী, তুমি বুঝি এখন থেকে সেই ভাবনাই ভাবছ। তা আমাদেব মধ্যে অমিল আছে থাক না। তোবা তা হ'তে দিবি কেন। তোবা একালের ছেলেমেয়ে। কত লেখাপড়া শিখেছিস। মানুষেব মনেব কথা কত সহজে বুঝতে পাবিস, আবার যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝাতেও পারিস। তোদের অমিল কি বেশিক্ষণ থাকতে পাবে ? মিল হ'তে তোদের মোটেই দেবি হবে না। আমার মন বলছে, তোরা সুখী হবি, খুবই সুখী হবি।'

মায়ের আরো কাছে এসে গা ঘেঁষে বসল এনাক্ষী। বলল, 'মা, তুমি এত

ভালোবাস আমাকে। সেই তোমাকেই ছেড়ে আমাকে অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে। এতক্ষণে বুঝতে পারছি মা আমার দুঃখটা কিসের। ভয় নয় মা, দুঃখ, তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার দুঃখ।'

কল্যাণী এক মুহূর্ত চুপ করে বসে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'আর এক বড় সুখের জন্যে এ দুঃখ সব মেয়েকেই ভোগ করতে হয় মা। তোর কথা শুনে আমার মার কথা মনে পড়ছে। বাসি বিয়ের দিন আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কি কান্নাটাই না কেঁদেছেন। কিন্তু মেয়ের জন্যে এমন কান্না না কাঁদতে পারলেও যে মায়ের সুখ হয় না পুনটুরী।'

এনাক্ষীর বাসি বিয়ের দিন কল্যাণীও কাঁদলেন, বুঝে শুনে, বলে কয়েই কাঁদলেন। আর কাঁদলেন শতদলবাসিনী। নাতনীকে সাজিয়ে গুজিয়ে পরের ঘরে পাঠাতে তাঁর চোখের জল পড়ল, আর মেয়েকে যে শ্বশুরবাড়িতে পাঠাতে পারেননি সেকথাও এই মুহূর্তে নতুন করে মনে পড়ায় তাঁর দু'টি চোখ সজল হয়ে উঠল।

স্বজনবন্ধুদের সঙ্গে অমিয়ভূষণ মণিময়কেও নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এবার আর সে অভদ্রতা করেনি। অর্ধপরিচিত নিমন্ত্রিতদের দলে বসে পেট ভরে খেয়েছে। দু'খণ্ড রবীন্দ্রবচনাবলী এনাক্ষীর হাতে তুলে দিয়ে তাকে স্মিতমুখে আশীর্বাদও করেছে। করুণা অবশ্য বিয়েবাড়ির কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তার সঙ্গে কথা বলবার কোন সুযোগ পায়নি। ইচ্ছা করেই সুযোগ নিতে চায়নি, আব শতদল মণিময়কে দেখেও তার সঙ্গে রাগ করে কোন কথা বলেননি। এই লোকটিই যে তাঁর মেয়েব সব দুঃখ আর দুর্ভাগ্যের মূল সেকথা ভুলতে পারেননি তিনি। অমিয়ভূষণ কিন্তু মণিময়ের এই আসা-যাওয়াকে সুলক্ষণই মনে করলেন। বিদায় নেওয়ার সময় মণিময় বলে গেল, 'আপনার সঙ্গে আমার অন্য কথাবার্তা আছে। আজ তো আর সেসব বলবার সময় নেই। আর একদিন আসতে হবে।'

অমিয়ভূষণও খুশী হয়ে বললেন, 'আসবে বই কি, নিশ্চয়ই আসবে।'

ভাইবোনদের নিয়ে মালাও এসে নিমন্ত্রণ খেয়ে গেল। গৃহপ্রতিষ্ঠার

দিনে তার বাবা মা দু'জনেই এসেছিলেন, কিন্তু এনাক্ষীর বিয়েতে কেউ তাঁরা আসেননি।

অমিয়ভূষণ বার বার জিজ্ঞাসা করে শুধু এইটুকু জানতে পারলেন, নীলকান্ত অসুস্থ। অসুখটা যে কি সেকথা মালা কিছুতেই বলল না। শুধু বলল, 'একদিন যাবেন কাকাবাবু, একদিন গিয়ে দেখে আসবেন।'

নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণের ব্যাপারে সবচেয়ে তাক লাগিয়ে দিলেন প্রভাকর দত্তগুপ্ত। ছেলের বউভাতে তিনি কীর্তিপুরের সবাইকে নিমন্ত্রণ করলেন। এর আগে কেউ তাঁর বাড়িতে পাত পাতেনি। কদাচিৎ দু'একজন গিয়ে চা খেয়েছে। কৃপণ বলে যে দুর্নামটা ছিল তা তিনি পোলাও মাংস আর দই মিষ্টি ঢালাওভাবে যাচাই ক'রে ঢেকে দিলেন।

তবু কীর্তিপুরের দুর্মুখ দু'জন নাগরিক মার্চেন্ট অফিসের অবসরপ্রাপ্ত বড়বাবু সরোজ দত্ত আর তাঁর ওভারসীয়ার বন্ধু বুড়ো বিনয় দাশগুপ্ত খাওয়া-দাওয়ার পর রুমালে মুখ মুছতে মুছতে প্রভাকরবাবুদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আড়ালে এসে নিজেদের মধ্যে আলাপ করতে লাগলেন।

সরোজবাবু বললেন, 'ব্যাপারখানা কি। আমাদের প্রভাকরবাবু হঠাৎ এমন দিলদরিয়া হয়ে পড়লেন যে।'

বিনয়বাবু বললেন, 'পড়বেন না? আপনারা যে কলোনীর জন্যে রাস্তা দাবি করছেন, পাকা ড্রেন আর ইলেক্‌ট্রিক লাইট দাবি করছেন।'

সরোজবাবু হেসে বললেন, 'কিন্তু অত দাবি কি শুধু পোলাও মাংসে ঢাকা পড়বে?'

বিনয়বাবু বললেন, 'পড়ে গেছে। আর আপনি বলছেন পড়বে। এখানে ওঁর বিরুদ্ধে মাথা তুলবে কে? আমাদের মধ্যে কি সেই একতা আছে? আবার ঘরের কাছে একঘর কুটুম্ব বাড়ল। বেয়াইমশাই চরমশাই হবেন আর কি।'

সরোজবাবু বললেন, 'যাই বলুন, প্রফেসরের বুদ্ধি আছে। কোত্থেকে উড়ে এসে ক' মাসের মধ্যে একেবারে বেয়াই হয়ে বসল। আপনারা মশাই কিছুই

করতে পারলেন না। আপনার মেয়েও তো সুন্দরী, সেও তো বিয়ে পাশ করেছে।'

বিনয়বাবু নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'করলে হবে কি মশাই, আমরা তো আর মেয়েকে বড়লোকের ছেলেধরা বিদ্যে শিখাইনি।' তারপর একটু হেসে বললেন, 'ও বিদ্যে কি যে সে বিদ্যে। আজ বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে গেলেন আবার ছ' মাস কাটতে না কাটতেই অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন খেতে আসতে পারবেন। সেজন্যে চিন্তা করবেন না।'

'তাই নাকি ?'

দুই বন্ধু এবার গলা মিলিয়ে হেসে উঠলেন।

২২

বীরনগরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে কৌতুক করে কয়েকটি ছেলেকে নিয়ে যে রোড কমিটি গঠন করেছিল মণিময় তা অনেকে ভুলে গেলেও সে নিজে ভোলেনি। আর ভোলেনি ভন্টু। স্কুলে-পড়া সেই চৌদ্দ-পনের বছরের ছেলেটি। সে প্রায়ই বলে 'মণিময়দা, আমাদের সেই পাকা রাস্তার কি হল?'

মণিময় বলে, 'হবে, তোমরা মনে করলেই হবে।'

তার তরুণ সহকর্মী সামনে থাকলে হেসে জবাব দেয়, 'শুধু যদি আমরা মনে মনেই রাস্তা গড়ি মণিময়দা, তাহলে সে শুধু মনের রাস্তাই হবে, পায়ে-হাঁটা রাস্তা আর কোনদিন হবে না।'

মণিময় বলে, 'তাই বলে মনকে তুমি অমন করে বাদ দিতে পার না। আগে মন হাঁটে তার পরে পা।'

তবু মনের যে সুবিধাটা আছে, পায়ের তা নেই। মনের পক্ষে বাঁধা রাস্তা না হলেও চলে। পায়ের তা চলে না। এবড়ো-খেবড়ো খানা-খন্দ-ভরা রাস্তায় চলতে পা-কে হোঁচট খেতে হয়। দু' একদিন বৃষ্টি হ'লেই পথে জল-কাদা জমে। এমন পথে পা দিতে মনে বিরক্তির অবধি থাকে না। তবু বটতলার এই পথটাই কলোনীর সদর রাস্তা। কেউ বাইরেই যাক আর ভিতরেই ঢুকুক এ পথ তার এড়াবার জো নেই।

রাস্তার দু' দিকে কলোনী। গৃহস্থদের দু চারজনের সঙ্গে মণিময়ের পরিচয় আছে। তাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে সে আলাপ করে দেখেছে। জিজ্ঞাসা করেছে, 'রাস্তাটার কথা কিছু ভাবলেন?'

'আর মশাই, ঘর নিয়েই ভেবে অস্থির, তার ওপর আবার রাস্তা। আপনি বেশ আছেন। ও সবের মধ্যে মাথা দেবেন না। এই হতচ্ছাড়া জায়গায় কিচ্ছু হবে না মশাই, কিচ্ছু হবে না।'

সেদিন নীলকান্ত রায়ের বাড়িতে ছোট্ট চায়ের আসরে নির্মলা, মণিময় আর মালার মধ্যে এই রাস্তার কথাই আলোচনা হচ্ছিল।

রবিবারের বিকাল। আকাশে মেঘ থাকায় সন্ধ্যার আগেই যেন চার দিকে অন্ধকার নেমে এসেছিল। বারান্দার তক্তপোশে বসে চা আর তেলমুড়ি খাচ্ছিল মণিময়। কলোনীর নানা ব্যাপার নিয়ে গল্প চলছিল সেই সঙ্গে। রাস্তার কথাটা মণিময় নিজেই তুলল। হেসে বলল, 'আমাদের সেই রোড কমিটির উৎসাহী সদস্য বলতে এখন ভণ্টুই আছে। এক এবং অদ্বিতীয়।'

নির্মলা হেসে বললেন, 'কেন তোমার চেলাচামুণ্ডাদের তো অভাব নেই এখানে। তারা কি বলে?'

মণিময় বলল, 'সীতাংশু আর সুনীলও আর বেশি সাড়া-শব্দ করছে না। ব্যাপারটাকে তারাও অসম্ভব বলে ভেবেছে।'

নির্মলা বললেন, 'যাদের একটু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে তারা তাই ভাববে। সবাইর কি আর তোমার মত মাথা খারাপ! আমার যেমন কপাল। যাদের সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় হয় তাদেরই দেখি মাথায় একটা-না-একটা ছিট আছে। তোমার রাস্তা, আর একজনের নভেল।'

মণিময় বুঝতে পারল স্বামীর কথা বলছেন নির্মলা। সেদিনের সেই আতিশয্য অত্যাচারের পর নীলকান্ত আবার ঘরের কোণ বেছে নিয়েছেন। আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে যোগাযোগ আরও কমে গেছে। এখন প্রায় কথাবার্তাই বন্ধ। স্ত্রীর সঙ্গে একেবারেই কথা বলেন না। মেয়ের সঙ্গে কদাচিৎ দু' একটা কথা বলেন। মণিময় বিবাদ মেটাবার জন্যে চেষ্টা করে দেখেছে। নীলকান্তকে তাঁর সেই নির্জন দুর্গ থেকে বের ক'রে আনবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু দু' একটা কথা বলতেই তিনি এমন বিরক্তভাবে মণিময়ের দিকে তাকিয়েছেন যে সে আর এগোতে সাহস পায় নি। তাঁর দৃষ্টিতে শুধু বিরক্তি নয়, কেমন একটা হিংস্রতাও ফুটে উঠেছে. মণিময়ের আশঙ্কা হয়েছে, নীলকান্ত বুঝি তাকে যে কোন মুহূর্তে বলে বসবেন, 'বেরিয়ে যাও।' কিংবা

কোন কথা না বলে ঝাঁপিয়ে পড়বেন তার ওপর। মণিময় আস্তে আস্তে পিছু হটে এসেছে।

মণিময় একদিন বলেছিল, 'ওঁকে বোধ হয় একজন ডাক্তার টাক্তার দেখানো ভালো।'

নির্মলা সে কথায় কান দেননি। বলেছেন, হ্যাঁ, ডাক্তার। ছেলেমেয়েদের সমানে দু'বেলা ভালো ক'রে খেতে দিতে পারিনে এর ওপর আবার ডাক্তার কবিরাজ ডাকব। ডাক্তার এসে কি চিকিৎসা করবে শুনি? কি হয়েছে ওঁর? ডাক্তার এসে ওঁর লেখা থামাতে পারবে, না কি স্বভাবচরিত্র পালটে দিতে পারবে?

মণিময় জবাব দিয়েছিল, 'তবু কিসে কি হয় তাতো বলা যায় না।'

নির্মলা নির্মমভাবে বলেছিলেন, 'কিছুতেই কিছু হবে না। একথা তোমাকে আমি লিখে দিতে পারব। দেখ মণিময়, পাগলামি রোগেরও চিকিৎসা আছে, কিন্তু ভোগলামির নেই। এ ওঁর সার-করা রোগ। কারো সাধ্য নেই এর চিকিৎসা করে।'

স্বামীর ওপর যে কিছুমাত্র মায়ামমতা আছে নির্মলার কথা শুনলে তা মনে হয় না। বরং তাঁর রূঢ়তা আর নিষ্ঠুরতা মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক লাগে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে হঠাৎ চুপ করে যায় মণিময়। এঁদের ইতিহাস সে তো কিছু কিছু জানে। যা জানে না তাও অনুমানের বাইরে নয়। আঘাতে আঘাতে নীলকান্ত দাম্পত্য সম্পর্ককে টুকরো টুকরো ক'রে ভেঙে ফেলেছেন। তাঁর পারিবারিক জীবন বলতেও কিছু আর নেই। যেটুকু আছে তা শুধু ওপরের কাঠামো মাত্র। প্রত্যেক সম্পর্কেরই জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। কোন কোন সম্পর্কের মৃত্যু নিঃশব্দে ঘটে। তা নিয়ে কেউ কাঁদে না, শোক করে না। কিন্তু এমন মৃত্যুও আছে যা ভোলা যায় না, যার শোকের শেষ হয় না। কে জানে নির্মলার এই বিদ্বেষ আর বিরূপতা হয়ত সেই দুর্বহ দুঃসহ শোকেরই ছদ্মবেশ। তাঁর দাম্পত্যজীবন নিয়ে মণিময় কিছু আলোচনা করে, কোনরকম সান্ত্বনা দিতে যায় কি সহানুভূতি প্রকাশ করে তা

নির্মলাদি মোটেই পছন্দ করেন না। মণিময় তাই ওসব কথা আর তোলে না।

বাবার ধরন-ধারন দেখে মালাও মাঝে মাঝে উদ্বেগ বোধ করে। একবার সেও বলেছিল, 'বাবা, আমাদের হাসাপাতালে তো ডাক্তারের অভাব নেই। চল কাউকে দেখিয়ে আনি। দেখাতে দোষ কি। টাকা পয়সা তো কিছু লাগবে না।'

নীলকান্ত মেয়ের দিকে চেয়ে হেসেছিলেন, 'কিসের ডাক্তার দেখাবি। নাকের না চোখের ?'

মালা মুখ নিচু করে বলেছিল, 'না বাবা, ও সব কিছু নয়।'

নীলকান্ত বলেছিলেন, 'বুঝেছি। আমার মাথাটাই তোরা পরীক্ষা করাতে চাস। তোর মা বুঝি শিখিয়ে দিয়েছে ? তাকে বল গিয়ে, আগে তার মাথা পরীক্ষা করাক, পরে আমারটা করাব '

মালা আর কোন কথা বলেনি। এত পরিষ্কার যাঁর বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ রসবোধ তাঁর সুস্থতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করা চলে না। নির্মলা শুনে বলেছিল, 'তোকে তো আমি আগেই বলেছি রোগব্যাধি কিছু নয়, তোর বাবা একটি জ্ঞানপাপী। সংসারে যারা কাজকে ভয় করে তারা কেউ বা সন্ন্যাসী সাজে, কেউ সাজে পাগল। ওসব ভাবের পাগলকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।'

কথায় কথায় মণিময় সবই শুনেছে। তবু নীলকান্ত যে পরিবারের একটি স্থায়ী অশান্তি তা অস্বীকার করবা . .জা নেই। অবশ্য তেমন কোন উৎপাত উপদ্রব যে তিনি করেন তা নয়। শুধু ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর দিন নিজের ঘরটির মধ্যে চুপ চাপ বসে থাকেন। মাঝে মাঝে নিজের মনে কি যেন বিড় বিড় করে বকেন। কাগজ টেনে নিয়ে হয়ত কিছু লেখেন, আবার তা ছিঁড়ে ফেলে দেন। আগে কিছু লেখা ছিল তাঁব আনন্দের বস্তু কিছুটা বা পেশা। এখন বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু একটা বাতিক নিয়ে একজন লোক হয়ত সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে, . . কোন কাজকর্মের দরকার হয় না। কিন্তু যাদের তেমন বাতিক নেই অথচ খাওয়া-পরার চিন্তা আছে

তাদের কাছে ব্যাপারটা দুঃসহ লাগে। স্বামীর কাণ্ড-কারখানা দেখতে দেখতে নির্মলারও মাঝে মাঝে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। তিনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ঝগড়া করেন। বলেন, 'পাগলামির ভান ক'রে তুমি সত্যিই আমাকে পাগল বানিয়ে দেবে।'

নীলকান্ত জবাব দেন, 'সত্যিকারের পাগল হতে যদি এত ভয়, তুমিও ভান কর না। তোমাকেই বা আটকাচ্ছে কে।'

নির্মলা তিক্তকণ্ঠে বললেন, 'ভান করতে পারতাম, যদি তোমার মত দায়িত্বহীন হতাম, যদি মেয়েব রোজগার খেতে লজ্জা না হত, যদি ছেলেমেয়ে-গুলিব জন্যে কোন চিন্তাভাবনা না থাকত—।'

শুনে শুনে এতই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন নীলকান্ত যে এ সব খোঁটা তাঁর গায়ে লাগে না, মনেও কোন দাগ কাটে না। তিনি ফেব মুখ ফিবিয়ে নেন।

মালা কাছে থাকলে মাকে জোব ক'রে অন্য ঘবে সবিয়ে নিয়ে যায়, অনুনয় করে বলে, 'ও সব কথা তুলে আর লাভ কি মা। দুটো দিন একটু চুপ থাক। ওঁকেও শান্তিতে থাকতে দাও, তুমিও শান্তিতে থাক।'

নির্মলা মনে মনে ভাবেন শান্তি যেন অতই সহজ। তা যেন চাইলেই পাওয়া যায়।

চায়ের আসরে নীলকান্তেব কথা ওঠায় মালা বলল, 'জানেন মণিমামা, বাবা আবার লিখতে শুরু করেছেন। এবাব আব ছেঁড়েননি। উপন্যাসখানা বোধ হয় সত্যিই শেষ হবে।'

মণিময় আগ্রহ দেখিয়ে বলল, 'তাই নাকি?'

নির্মলা বললেন, 'হ্যাঁ, লিখে লিখে স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধবেন তিনি। তুমি যেমন মর্ত্যের সড়ক বাঁধবাব ভার নিয়েছ।'

মণিময় হেসে বলল, 'না এত খোঁটা আব সহ্য হয় না। এব পবেও যদি রাস্তাটাস্তা কিছু একটা না করি আমাব ঘরে টেঁকাই দায় হবে।'

নির্মলা মণিময়ের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে একটু হাসলেন. 'তোমার আবার ঘর আছে নাকি?'

মণিময় বলল, 'আছেই তো। সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর' মরি খুঁজিয়া।'

নির্মলা হেসে বললেন, 'অত ঘরে দরকার নেই ভাই। তার চেয়ে মনের মত একখানা ঘর বাঁধ সেই ভালো।'

মালার সামনেই আজকাল দুজনের এ সব রসিকতা কি ঠাট্টা তামাসা চলে। মেয়ে বড় হয়ে যাওয়ায় তাকেও বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে টেনে নিয়েছেন নির্মলা। মালা নিজের গুণে নিজের জোরেই এই প্রমোশন পেয়েছে। মালা জানে সে আর মণিমামা ছাড়া মায়ের আর কোন বন্ধু নেই। মণিময়ের সঙ্গে নির্মলা যখন কথা বলেন, হাসি কৌতুক করেন, মালার মনেই হয় না মায়ের মনে কোন অশান্তি আছে, দুঃখ দুর্ভোগ দুশ্চিন্তা আছে। মণিময় রাজী হলে তিনি যেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে এমন রহস্যালাপ করতে পারেন। মালা ভাবে মা কি তাঁর জ্বালাযন্ত্রণা ভুলে যাবার জন্যেই এমন করে হাসেন, মণিমামার সঙ্গে ঠাট্টা তামাসায় সময় কাটান, নাকি সত্যই আনন্দ পান। আনন্দই পান। মার মুখ দেখলে তাতে কোন সন্দেহ থাকে না মালার। মাঝে মাঝে এক আধটু হিংসা হয়, রাগ হয়। মনে মনে ভাবে এই প্রীতি আর সৌখ্যের সম্পর্ক বাবার সঙ্গে যদি ফের গড়ে তুলতে পারতেন মা তাহলে হয়ত তাঁদের সংসারের চেহারা ফিরে যেত। কিন্তু তা বোধ হয় আর সম্ভব নয়। নিজের সংকীর্ণতার জন্যে মালা নিজেই লজ্জা বোধ করে। মণিময় নির্মলার আপন ভাই নয়—ত' ঠিক। সম্পর্কিত জায়ের ভাই। কুটুম্ব। তাই অবাধে হাসিঠাট্টা চলে। আর দ্বিতীয় কোন পুরুষের সঙ্গে নির্মলার এমন সৌখ্যের সম্বন্ধ নেই। মণিময় একই সঙ্গে যেন তাঁর ভাই আর বন্ধু। মালা জানে তাঁদের এই বন্ধুত্ব সৌহার্দ্য একটা জায়গায় এসে থেমে গেছে। তা আর এগোবে না, বাড়বে না। কিন্তু বাড়লেও, বাড়ির দক্ষিণ কোণের হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বেল ফুলের গাছটির ওপর মার যেমন একটু বিশেষ দৃষ্টি আছে, যত্ন আছে, তাতে ফুল ফুটলে যেমন মার মুখে চকিত একটু হাসি ফোটে, যদিও সে ফুল কিছুতেই খোঁপায় ওঠে না, মালার মনে হয়

মণিমামার সঙ্গে তার মার সম্পর্কের মধ্যেও তেমনি একটু গোপন মাধুর্য আছে। ওঁরা দুজনে মালার সামনেই রসিকতা করেন, মালাকেও বন্ধুর মত দলে টানেন, তবু মালার মনে হয় সে যেন একটু বাইরে পড়ে থাকে। গণ্ডীর বাইরে। সব গিঁট যেন খোলে না, সব সঙ্কেতের অর্থ যেন ওঁরা ভেঙে বলতে চান না মালার কাছে। ওঁদের দুজনের বয়সের মিল আছে, সেই জন্যেই কি ওঁরা এত কাছাকাছি আসতে পারেন? না কি আরো কিছু আছে? আরো কিছু? নিজের এলোমেলো অপরিচ্ছন্ন চিন্তায় ফের লজ্জিত হয়ে ওঠে মালা। বাইরে থেকে মাথা নেড়ে মনেব ভাবনাকে অস্বীকার করতে চায়। মনে পড়ে কমলাক্ষের কথা। মাঝে মাঝে তার দেখা মেলে। আবার বহুদিনের জন্যে সে যেন নিখোঁজ হয়ে যায়। তাদের সম্পর্কও এগোয় না। এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে। নাকি সেটুকুও থাকে না। হারিয়ে যায়। মাঝে মাঝে কমলাক্ষের কথা ভেবে অবাক হয় মালা। ভাবে বলেই অবাক হয়। এই পুরুষটির মধ্যে পৌরুষ বলে কিছু নেই, আকর্ষণযোগ্য অন্য কোন গুণ নেই। সেতার বাজানো ছাড়া সে আর কিছু জানে না। বাজাতেও যে ভালো ক'রে জানে তা নয়। তাহলে আরো নাম হত। সিদ্ধির ঔজ্জ্বল্য লাগত চেহারায়, চোখে মুখে। কিন্তু উজ্জ্বলতা দূরে থাকুক, কমলাক্ষ যেন এই বয়সেই নিভে গেছে। মালার মাঝে মাঝে মনে হয় অমন ছেলেকে সে পছন্দ করে না। বরং ঘৃণা করে। যে পুরুষ যৌবনে বুড়ো, তার ওপর মালার কোন সহানুভূতি নেই। কমলাক্ষ তার সামনে না আসে সেই বরং ভালো। কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই ফের সেই কমলাক্ষকে দেখবার, তার সঙ্গে কথা বলবার সাধ যায় মালার। মালা নিজেই বলে,—'এমন সাধের বালাই নিয়ে মরি।' কিন্তু মরে না। মৃত্যুর মধ্যেও জীবনের স্বাদ পায়। ব্যর্থতার মধ্যেও কিসের যেন একটা আশা লুকিয়ে থাকে। একথাটা সেদিনের ঘটনায় টের পেয়েছে মালা।

ডিউটি সেরে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসতেই দেখে একটু দূরে কমলাক্ষ দাঁড়িয়ে রয়েছে। আজ আর তার হাতে নীল রঙের ঢাকনিতে ঢাকা সেতার নেই। খালি হাতেই এসেছে কমলাক্ষ।

মালা তাকে দেখে বলেছিল, 'কি ব্যাপার। এখানে কিসের জন্যে। কোন পেশেণ্ট টেশেণ্ট আছে নাকি ?'

কমলাক্ষ একটু হেসে জবাব দিয়েছিল, 'একজন আছে। আমি নিজে।'

মালাও হেসেছিল, 'ভালোই তো। তাহলে বলুন কোন্ ওয়ার্ডে আপনাকে ভর্তি করে দেব ?'

কমলাক্ষ বলেছিল, 'তেমন কোন ওয়ার্ড আপনাদের হাসপাতালে নেই।'

'বেশ তো আপনাব জন্যে না হয় নতুন ওয়ার্ডই তৈরি করা যাবে। রোগটা বলুন।'

'তার চেয়ে চলুন এক কাপ করে চা খেয়ে নেওয়া যাক। খেতে খেতে বলব।'

মালা হেসে বলেছিল, 'তার মানে সত্যিকারের রোগ সৃষ্টি করতে চান। জানেন তো ডাক্তার নার্সদের হাইজিনটা ভালো করে মানতে হয়। না হলে রোগীরা গ্রাহ্য করে না। যে সে দোকানে চা খাওয়া আমাদের পক্ষে বারণ।'

কিন্তু তবু কমলাক্ষ নাছোড়বান্দা। গলির ভিতবে একটি চায়ের দোকানে সত্যিই তাকে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল—সস্তা রেষ্টুরেণ্টের যেমন হতচ্ছাড়া চেহারা তেমনি আসবাবপত্র আর ভোজ্যবস্তুর ব্যবস্থা। তবু পর্দা-ঢাকা কেবিনে কমলাক্ষের মুখোমুখি বসে বুক কেঁপে উঠেছিল মালার। গা শিউরে উঠেছিল। নিরালা নির্জনে একজনের সঙ্গে এমনভাবে চা খাওয়া মালার এই প্রথম। বুক দুরু দুরু করেছিল। না জানি তাকে কি বলবে কমলাক্ষ, কি কথাই না জানি শোনাবে। কিন্তু চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সে যা বলল, তা একেবারে অপ্রত্যাশিত। কমলাক্ষ বলল, 'জানেন, আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছি।'

মালা বলল, 'তাই নাকি! আপনি যে চাকরি করতেন তাইতো জানতাম না।'

কমলাক্ষ বলল, 'হ্যাঁ, একটা করতাম। ইনসিওরেন্স অফিসে। শ দেড়েক টাকা পর্যন্ত মাইনে হয়েছিল।'

মালা বলল, 'কেন ছাড়লেন?'

'না ছাড়লে ওরাই আমাকে ছাড়াত। আমার নামে ওদের নালিশের ফিরিস্তি ক্রমেই বেড়ে চলছিল। কাজে কামাই, অমনোযোগ, গাফিলতি, ভুলচুক। চারদিকে ক্লিক আর ক্লিক, ফিস ফিস। আজ ইনচার্জের সঙ্গে চটাচটি হতেই তিনি বললেন, না পোষায় কাজ ছেড়ে দিন। আমি বললাম, এক্ষুনি। কলমের এক খোঁচায় পদত্যাগপত্র। বাঙালীর ছেলের পক্ষে এর চেয়ে বড় বীরত্ব আর কি থাকতে পারে বলুন। রাজার ছেলের পক্ষে রাজ্য ত্যাগেও এত মহত্ত্বের দরকার হয় না।'

হাসতে হাসতে এবং পরিহাসেব ভঙ্গিতেই কথাগুলি বলছিল বটে কমলাক্ষ কিন্তু হাসির আড়ালে যে পরাভবের লজ্জা, ব্যর্থতার ক্ষোভ প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা মালার কাছে সম্পূর্ণ গোপন ছিল না।

মালা একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, 'ভালোই তো। আপনি এবার বিনা বাধায় সেতার সাধতে পাববেন। সারাদিন সারারাত শুধু বসে বসে বাজাবেন। আপনাদের বাড়ির অবস্থা তো আর আমাদের মত নয়। আপনাকে চাকরি করতেই হবে এমন কি কথা আছে।'

কমলাক্ষ বলল, 'করতে পারলে ভালো হত। বাবাকে সাহায্য করা দরকার। তা ছাড়া নিজের পক্ষেও একটা আড়াল ছিল, অজুহাত ছিল যে চাকবি কবি বলেই আমি আমার নিজেব কাজ ভালো কবে কবতে পারিনে। এখন যদি না পারি তা হলে নিজের কাছে কি কৈফিয়ৎ দেব? দেখুন ওপরওয়ালাকে ভোলানো যায়, কিন্তু অন্তরওয়ালাকে তো ভোলানো সহজ নয়।'

মালার চা খেতে আর ইচ্ছা ছিল না, কথা বলবারও নয়। তার দরকারও ছিল না। মালা উপলক্ষ। কমলাক্ষ নিজের মনেই নিজে কথা বলে চলেছে।

'নিজে যখন এক আধটু বাজাতাম, বেশ ছিলাম। কিন্তু দায় যখন নিজের ওপর চাপল, দায়িত্ব যখন স্বীকার করে নিলাম, দেখলাম অত

বোঝা আমার সয় না। অত ভার বইবার আমি যোগ্য নই। অথচ যোগ্য হওয়ার লোভ আছে। আমার ভিতরে সেই লোভের সঙ্গে নিষ্ক্রিয়তার সংগ্রাম, অকর্মণ্যতার যুদ্ধ। দিনরাত আমি সেই যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত। বুঝেছেন?'

মালা একটু অদ্ভুত হেসেছিল, 'বুঝেছি। আপনি আমাদের সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ভর্তি হন। সেখানে ঘা-টার ড্রেস করবার ব্যবস্থা আছে।'

এমন নির্মম শ্লেষ কমলাক্ষ বোধ হয় আশা করেনি। সে মুহূর্তের জন্যে বোবা হয়ে গিয়েছিল। ফেরার পথে মালা আবার বলেছিল, 'আমার বাবার সঙ্গে আপনার ভালো করে আলাপ করিয়ে দেব। মনে হয় তাঁর সঙ্গে আপনার খুব মনের মিল হবে।'

বাসে তারপর চুপচাপ এসেছে কমলাক্ষ। একটি কথাও বলেনি। আর ওর মুখ দেখে মায়া হয়েছে মালার। হওয়া উচিত না, তবু হয়েছে। আশ্চর্য, হাসপাতালের ভিতরেও রোগী, বাইরেও রোগী। রোগী ছাড়া আর কারো সঙ্গে কি মালার দেখাসাক্ষাৎ হবে না? আলাপ পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হবে না? রোগের সেবা করতে করতেই কি তার জীবন কাটবে?

মণিময়ের কথায় মালার চমক ভাঙল। সে বলল, 'মালার যেন আজকাল কি হয়েছে রাঙাদি। থাকে থাকে, তারপর হঠাৎ এমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। যেন কোথায় তলিয়ে যায় তার কিছু ঠিক থাকে না।'

নির্মলা অভিযোগের ভঙ্গিতে বললেন, 'আগে এমন ছিল না, যত বড় হচ্ছে তত বাপের ধারা পাচ্ছে, আমার কপাল।'

মালা তা শুনে হেসে বলল, 'মোটেই তলাইনি মণি মামা। অন্তত আপনার রোড কমিটির মত নয়। যেমন রোড তেমনি তার রোড কমিটি। এই বর্ষা এলে দেখবেন রাস্তার কি অবস্থা হয়। হাঁটু অবধি জলকাদা হবে। নৌকো ভাসবে, জাহাজ ভাসবে। রোড কমিটি টমিটি না করে একখানি খেয়া নৌকোর ব্যবস্থা করুন। পারানির পয়সায় আমরা বেশ ফিস্ট-টিস্ট করতে পারব।'

নির্মলা হেসে বললেন, 'মণিময় ভালো করনি। বোতলের ছিপি খুলে দিয়েছ। এবার গল গল ক'রে কথা বেরোচ্ছে। তোমরা বোসো। আমি যাই রান্নাঘরের দিকে, যজ্ঞের ব্যবস্থা করি গিয়ে।'

নির্মলা যেতে না যেতেই শীতাংশু আর স্থনীলের দল এসে হাজির হল, 'মণিময়দা!'

মালা উঠে ভিতরে চলে যাচ্ছিল, মণিময় বাধা দিয়ে বলল, 'পালাচ্ছ কেন মালা, তুমিও বসো না। আজ এখানে আমাদের রোড কমিটির মিটিং। শীতাংশু, মালাকে যদি আমাদের কমিটিতে কো-অপ্ট ক'রে নিই তোমাদের কোন আপত্তি আছে?'

শীতাংশু বলল, 'কিছু না, কোন আপত্তিই নেই। মালাদিকে আমাদের দলে পেলে তো খুবই ভালো হয়।'

ভন্টু বলল, 'হ্যাঁ, ব্যাণ্ডেজ করবার মত কেউ থাকলে, আমরা বেশ নিশ্চিন্তে মাথা ফাটাফাটি করতে পারব।'

স্থনীল হেসে বলল, 'আর কিছু না পারুক মাথা ফাটাতে ভন্টু খুব ওস্তাদ। ও কি, আপনি সত্যিই চলে যাচ্ছেন না কি মালাদি?'

মালা বলল, 'যাচ্ছিনে, চায়ের ব্যবস্থা ক'রে আসছি। তোমাদের মিটিং শুরু ক'রে দাও।'

শীতাংশু বলল, 'শুরু আবার করব কি। শুরু তো হয়েই গেছে। কি বলেন, মণিদা?'

কিন্তু মণিময়ের মুখের গাম্ভীর্য দেখে সবাই একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। ব্যাপারটাকে সে এমনভাবে হেসে উড়িয়ে দিতে চায় না। সে সত্যিই কিছু করতে চায় এবং করাতে চায়।

২৩

চায়ের লোভেই হোক আর আড্ডার লোভেই হোক, মণিময়ের রোড-কমিটির বৈঠক বেশ জমে উঠল। শুধু স্কুল কলেজের কয়েকজন ছাত্রই নয়, আশেপাশের দু' চারজন বয়স্ক ভদ্রলোকও এই বৈঠকে যোগ দিলেন। এঁদের মধ্যে সবাই জবরদখল কলোনীর বাসিন্দা নন, কলোনীর বাইরে নিজের টাকায় জায়গা-জমি কিনে বাড়িঘর তুলেছেন এমন কয়েকজন গৃহস্থও আছেন। এ অঞ্চলে মর্যাদা এবং প্রভাব প্রতিপত্তি এঁদেরই বেশি। ডাক্তার রামগোপাল মুখুয্যে এঁদের একজন। মোটাসোটা চেহারা। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। লোকে আড়ালে আবডালে বলে, আসলে উনি ডাক্তারি পাশ করেননি। শুধু বুদ্ধি আর বিচক্ষণতার জোরে পসার জমিয়েছেন। পাশ-করা ডাক্তারদের চেয়ে উদ্বাস্তু কলোনীগুলির মধ্যে ওঁর পসার বেশি। যদিও কীর্তিপুরের অভিজাত পাড়ায় এম. বি. পাশ ছোকরা ডাক্তার সুকুমার মিত্রই সবচেয়ে বেশি কল পায়—আর ইদানীং কলোনীর মধ্যেও তাকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। তবু এখন পর্যন্ত রামগোপালের হাতযশ যথেষ্ট, আর ডাক্তারিতে এই হাতের ওপরই কপাল। শুধু লম্বা ডিগ্রী আর বড় হরফের সাইন-বোর্ড থাকলেই ডিসপেনসারিতে রোগীর ভিড় হয় না। ওষুধের মধ্যে যে মন্ত্রের জোর আছে তার প্রমাণ দিতে হয়। প্রতিযোগিতায় সুকুমারের দিক থেকে রামগোপালের আশঙ্কার কোন কারণ নেই। তাঁর ক্ষেত্র আলাদা, ভিজিটের হারও কম। তবু রামগোপাল এখন থেকেই সতর্ক হচ্ছেন। রবীন্দ্রজয়ন্তী, সর্বজনীন দুর্গা, কালী, সরস্বতী পুজো কিংবা যে কোন ধরনের সভাসমিতিতে ডাক পড়লেই তিনি উপস্থিত হন। অনেক সময় না ডাকলেও তিনি নিজেই ছেলেদের ডেকে খোঁজ-খবর নেন। বাজারে কি রাস্তার মোড়ে পাড়াপড়শীদের সঙ্গে দেখা হলে মিষ্টি ভাষায় কুশল প্রশ্ন

করেন। সবাই লক্ষ্য করে, আগে এতটা সামাজিক আর সমাজহিতৈষী ছিলেন না রামগোপালবাবু। কণ্ঠস্বরেও এতটা মাধুর্য ধরা পড়ত না। সুকুমার এ পাড়ায় ঢুকে পড়বার পর থেকে তাঁর স্বভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। খুব সাবধানে রোগীদের কাছে তিনি সুকুমারের নিন্দাও করেন। হেসে হেসে খানিকটা সস্নেহ প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে বলেন, 'সুকুমার বেশ চালাকচতুর, চটপটে, সেকথা হাজার বার স্বীকার করি। কিন্তু শুধু স্মার্ট হলেই ভালো ডাক্তার হওয়া যায় না। বরং ওকালতির ব্যাপারে ওটা সদ্‌গুণ। পেটে তেমন কিছু থাক আর না থাক, মুখে কথা ফুটলেই হ'ল। কিন্তু শুধু মুখ থাকলেই ডাক্তারী করা যায় না। এতে মাথার দরকার। স্থির বুদ্ধির দরকার। সে বুদ্ধি অবশ্য বয়সের সঙ্গে আসে। সুকুমারের বয়সই বা এমন কি।'

পাকিস্তানের বাড়িঘর সময় থাকতেই রামগোপাল বিক্রি করেছিলেন। সেই টাকায় এখানে বিঘাখানেক জায়গা কিনে বাড়ি করেছেন। ফুল আব তরকারির বাগান করেছেন। ডাক্তার হিসেবে তিনচার বছরের মধ্যে যেভাবে পসার জমিয়ে তুলেছেন তাতে ওঁর বিদ্যাবুদ্ধির তারিফ করতে হয়। রামগোপালবাবু সুকুমারেব মত স্যুট পরেন না। ধুতি পাঞ্জাবি পরেই কলে বেরোন। থাকেনও খুব অনাড়ম্বর সাদাসিধেভাবে।

রোড কমিটির প্রেসিডেণ্ট হিসেবে যখন রামবাবুর নাম প্রস্তাব করা হ'ল কেউ আপত্তি করল না। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে পাবে এমন আর কে আছে এখানে। রামবাবুই বরং মৃদু প্রতিবাদ ক'রে বললেন, 'দেখুন, ওসব পদটদ আমাকে দেবেন না। পদই হচ্ছে বিপদের কারণ। আমাকে এমনিই কমিটির মধ্যে রাখুন। আমি সাধ্যমত আপনাদের সেবা করব। আমার ডিসপেনসারি-ঘর রয়েছে। তাছাড়া, ওর পাশের ঘরটাও তো প্রায় খালি পড়ে থাকে। যদি দরকার বোধ করেন আপনাদের কমিটির মিটিং মাঝে মাঝে সেখানেও করতে পারেন মণিময়বাবু।'

মণিময় বলল, 'নিশ্চয়ই। ঘরটা আমরা আপনার কাছে থেকে চেয়ে

নেব ভেবেছিলাম। আপনি না চাইতেই অনুমতি দিলেন। প্রেসিডেন্টের বাড়ি আমাদের স্থায়ী অফিস হবে।'

ভাইস-প্রেসিডেন্ট হলেন দু'জন। সদানন্দ সাধুখাঁ। বড় রাস্তার মোড়ে মুদি দোকানের মালিক। উদ্বাস্তু নন। এখানকার পুরোন বাসিন্দা। খাটো ধুতি আর ময়লা ফতুয়া পরে বেড়ালেও ওঁর জমিজমা আর পাকা বাড়ি আছে। বিষয়-বুদ্ধির কথাও সবাই স্বীকার করে। দু' নম্বর ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসাবে বীরনগর কলোনীর প্রেসিডেন্ট জিতেন বিশ্বাসের নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু সে কিছুতেই রাজী না হওয়ায় এম. ই. স্কুলের হেডমাস্টার সুধাংশু পোদ্দারকেই পদটি দেওয়া হ'ল। এবার সেক্রেটারী নির্বাচনের পালা। ছাত্র আর অল্পবয়সী ছেলেরা একবাক্যে মণিময়ের নাম করল। মণিময় বলল, 'আমি তো আপনাদের সঙ্গে আছিই। এখানকার যাঁরা স্থায়ী বাসিন্দা তাঁদের কাউকে সেক্রেটারী করুন। যাঁরা দিনরাত থাকবেন—'

সুনীল আর শীতাংশুর দল আপত্তি করে বলল, 'দিনরাত থাকাটাই বড় কথা নয় মণিময়দা। যিনি দিনরাত এ নিয়ে ভাববেন, কাজ করবেন তাঁর ওপরই সব দায়িত্ব থাকবে। আমরা আপনাকে এভাবে এড়িয়ে যেতে দেব না।'

বামগোপালবাবু নিজেই শেষ পযন্ত বিতর্কের মীমাংসা ক'রে দিলেন। তিনি বললেন, 'মণিময়বাবু যে সবকিছুর মূলে, তাঁর উৎসাহে আর কিছু না হোক আমরা এখানে পাঁচজনে জড হয়েছি, রাস্তার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি; তবু তিনি এ অঞ্চলেব বাসিন্দা না হওয়ায় যদি কোন অসুবিধা দেখা দেয়, তাই আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

সুনীল বলল, 'বলুন।'

রামগোপালবাবু বললেন, 'আমি বলি মণিময়বাবু আমাদের জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে থাকুন। অবশ্য উনিই সব করবেন, করাবেন। আর সদাসর্বদা আমরা যাকে হাতের কাছে পাব তেমন একজনকে আমরা সেক্রেটারী করে রাখি।'

মণিময় বলল, 'তাহলে আমাদের শীতাংশুকে—'

রামগোপালবাবু হেসে বললেন, 'এটা ঠিক আপনার মত বিচক্ষণ লোকের কথা হ'ল না মণিময়বাবু। শীতাংশু শত হ'লেও ছাত্র, বয়স অল্প। তাছাড়া পড়াশুনার চাপ আছে, পরীক্ষার ভাবনা আছে। ঘাড়ে আরো পাঁচরকমের দায়িত্ব চাপিয়ে ওকে অসুবিধেয় ফেলা কি ঠিক হবে। তার চেয়ে আমাদের সুবিনয় চক্রবর্তীর কথাটা আপনারা ভেবে দেখতে পারেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কালো ছিপছিপে একটি যুবক প্রতিবাদ ক'রে উঠল, 'না না ডাক্তারবাবু, আমাকে এর মধ্যে টানবেন না। আমি বাইরে থাকি সেই ভালো।'

বছর তিরিশেক বয়স হবে সুবিনয়ের। ব্যাকব্রাশ-করা চুল। চোখে মুখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ। রামগোপালবাবু বললেন, 'বাইরে থাকবে কেন। বরং ভিতরে থাকলেই তুমি ভালো কাজ করতে পারবে। বলা কওয়া, বক্তৃতা দেওয়া তোমার বেশ অভ্যাস আছে। সরকারী আফিস টাপিসগুলির সঙ্গেও জানাশোনা আছে তোমার। কাজ করতেও পার। সেক্রেটারী পদের তুমিই যোগ্য লোক সুবিনয়।'

স্টেশনের ধারে একটি স্টেশনারি দোকান আছে সুবিনয়ের। স্কুল সীজনে পাঠ্য বই-টইও রাখে। কেউ কেউ বলে, ডাক্তারবাবুর কিছু অংশ আছে দোকানের। কেউ বলে, অংশ নয়, শুধু মূলধনের সুদ নেন তিনি। কারো ধারণা, বিপত্নীক রামগোপাল সুবিনয়ের তরুণী স্বাস্থ্যবতী বোন সুলতার পাণিপ্রার্থী। সেইজন্যই ওর ওপর তাঁর স্নেহের মাত্রাটা বেশি। কিন্তু তার যোগ্যতার কথাও অবশ্য অনেকে স্বীকার করে থাকেন। সভা-সমিতি সংগঠনের কাজে সুবিনয়ের দক্ষতা আছে। কল্যাণ পাঠচক্র নামে একটি লাইব্রেরীও সে এর মধ্যে গড়ে তুলেছে। এই পাঠচক্রকে কেন্দ্র করে ছোট-খাট একটি দলের অধিপতি সুবিনয় চক্রবর্তী।

সুবিনয়ের নাম ওঠায় মণিময় ব্যাপারটা একটু চিন্তা করে দেখল। এর আগে ওই কল্যাণ সঙ্ঘের কোন ছেলেকে মণিময় পায়নি। তারা একটু দূরে

দূরেই রয়েছে। বেশ বোঝা গেছে, শীতাংশুদের দলের সঙ্গে তাদের একটা রেষারেষি আছে। মণিময়ের মনে হল, এই উপলক্ষে ওই দলটিকে যদি হাতে পাওয়া যায় তাহ'লে জনবল আরো বাড়বে। একসঙ্গে কাজ করতে করতে দলাদলির তীব্রতাটাও কমে আসবে।

তাই শীতাংশু আর সুনীলের গম্ভীর মুখ চোখে পড়া সত্ত্বেও মণিময় রামবাবুর কথায় সায় দিয়ে বলল, 'আচ্ছা তাই হবে। আপনাদের যদি সবাইর মত থাকে সুবিনয়বাবুই সেক্রেটারী হবেন রোড কমিটির।'

সুবিনয় হেসে বলল, 'মণিময়বাবু একটা কথা বলব।'

'বলুন।'

সুবিনয় বলল, 'আমরা যা করছি তা যেন ঘোড়ার আগে গাড়ি জোড়ার মত হচ্ছে। রাস্তা কি ক'রে হবে, টাকা পয়সার সংস্থান কোত্থেকে করব, আসুন আগে আমরা তাই ঠিক করি। কমিটি টমিটি নিয়ে মাথা ফাটাফাটি পরে করলেও চলবে। তার আগে কাজটা কিছুদূর এগিয়ে দেওয়া যাক।'

মণিময় বলল, 'ঠিক বলেছেন, কাজটাই লক্ষ্য। বিনা কাজে কমিটি ফরম করাটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে কাজের সুবিধের জন্যই আমাদের এ ধরনের কিছু একটা করে নেওয়া দরকার। না হ'লে বাইরে পাঁচজনের কাছে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা মুশকিল হয়। তারপর দরকার মত এ কমিটি আপনারা ফের ঢেলে সাজতে পারবেন।'

বুড়ো সাধুখাঁ মশাই বললেন, 'কলকের তামাকের মত। ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন মণিময়বাবু। আপনাদের এখানে তামাক টামাকের বুঝি কোন ব্যবস্থা নেই?'

সুবিনয় শীতাংশুদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, 'এখানে সবই আগুন। তামাকেরই শুধু অভাব আছে।'

রামগোপালবাবু বললেন, 'না না, অভাব কেন থাকবে সাধুখাঁ মশাই। এই নিন আসুন।' পকেট থেকে তিনি দেশলাই আর সিগারেটের প্যাকেট বার করে ধরলেন।

সিগারেট ধরিয়ে সাধুখাঁ বললেন, 'বুড়ো মানুষের একটা পরামর্শ যদি শোনেন মণিময়বাবু তো বলি।'

'বলুন।'

সাধুখাঁ বললেন, 'আপনার নাম শুনেছি। আর মানুষটিও যে খুব কাজের তা-তো চোখেই দেখতে পাচ্ছি। বিয়ে থা করে আর পাঁচজনের মত গণ্ডায় আণ্ডা মিলিয়ে আপনি নিজের ঘরে কায়েমী হয়ে বসেননি। দশজনের উপকারের জন্যে ঘর থেকে বেরিয়েছেন। সকলের জন্য প্রাণ কাঁদে বলেই বেরোতে পেরেছেন। আপনার মত মানুষ হয় না।'

মণিময় লজ্জিত হয়ে বলল, 'অত প্রশংসা করবার মত কিছু নেই সাধুখাঁ মশাই। আপনার পরামর্শের কথা এবার শুনি।'

সাধুখাঁ শান্তভাবে বললেন, 'আপনার এই রাস্তা টাস্তার মতলব ছাড়ুন। দু' মাইল পাকা রাস্তা তৈরি করা কি সোজা কথা? এ কি দু' চার শ' কি দু'চার হাজার টাকার কাজ। এই রিফিউজিদের ভিতর থেকে এত টাকা আপনি তুলবেন কি করে? পুজো পার্বণে দু' আনা চার আনা চাঁদাই এদের কাছ থেকে আদায় করা শক্ত আর কিনা আপনি সড়ক বানাবেন?'

সদ্যনির্বাচিত ভাইস-প্রেসিডেণ্টের মুখ থেকে মণিময় এমন নৈরাশ্যের কথা আশা করেনি। সে হঠাৎ কোন জবাব দিল না।

সাধুখাঁ বলতে লাগলেন, 'মুদি দোকান চালিয়ে বুড়ো হয়ে গেলাম। মনে করবেন না শুধু চাল ডাল তেল নুন নিয়ে কারবার করেছি, আর কিছু চিনিনি। ব্যবসা চালাতে হ'লে সবচেয়ে বেশি কারবার করতে হয় মানুষের সঙ্গে। আমরা ব্যবসায়ীরা পাঁচরকম মানুষকে যেমন চিনি, আপনারা তা চিনবেন কোত্থেকে। তাই বলি, কাজ করতে নেমেছেন সত্যিকারের কাজ করুন। বুঝে শুনে কাজ করুন। যেখানে যা মানায়, যা রয়সয় তাই করুন মণিময়বাবু। ভালো স্কুল করুন, হাসপাতাল করুন। কাজের কি অভাব আছে নাকি।'

মণিময় বলল, 'আপনার কথা ভেবে দেখব সাধুখাঁ মশাই।'

'হ্যাঁ, ভেবে দেখবেন। আপনারা বুদ্ধিমান মানুষ। একটু ভাবলেই সব বুঝতে পারবেন। কি সম্ভব, কি অসম্ভব তা টের পাবেন। আপনার এত কষ্ট, এত মেহনত জলে না যায় মণিময়বাবু, আমার সেই ভয়।'

মণিময় বলল, 'আপনার উপদেশের কথা আমরা মনে রাখব, সাধুখাঁ মশাই। যদি তেমন বুঝি রোড কমিটিকে স্কুল কমিটি, কি হাসপাতাল কমিটি করে নিলেই হবে। আপনাদের আশীর্বাদে আমরা এখানে সবই করব, স্কুলও করব, হাসপাতালও করব। কিন্তু তার আগে রাস্তার কথাটাই ভাবছি। এ আমাদের কাজে নামবার রাস্তা, কাজ শুরু করবার রাস্তা। শুধু পায়ে হাঁটবার রাস্তা নয়। আমরা যাই করি, আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন, আপনার উপদেশ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবেন, এ আশা নিশ্চয়ই করতে পারি।'

সাধুখাঁ বললেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। যখনই ডাকবেন তখনই হাজির হব। তা'তে কোন সন্দেহ রাখবেন না মণিময়বাবু।'

এর পর প্রবীণরা আস্তে আস্তে বিদায় নিলেন। সাধুখাঁ পথে যেতে যেতে রামগোপালবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কি ধারণা ডাক্তারবাবু?'

রামগোপালবাবু বললেন, 'আমার ধারণা, মণিময় একটা বদ্ধ উন্মাদ। নিতান্ত ছেলেমানুষ। বিয়ে-থা না করলে, ঘর-সংসার না করলে কেউ কেউ ওই রকমই থেকে যায়। তাদের গ্রোথ হয় না।'

সাধুখাঁ হেসে বললেন, 'তাহ'লে আপনি জেনে শুনে ওইসব ছেলেমানুষের দলে নাম লেখালেন যে।'

রামগোপাল বললেন, 'কি করব মশাই। দশে চক্রে ভগবানকে পর্যন্ত ভূত হতে হয়। কমিটিতে একজন ডাক্তারকে ওরা নেবেই। আমাকে যদি না পায় সুকুমারকে ওরা ডেকে নেবে।'

সাধুখাঁ হেসে বললেন, 'আপনার কোন ভাবনা নেই। রাস্তা টাস্তা কিচ্ছু হবে না ডাক্তারবাবু। দু' দিন বাদে সবাই যে যার পথ দেখবে। তবে ট্যাঁক থেকে যতদিন পয়সা খসাতে না হয় কমিটিতে নাম রাখতে আপত্তি কি।'

প্রেসিডেণ্ট ভাইস-প্রেসিডেণ্ট দু'জনে একমত হয়ে যাঁর যাঁর বাড়ির পথ ধরলেন।

মণিময়দের মিটিং তারপরেও অনেকক্ষণ অবধি চলল। কাগজ কলম নিয়ে একটা পিটিশনের খসড়া করে ফেলল মণিময়। সরকারের ওয়ার্কস এণ্ড বিল্ডিং ডিপার্টমেণ্টের কাছে কীর্তিপুরের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে সবিনয়ে আবেদন জানাল। এতগুলি মানুষের যাতায়াতের অসুবিধার কথা, বর্ষাকালে জলে কাদায় চরম দুরবস্থার কথা খুঁটে খুঁটে বর্ণনা করল। তাদের বক্তব্য যে যথার্থ তা চোখে দেখে যাওয়ার জন্যে উপযুক্ত সরকারী কর্মচারীকে আহ্বান জানাল। একটু অদল-বদল ক'রে এই আবেদনেরই দু' তিন রকমের খসড়া তৈরী হ'ল কলকাতার খবরের কাগজগুলির জন্যে। এক দফা ইংরেজী, কয়েক দফা বাংলা। মণিময়ের মুসাবিদায় মুনশীয়ানা দেখে সবাই তারিফ করল। সুবিনয় উচ্ছ্বসিত হল সবচেয়ে বেশি। সুখ্যাতি ক'রে বলল, 'মণিময়বাবু, পিটিশনের হাত আপনার সত্যিই পাকা, এমন দরখাস্ত লিখতে আমাদের অন্তত তিনটে কলম ভাঙত।'

দলবল নিয়ে সুবিনয় বিদায় নেওয়ার পর শীতাংশু বলল, 'মণিময়দা, কিছু মনে করবেন না, আপনাকে একটা কথা বলব।'

মণিময় হেসে বলল, 'বল।'

ওরা কি বলবে মণিময় তা জানে। তবু ওদের মুখ থেকে কথাটা আর একবার শুনতে চায়।

শীতাংশু বলল, 'ওই কল্যাণ সঙ্ঘ আমাদের সঙ্গে চিরকাল শত্রুতা করে এসেছে। ওরা লাইব্রেরী করেছে, আমাদের ডাকেনি। ওদের কোন ফাংশনে আমাদের যেতে বলেনি। বরং আমাদের ফাংশন ওরা দু' দুবার ঢিল ছুঁড়ে ভেঙে দিয়েছে। সেই কল্যাণ সঙ্ঘের সেক্রেটারীকে আপনি রোড কমিটির খোদ সেক্রেটারী করে দিলেন। এর পর আর আমাদের থাকা চলে না মণিময়দা। নিজেদের দলের কাছে আমরা আর মুখ দেখাতে পারব না।'

ভণ্টু মুখ ভার ক'রে বলল, 'আমাদের বাধ্য হয়ে রিজাইন করতে হবে মণিময়দা।'

সুনীল বলল, 'তুই থাম ভণ্টু, আর জ্বালাসনে। আমাদের কারোরই নাম কমিটিতে নেই। ছাত্র আর ছেলেমানুষ এই অজুহাতে আমাদের সবাইকে ওঁরা বাদ দিয়েছেন। বড়দের মানে শুধু বুড়োদের রেখেছেন কমিটিতে। তা রাখুন, কিন্তু ওই কল্যাণ সঙ্ঘকে আনলেন কেন।'

মণিময় বলল, 'নইলে ওরা অকল্যাণ আনত। শীতাংশু, সুনীল, আমার কথা শোন তোমরা। রাস্তার কাজটা একা কল্যাণ সঙ্ঘের নয়, তোমাদের শক্তি সঙ্ঘেরও নয়। সব সঙ্ঘকে সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে হবে, তবে যদি কিছু করে ওঠা যায়।'

সুনীল বলল, 'কিন্তু ওদের সঙ্গে আমাদের কিছুতেই মিলবে না। তেলে জলে কোনদিন মেলে? আপনি সে চেষ্টা করবেন না মণিময়দা। তা'তে মিছিমিছি অনর্থ হবে।'

মণিময় একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা, শুধু রাস্তার কাজ তোমরা এক সঙ্গে কর। পুজো পার্বণ, জয়ন্তী টয়ন্তী আলাদা আলাদাভাবে করলেই হবে।'

তারপর ভণ্টুকে কাছে ডেকে তার পিঠে হাত রেখে মণিময় বলল, 'এই কমিটিতে তোমাদের নাম অবশ্য দেওয়া যায়নি ভণ্টু। তাই ব'লে ভেব না, কাজ থেকে তোমাদের বাদ দি'য়ছি। নাম যাদেরই থাকুক, কাজ তোমরাই করবে। সেই প্রথম দিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে পেনসিল দিয়ে কাগজের টুকরোয় যে নামগুলি লিখে নিয়েছিলাম তার এক ও আমি ভুলিনি ভণ্টু। এ কমিটির কত অদল-বদল হবে, কিন্তু সেই লিস্ট থেকে একটি নামেরও নড়চড় হবে না, একথা জেনে রেখ।'

তখনকার মত শীতাংশুরা বিদায় নিল। ওদের পুরোপুরি খুশি করতে পারেনি একথা বেশ বুঝতে পারল মণিময়। কিন্তু উপায় কি। ছেলেদের এই দলাদলিকে আর বিবাদকে সে অন্তত প্রশ্রয় দিতে পারে না। এদের নীতি-

গত আদর্শগত যে কোন বিরোধ আছে তা নয়। শুধু ব্যক্তিগত আধিপত্যের স্পৃহায় এরা আলাদা আলাদা দল বেঁধেছে আর প্রাণপণে দলাদলি করছে। মণিময় ভাবল, এই ছেলেমানুষী শুধু ছেলেদের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। বয়স্কদের দলাদলিও প্রায় এই ধরনের। রাজনৈতিক হোক আর অরাজনৈতিকই হোক, দলভেদের মূলে নীতির ভেদ সামান্য, মতের ভেদ সামান্য, ব্যক্তিগত সুবিধা-সুযোগ, খ্যাতি-প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষাটাই বেশি। ছদ্মবেশী এই বাসনাকে স্বীকার করা সহজ নয়, চিনতে পারা সহজ নয়, ত্যাগ করতে পারা আরো কঠিন। রাজনীতির নেতা কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে পারেন কিন্তু অধিপতির সিংহাসন ছাড়লে তাঁর রইল কি?

মণিময় ভাবল, শক্তি সঙ্ঘ আর কল্যাণ সঙ্ঘের দলাদলি সে সময়মত মিটিয়ে দেবে। দু' একদিনে হবে না, দু' একটা বৈঠকের ব্যাপারও এ নয়; এক সঙ্গে কাজ করতে করতেই ওদের বিরোধের শেষ হবে ব'লে মণিময় আশা করল।

পরের সপ্তাহে খবরের কাগজের চিঠিপত্রের স্তম্ভে মণিময়ের চিঠি বেরোল। কীর্তিপুরের এই রাস্তাটি যে কত অব্যবহার্য হয়েছে, সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্যে ভালো একটি পাকা রাস্তার প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশি তা মণিময় যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছে এবং রাস্তা তৈরির কাজে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতা আর রাজ্য সরকারের সহানুভূতি কামনা করেছে।

কাগজের এই খোলা চিঠি পড়ে কীর্তিপুরের কয়েকটি চায়ের দোকানে, কল্যাণ সঙ্ঘের লাইব্রেরীতে আর যেসব গৃহস্থ খবরের কাগজ নিয়ে থাকেন তাঁদের বাড়িতে কিছুদিন আলোচনা সমালোচনা হ'ল। বাস আর ট্রেনের নিয়মিত যাত্রীরাও আলাপের একটা নতুন বিষয় পেলেন।

'কি মশাই, রাস্তা তাহ'লে সত্যিই হচ্ছে?'

'আপনিও যেমন। কাগজের এডিটরকে ধরে দুঃখ-দুর্দশার ফিরিস্তি বের করতে পারলেই যদি রাস্তা বেরোত তাহ'লে এতদিন মানুষের বহু রোজগারের রাস্তা খুলে যেত।'

'শুধু রোজগারের দিকটাই ভাবছেন কেন? রাস্তাটা হয়ে গেলে উপকার তো সকলেরই হবে।'

'দেখুন, যারা চালাক মানুষ তারা এক ঢিলে দুই পাখী মারতে জানে। পরের উপকারও করে, নিজের উপকারও করে। তার ফলে পেটও ভরে, আবার নাম-ডাকও হয়।'

'আহা, আগে দেখুনই না ব্যাপারখানা।'

অমিয়ভূষণের বাড়িতেও এই চিঠি নিয়ে ননদ-ভাজে একটু রসালাপ হয়ে গেল। কল্যাণীরই আগে চোখে পড়ল। তিনি কাগজখানা হাতে নিয়ে ননদের কাছে গেছেন। তাকে ডেকে বললেন, 'মণিময়ের চিঠিটা দেখেছ নাকি করুণা?'

করুণা একটু বিস্মিত হয়ে বলল, 'কিসের চিঠি?'

কল্যাণী হেসে বললেন, 'আহা, অমন ক'রে চমকে উঠলে কেন? মুখ বন্ধ করা চিঠি নয়, তাহ'লে তোমার হাতেই আগে পড়ত। খোলা চিঠি, কাগজের সম্পাদককে লেখা। কিন্তু লিখেছে এই কীর্তিপুরের রাস্তা নিয়েই। এত জায়গা থাকতে কীর্তিপুরের রাস্তার দিকে কেন চোখ পড়েছে ভদ্রলোকই জানেন। আর একজন ভদ্রমহিলারও অবশ্য কিছু কিছু জানবার কথা।'

করুণা হঠাৎ চোখ তুলে বলল, 'বউদি এসব ঠাট্টা তামাসার আর কোনো মানে হয় না। তুমি তো জানো, অনেকদিন আগেই সব চুকে বুকে গেছে।'

কল্যাণী কোমলস্বরে বললেন, 'এত সহজেই কি যেতে দেওয়া যায় করুণা। তোমার দাদা বলছিলেন, মণিময়বাবুকে আর একদিন এখানে ডাকবেন।'

করুণা বলল, 'আমি দাদাকে বলে দিয়েছি, ফের যদি তিনি এসব কাণ্ড করেন আমি বাড়ি ছেড়ে পালাব।'

কল্যাণী বললেন, 'কি জানি। আমার তো মনে হয়, এই রাস্তা তোমাদের মিলনের নতুন পথ খুলে দেবে। একা একা তো কেউ রাস্তা বেঁধে তুলতে পারে না। দশজনের সাহায্য তাকে নিতেই হয়। হয়ত এই উপলক্ষে ফের তোমাদের যোগাযোগ হবে।'

করুণা একটু হাসল, 'তেমন কোন্ সম্ভাবনাই নেই বউদি। তাছাড়া যোগাযোগ যদি চাইতাম তাহ'লে উপলক্ষের অভাব হ'ত না। কিন্তু আমি তা চাইনে, মোটেই চাইনে।'

চিঠি বেরোল। সরকারী দপ্তর থেকেও আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকার এল। তারপর ফের সব চুপচাপ। কমিটির মিটিং আর বসে না। রাস্তা নিয়ে কোন দিক থেকে আর কোন সাড়াশব্দ নেই।

সুবিনয় একদিন হেসে বলল, 'আর কি, মণিময়বাবু হয়ে গেল। এবার রোড কমিটির সংকারের জন্যে একটি মিটিং ডাকুন। আমরা মেম্বাররা দই চিঁড়ে দিয়ে ফলাহার ক'রে যার যার বাড়ি ফিরি।'

মণিময় বলল, 'আপনি সেক্রেটারী হয়ে এই কথা বলছেন?'

সুবিনয় বলল, 'না বলে কি করি? সব যে জুড়িয়ে গেল। আর কিছু না হোক, হৈ চৈ করাটা যে দরকার। একেবারে চুপচাপ থাকার চেয়ে মিটিং ডেকে গলা ছেড়ে বক্তৃতা করা ঢের ভালো। অন্তত কমিটির মুখাগ্নি করার অধিকার কার, আমার না আপনার, তাই নিয়ে আমরা একটা বিতর্ক সভা ডাকতে পারি। তাতেও উত্তেজনা কম হবে না।'

মণিময় ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বলল, 'আপনি দেখছি ঠাট্টা ক'রেই সব উড়িয়ে দিতে চান।'

সুবিনয় গম্ভীরভাবে বলল, 'না, তা চাইনে। সত্যিই একটা কিছু করতে চাই। আমরা দু' একখানা চিঠি ছেপে দিব্যি চুপচাপ বসে আছি। লোকে তাই নিয়ে ঠাট্টা করছে। সেই কথাটাই আপনাকে জানিয়ে দিলাম।'

সুবিনয়ের দোকানে বসে কথা হচ্ছিল। মণিময় সেখানে আরো কিছুক্ষণ বসে কি যেন ভাবল। তারপর বলল, 'আমি একেবারে চুপচাপ বসে আছি তা ভাববেন না। যেটুকু করবার তা ক'রে যাচ্ছি। তবে লোককে দেখাবার মত কিছু করা দরকার। একথা আপনি ঠিকই বলেছেন।'

আরো দিনকয়েক বাদে মণিময় রোড কমিটির সদস্যদের জানিয়ে দিল, তার আমন্ত্রণে পূর্ত বিভাগের উপমন্ত্রী স্বয়ং কীর্তিপুর দেখতে আসছেন। রাস্তার

অবস্থাটা তিনি নিজের চোখে দেখবেন। এখানকার বাসিন্দাদের অভাব-অভিযোগের কথা নিজের কানে শুনবেন। তারপর সরকারী তরফ থেকে কতদূর কি করতে পারবেন না পারবেন নিজের মুখেই জানিয়ে যাবেন সেকথা। কীর্তিপুরের বাসিন্দারা যেন তাঁকে যথোচিত অভ্যর্থনা করবার জন্তে তৈরি হয়।

খবরটার মধ্যে সত্যিই উত্তেজনা ছিল। এর আগে কোন রাজপুরুষ এ অঞ্চলে আসেননি। মণিময়ের ক্ষমতা সম্বন্ধে যাদের সন্দেহ ছিল, যারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে শুরু করেছিল তারা পর্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠল। উৎসাহী শীতাংশু, সুনীল আর ভন্টুর দল মণিময়কে ঘিরে ধরল। প্লাকার্ডে, পোস্টারে রাস্তার তুদিকের কোন একটি গাছও আর অনাচ্ছাদিত রইল না।

॥ ২৪ ॥

বাড়ির দেওয়ালে, ঘরের বেড়ায়, গাছের গায়ে যত পোস্টারই পড়ুক উচ্চ-পদস্থ কোন রাজপুরুষ যে সত্যিই এ অঞ্চলে আসবেন অনেকেই তা বিশ্বাস করল না। জিতেন বিশ্বাস আর তার দলের লোকেরা বলে বেড়াতে লাগল, 'ওসব মণিময়ের একটা চাল। লোককে হকচকিয়ে দেওয়ার ফন্দি। সময়কালে দেখা যাবে উপমন্ত্রী টুপমন্ত্রী কারোরই দেখা নেই। মণিময় ঘটক সামনে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে জানাবে—আমরা বড়ই দুঃখিত অনিবার্য কারণে…'

মালাদের বাড়িতে, সুবিনয়ের চায়ের দোকানে কোনদিন বা রোডকমিটির প্রেসিডেন্ট রামবাবুর বৈঠকখানায় মণিময়ের দলের ছোট ছোট বৈঠক বসে। শীতাংশু বলে, 'শুনেছেন মণিময়দা, জিতেন বিশ্বাসরা আমাদের বিরুদ্ধে কি ভাবে লেগেছে?'

মণিময় হেসে বলে, 'লাগুক।'

শীতাংশু বলে, 'আপনি তো বলছেন লাগুক। ওদের প্রোপাগাণ্ডায় যে বার আনি লোক বিশ্বাস করছে।'

মণিময় বলল, 'করুক। আমরা যদি কাজ করতে পারি ষোল আনি লোক আমাদের দলে আসবে এই বিশ্বাস তোমাদের থাকলেই যথেষ্ট।'

এর পর জিতেন বিশ্বাসের এই বিরোধিতার কারণ নিয়ে দলের মধ্যে গবেষণা চলে। জিতেন যে কমিটির মধ্যে একজন হর্তাকর্তা হতে চেয়েছিল তাতে কারো সন্দেহ নেই। মণিময় বলেছিল, 'বেশ তো, উনি যদি সেক্রেটারী হয়ে খুশী থাকেন তাই হোন না। আমাদের কাজ নিয়ে কথা। কাজ হলেই হল।'

কিন্তু জিতেন বিশ্বাস তাতেও রাজী নয়, সে দলে আসবে না, দলের

বাইরে থেকে দলাদলি করবে। তাকে বাদ দিয়ে কে এখানে কি গড়ে তোলে তা পরখ করে দেখবে।

সুবিনয় বলল, 'জিতেনবাবু একাই মাঠে নেমে গোল দিতে চান, আর কারো সহযোগিতা চান না। নিজের বাহুবলে দেশোদ্ধার হয় তো হোক, না হয় সে দেশ গোল্লায় যাক, এই বোধ হয় ওঁর মটো।'

মণিময় বলল, 'যাক্, সুবিনয়বাবু, অন্যের সমালোচনা করে লাভ কি। তার চেয়ে নিজেদের কাজের আলোচনা ভালো।'

সুবিনয় হেসে বলল, 'মণিময়দার কেবল কাজ আর কাজ। কিন্তু দাদা, কাজের মধ্যে যদি কিছু বাজে কথার আমদানী না করা যায় তাহলে কি আর সে কাজে কোন রস থাকে? মজুরদের ছাদ পিটানো দেখেছেন তো? মজুরনীদের গানের অশ্লীলতায় যত কড়া পাক লাগে ছাদ তত শক্ত হয়ে বসে। দোহাই আপনার, আমাদের রোড কমিটিতে কিছু পরচর্চা আর খোশগল্পের জায়গা রাখবেন।

মণিময় একটু হেসে ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। কিন্তু এসব কথায় তার অন্তরের সায় থাকে না। তার ধারণা কাজের মধ্যে অকাজের ভেজাল না মেশানোই ভালো। তাতে কাজ এগোয় না। অনর্থক শক্তি সামর্থ্য আর সময়ের অপচয় হয়। মানুষ যখন সত্যিই নিষ্ঠার সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে কাজ করে তখন তার আর মুখের কথার দরকার হয় না, তখন সে হাত দিয়ে কথা বলে।

এই কাজের মধ্যে মত্ত হ[illegible] থাকার, মগ্ন হয়ে থাকার একটা সহজ প্রবণতা মণিময়ের আছে। অফিসে যতক্ষণ থাকে সে কাজে ফাঁকি দেয় না। নিজের কাজটুকু সে মন দিয়ে করে, শুধু তা[illegible] না, অধস্তনদের দিয়ে করিয়েও নেয়। অফিসের একটি সেকশনের অধিপতি মণিময়। পারতপক্ষে তার নিজের সেকশনের সুনাম সে ক্ষুণ্ণ হতে দিতে চায় না। তার ফলে সহকর্মীদের ওপর একটু বেশি চাপ পড়ে। মুখে যাই বলুক, আড়ালে আবডালে তারা মণিময়ের আচার-আচরণে তেমন খুশী হয় না। বিদ্রূপ করে বলে, 'অফিসটা যেন

মণিময়বাবুর বাবার অফিস। পান থেকে চুন খসবার জো নেই, পাঁচ মিনিট লেট হবার জো নেই। হয় কৈফিয়ত চাইবেন,।না হয় লেকচার ঝাড়বেন।'

তা ঠিক। কাজের ফাঁকে ফাঁকে অমনোযোগী অল্পবয়সী সহকর্মীদের সঙ্গে কাজের তত্ত্ব নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা করবার অভ্যাস আছে মণিময়ের। সে বলে, 'দেখুন, কাজটা পরের, কিন্তু চরিত্রটা পরের নয়, তা নিজেরই। অন্যের কাজে যখন আমরা ফাঁকি দিই নিজেদের কাজ করবার ক্ষমতাটাও সেই সঙ্গে নষ্ট করি। বরং যদি মনে হয় এ মাইনেয় আমাদের পোষাচ্ছে না, অফিসের আবহাওয়া পছন্দ হচ্ছে না, এ কাজ ছেড়ে দিয়ে আমাদের আরো ভালো কাজের চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু যতক্ষণ কাজ করব ততক্ষণ যেন তার মধ্যে কোন ফাঁকি না রাখি। কারণ অন্যকে ফাঁকি দিতে আমরা শেষপর্যন্ত নিজেকেই ফাঁকি দিই।'

নৈর্ব্যক্তিক ভাবেই মণিময় অবশ্য তার এই কর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা চালিয়ে যায়। কিন্তু সহকর্মীরা এসব তত্ত্বে মোটেই খুশী হয় না। তাদের ধারণা মণিময় তাদের প্রত্যেককে অকেজো প্রতিপন্ন করবার জন্যেই কাজ সম্বন্ধে এ ধরনের বক্তৃতা দেয়।

কীর্তিপুরে এসে শুধু কাজের নতুন ক্ষেত্রই নয়, কয়েকজন নতুন সহকর্মীও পেয়ে গেল মণিময়। সুনীল, শীতাংসু ও ভণ্টুদের উল্লাস উদ্দীপনা এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা তাকে উৎসাহিত করে তুলল। বাধাবিঘ্ন আর লোকের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বরং মণিময়ের জেদ ও রোখ আরো বাড়িয়ে দিল।

সরকারী মহলে মণিময়ের তেমন যাতায়াত ছিল না। অবশ্য সেখানে গেলে অনেক পরিচিত ও রাজনৈতিক জীবনের সহকর্মীদের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যাবে এ কথা সে জানে। কিন্তু দেখা হলেই যে তাঁরা সেদিনের সেই সৌহার্দ্যকে স্বীকার করবেন এবং তার অনুরোধ রেখে তাকে সাহায্য করতে রাজী হবেন সে সম্বন্ধে মণিময় নিশ্চিন্ত হতে পারল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিশ্চেষ্ট হয়ে রইল না মণিময়। খোঁজখবর নিতে নিতে এমন দু'একজন বন্ধুর সন্ধান পেল যাঁদের সঙ্গে পূর্তবিভাগের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। বার

বার দেখাসাক্ষাৎ অনুরোধ উপরোধের‘‘পর শেষ পর্যন্ত উপমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। আসবার তারিখও তিনি স্থির করে দিলেন।

কীর্তিপুরে তাঁকে অভ্যর্থনার আয়োজন চলতে লাগল। শীতাংশু সুনীলরা বলল, ‘খরচের টাকাটা আমরা চাঁদা করে তুলে দিই।’

কিন্তু মণিময়ের প্রধান সহকর্মীরা এতে রাজী হলেন না। মণিময়ও ভেবে দেখল রাস্তা তৈরীর কাজে টাকার জন্যে সকলের কাছে হাত তো পাততেই হবে কিন্তু সামান্য ব্যাপারের জন্যে চাঁদা তুলে ওদের মেজাজ বিগড়ে দেওয়া ঠিক নয়। জলযোগের ব্যয় সভাপতি রামবাবু নিজেই বহন করতে রাজী হলেন। কারণ মাননীয় অতিথিরা তাঁর বাড়িতেই উঠবেন। যাতায়াতের খরচও কিছু লাগবে না। বাকি রইল কলাগাছ আর দেবদারুর পাতা দিয়ে তোরণ তৈরী। তার জন্যে তো উৎসাহী ছেলের দলই আছে। নগদ দু’চার টাকা যা লাগবে তা মণিময়ই দিতে পারবে।

দু’দিন আগে থেকেই তোরণ নির্মাণের কাজ শুরু হল। ঠিক হল সারা রাস্তায় দশটি তোরণ তৈরী করা হবে। এ কাজে ভণ্টুর উৎসাহই সবচেয়ে বেশি। সে বলল, ‘মণিময়দা, তোরণগুলির একেকটা নাম রাখলে হয় না?’

মণিময় হেসে বলল, ‘নামের আর দরকার নেই ভণ্টু। বিনা নামেই আমাদের তোরণগুলি সবাই চিনতে পারবে।’

ঠিক হ’ল সম্মানিত অতিথি যখন গাড়ীতে করে তোরণের ভিতর দিয়ে যাবেন, কীর্তিপুরের অধিবাসীরা দু’দিকে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানাবে। কুমারী কিশোরী মেয়েরা পুষ্পবৃষ্টি আর শঙ্খধ্বনি করবে। তারপর প্রেসিডেণ্টের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাঁকে মাল্যদান ক’রে কপালে চন্দনের ফোঁটা পরান হবে। মেয়েদের নেতৃত্ব করবে মালা। অভ্যর্থনার আরো বিশদ পরিকল্পনায় কমিটির সদস্যরা তার সাহায্য আর পরামর্শ নিলেন।

অতিথিকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে যত বেশি লোক সমাগম হয় ততই উদ্যোক্তাদের কৃতিত্ব। মণিময় অনুষ্ঠানের একদিন আগে সহকর্মীদের নিয়ে প্রত্যেকটি কলোনীর বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে অনুরোধ করে এল, ‘আপনারা

সবাই যাবেন। সবাই দাবি জানাবেন রাস্তার জন্যে। রাস্তা কারো একার নয়, রাস্তা যদি হয় তাতে সবাইর সুবিধা হবে।'

মেয়েদের অনুরোধ করবার ভার নিল মালা। আরো দু' তিনটি সমবয়সী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে সেও মণিময়দের দলের সঙ্গে ঘুরতে লাগল।

ঘুরতে ঘুরতে জিতেন বিশ্বাসের বাড়িতেও উপস্থিত হল মণিময়। গাছ থেকে একটি ছেলেকে দিয়ে ডাব পাড়াচ্ছিল জিতেন, মণিময়কে দেখে একটু গম্ভীরভাবে বলল, 'আসুন, বসুন এসে।'

মণিময় মৃদু হেসে বলল, 'আসব, কিন্তু বসব না। আপনি সবাইকে নিয়ে যাবেন। ওঁকে রিসিভ করবার সময় সামনে থাকবেন।'

জিতেন বলল, 'কিন্তু আমরা তো সামনের সারির মানুষ নই, মণিময়বাবু। যাঁরা সামনে থাকবার যোগ্য, তাঁরাই সামনে দাঁড়াবেন।' মণিময় জিতেনের অভিমান অভিযোগের কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'যাবেন।'

জিতেন বলল, 'যাব বই কি, অবশ্যই যাব। এত বড় একটা কাণ্ড ঘটছে কলোনীতে আর আমরা যাব না?'

ফ্রকপরা বার তের বছরের একটি রোগাটে মেয়ে দোরের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদের কথাবার্তা শুনছিল, আর ব্যাপারটার গুরুত্ব ওজন করবার চেষ্টা করছিল। জিতেন তাকে প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে বলল, 'তুই এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন পুঁটি? যা ভিতরে যা।'

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরে চলে গেল। কিন্তু ওর সেই অপ্রতিভ করুণ দৃষ্টিটুকু যেন চোখে লেগে রইল মণিময়ের।

জিতেনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে সুবিনয় বলল, 'সবাইকে হাতে পায়ে ধরে এত সাধাসাধি আমরা না করলেও পারি। আমার তো মনে হয় এমনিতেই তামাশা দেখবার জন্যে অনেক লোক আসবে, তাদের দোরে দোরে গিয়ে ডেকে আনতে হবে না।'

মণিময় ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'তামাশা! আপনার কাছে ব্যাপারটা বুঝি আগাগোড়া একটা তামাশা বলেই মনে হচ্ছে?'

সুবিনয় হেসে বলল, 'কি মুশকিল। আপনি দেখছি ঠাট্টাও বোঝেন না, তামাশাও বোঝেন না। আমি আপনার আমার মত অসাধারণদের কথা বলছিনে, আপনাদের জনসাধারণদের কথা বলছি। তারা তামাশা পেলে আর কিছু চায় না।'

সুবিনয়ের কথা বলবার ভঙ্গি মণিময়ের পছন্দ হয় না। ও সব সময় একটু কায়দা করে কথা বলতে ভালবাসে। সব কিছুকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে চলায় ওর আনন্দ। অবশ্য তার থেকে নিজেকে এবং নিজের কাজকেও সুবিনয় বাদ দেয় না। যেন শ্রদ্ধা প্রীতি ভালোবাসা ভাবালুতার নামান্তর। বুদ্ধির চরম প্রকাশ যেন শুধু ব্যঙ্গে আর বিদ্রূপে। পৃথিবীর সব কিছুকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেওয়াতেই যেন সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব। জনসাধারণের ওপর সুবিনয়ের মত অমন অনাস্থা নেই মণিময়ের। তাহলে সে নিজে দাঁড়ায় কোথায়? তাহলে তার আত্মবিশ্বাস যে ধ্বসে পড়ে।

সুবিনয়ের কথার জবাবে মণিময় বলল, 'আপনি নিজেকে অসাধারণ মনে করতে পারেন সুবিনয়বাবু, কিন্তু আমি তা করিনে। আমি নিজেকে সাধারণের একজন বলেই জানি। তাই সাধারণের ওপর বিশ্বাসও রাখি।'

সুবিনয় হেসে বলল, 'আমার নামটা আপনারই নেওয়া উচিত মণিময়বাবু। আমি তা দিতে রাজী আছি। কিন্তু আপনি কি তা বদলাতে চাইবেন। আপনার যে বড় সুনাম। আমার শুধু নামেই সু। কিন্তু আপনি যত বিনয়ই করুন আমরা কেউ নিজেদের সাধারণ বলে ভাবিনে। যার পেটেই দু'এক ফোঁটা বিদ্যাবুদ্ধি আছে সে সেই বিন্দু অতল আর অপার সিন্ধু মনে না করে পারে না। তাছাড়া যে গড়পড়তা হিসেবের রেখা আমরা টানি তা কারো মাথার ওপর দিয়েই যায় না। আমরা সেই সুতোর কেউ এধারে কেউ ওধারে। আর সেই সূত্রে আমরা সবই অসাধারণ।'

মণিময় তর্ক করল না। সুবিনয়ের সঙ্গে অত কথা বলতে গেলে কাজ এগোবে না।

উদ্বাস্তু কলোনীগুলি পরিক্রমা শেষ করে সে দলবল নিয়ে কীর্তিপুরে ঢুকল।

শীতাংশু বলল, 'কীর্তিপুরে কি আমাদের যাওয়া ঠিক হবে মণিময়দা? ওখানকার কাউকে তো আমরা কমিটিতে নিইনি। ওরাও কেউ এগিয়ে আসেন নি।'

কীর্তিপুর অমনিতেই উদ্বাস্তুপল্লীগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন। মণিময় যে নতুন রাস্তা করতে যাচ্ছে তার সঙ্গে কীর্তিপুরের কোন যোগ নেই। ও নগরের নাগরিকদের নতুন সড়কে পা ফেলবার তেমন দরকার হবে না। তাই এ সম্বন্ধে ওদের উৎসাহ আগ্রহ প্রায় নেই বললেই চলে। কমিটির মেম্বাররা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা আর পরামর্শ করেই কীর্তিপুরকে বাদ দিয়েছেন। কিন্তু মণিময় আজ নিজে ওদের ডাকবার প্রস্তাব করায় দলের আর সবাই বিস্মিত হ'ল।

সুবিনয়ের ঠোঁটে গূঢ় অর্থব্যঞ্জক একটু হাসি ফুটে উঠল। সে বলল, 'নিশ্চয়ই। ওখানেও যেতে হবে বইকি। রোড কমিটীর সিদ্ধান্তগুলি ছাড়াও পৃথিবীতে আরো অনেক রকমের সিদ্ধান্ত আছে তা আমরা মানি, মণিময়বাবু।'

মণিময় একটু আরক্ত হয়ে উঠল। করুণার সঙ্গে তার যে আলাপ-পরিচয় আছে সে কথা সুবিনয়ও সম্ভবত শুনেছে। তার ইঙ্গিতটা সেইদিকেই। কিন্তু মণিময় তার পরিহাসে ভ্রূক্ষেপ না করে বলল, 'আমরা তো ওদের কাউকে কমিটিতে আনাতে যাচ্ছিনে। গেস্ট হিসেবেই ডাকছি। ওদের মধ্যে বিদ্বান বুদ্ধিমান অনেকেই আছেন।'

সুবিনয় শীতাংশুর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে অথচ মণিময়কে শুনিয়ে বলল, 'আর অন্তত একজন বুদ্ধিমতী।'

কীর্তিপুরের পরিচিত কয়েকটি বাড়িতেও নিমন্ত্রণপর্ব সারলো মণিময়। মৃগাঙ্কদের বাড়িতেও করে এল।

মৃগাঙ্ক কি প্রভাকর কেউ বাড়ি নেই। তাঁদের সরকারকেই বলে আসতে হল। মণিময় একবার আশা করেছিল, তার নাম শুনে হয়ত এনাক্ষী তাকে ভিতরে ডেকে পাঠাবে, কি তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে নিজেই এগিয়ে আসবে। কিন্তু তেমন কিছু হল না। মালা ভিতর থেকে একবার ঘুরে এল। তার মুখ দেখে বোঝা গেল আশানুরূপ আপ্যায়ন হয়নি।

মালা বলল, 'আমাদের যা বলবার বলে এলাম। এখন আসবেন কি না আসবেন ওঁদের ইচ্ছা।'

সুবিনয় বলল, 'আসবেন আবার কোথায়। বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে, ওঁরা সভাও দেখতে পারবেন, সভাপতিও দেখতে পারবেন।'

সব শেষে অমিয়বাবুর বাড়ি। এখানে সুবিনয় আর শীতাংশুরা বিদায় নিল। বলল, 'বেলা হয়ে গেছে। আমরা অন্য জায়গাগুলি ততক্ষণ সেরে ফেলি। আপনারা ওদিকটা সেরে আসুন।' মালাও চলে যাচ্ছিল। মণিময় বলল, 'না না তুমি থাক, তুমি এসো আমার সঙ্গে।'

সাড়া পেয়ে করুণাই এসে দোর খুলে দিল। একবার মণিময়ের দিকে আর একবার মালার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও, তোমরা। এসো।'

গোলমত বাইরের বসবার ঘরখানিতে তাদের ডেকে নিয়ে বসতে দিল করুণা। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'দাদা তো বাড়ি নেই।'

মণিময় বলল, 'আর কমলাক্ষ?'

করুণা বলল, 'চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর টো টো করবার আরো সুবিধে হয়েছে। বন্ধুদের নিয়ে টালিগঞ্জে না কোথায় একটা গানবাজনার কলেজ খুলবে সেই তালে আছে।'

মণিময় বলল, 'তোমার মা আর বৌদি বুঝি ভিতরে ব্যস্ত। নিমন্ত্রণটা তোমাকেই করে যাই তাহলে।'

ওদের কথা বলবার সুযোগ দেওয়ার জন্যে মালা পুবদিকের জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

করুণা সেদিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে কি দেখল। আর হঠাৎ কিসের একটা জ্বালা বোধ করল ভিতরে। এই তরুণী মেয়েটিই কি আজকাল মণিময়ের সব প্রেরণা সব কর্মোদ্যমের মূলে? এ ধরণের কিছু কিছু কানাঘুষা করুণারও কানে গিয়েছে। কিন্তু সে কান দিতে চায়নি। চোখে দেখবার জন্যেই আজ কি তাই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে মণিময়?

নিজের বিরূপ মনোভাবকে মুখের মৃদু হাসি দিয়ে ঢাকতে চেষ্টা করে করুণা বলল, 'কিসের নিমন্ত্রণ? বিয়ের?'

মণিময় এ ধরণের প্রগল্‌ভতা আশা করেনি। একটু বিস্মিত হয়ে বলল, 'না বিয়েও নয়, অন্নপ্রাশনও নয়, রাস্তার। শুনেছ বোধ হয় ডেপুটি মিনিস্টার কাল আসছেন আমাদের এখানে। একটা পাবলিক মিটিং এই উপলক্ষে ডেকেছি। আমাদের রাস্তার ব্যাপারটা—।'

করুণা বলল, 'শুনেছি। কিন্তু ওসব বড় বড় মিটিং-এ আমি গিয়ে কি করব। আমি সাধারণ স্কুল মিস্ট্রেস্‌। ক্লাসরুমের বাইরে আমাদের ঠাঁই নেই।'

মণিময় বলল, 'ঠাঁই করে নিলেই হয়।'

করুণা বলল, 'রক্ষা করো। সে সাধ গেছে। যাকগে, তোমার নিমন্ত্রণের কথা দাদাকে বলব। ভদ্রতার জন্যে, সৌজন্যের জন্যে অনেক ধন্যবাদ।'

ধন্যবাদ ছাড়াও মালাকে ডেকে চা দিতে চাইল করুণা। মালার বাবা-মা'র খবর জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু আলাপটা যে জমল না তা কোন পক্ষেরই বুঝতে বাকি রইল না।

খানিক বাদে ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় নিল মণিময়। সে যখন কাছে আসতে চায় করুণা যেন প্রাণপণে তাকে দু'হাত দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখে। অথচ মণিময় নিষ্ঠুর এমন অভিযোগও করুণার কাচ থেকে তাকে শুনতে হয়েছে। সব গেলেও সব ছেড়ে দিলেও তাদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সৌহার্দ্যের সম্পর্ক থাকে ঐটুকুও বোধ হয় করুণার ইচ্ছা নয়। কীর্তিনগরের সীমানা ছাড়িয়ে আসতে মণিময়ের মনটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ হেঁটে এসে মালা বলল, 'আজ বোধহয় করুণাদির শরীরটা তেমন ভালো নেই মণিমামা। মন-মেজাজ খারাপ এমনও হ'তে পারে।'

করুণাকে দিদি বলার মধ্যে তেমন সঙ্গতি নেই। তা সত্ত্বেও মালা বলে। এ তো আত্মীয়তার সম্পর্ক নয়, বন্ধুত্বের প্রতিবেশিত্বের সম্পর্ক। তবু দু-এক

দিন মণিময় এ নিয়ে একটু-আধটু ঠাট্টা-তামাশা করেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে এইসব খুঁটিনাটি ব্যাপারের কথা মণিময়ের মোটেই মনে পড়ল না। সে অন্যমনস্কের মত বলল, 'হুঁ।'

মালা আরো কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু মণিময়ের ভাবান্তর দেখে থেমে গেল।

পরদিন বিকেল বেলায় ডেপুটি মিনিস্টার কীর্তিপুরে এলেন এবং সব দেখে-শুনে রোড-কমিটির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে চলেও গেলেন। সময়ের অভাবে বড় জনসভায় বক্তৃতা করতে তিনি রাজী হলেন না। তবে এইটুকু মণিময়দের আশ্বাস দিয়ে গেলেন যে, এখানকার রাস্তার কথাটা তিনি বিশেষ ভাবেই ভেবে দেখবেন। তবে কীর্তিপুরের লোকদের একজোট হয়ে অর্ধেক খরচ বহন করতে হবে। তা সে গায়ে খেটেই হোক আর চাঁদা তুলেই হোক। রাস্তার অর্ধেক হবে সরকারী উদ্যোগে আর অর্ধেক বে-সরকারী। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত প্ল্যান আর এস্টিমেট তিনি দাখিল করতে বলে গেলেন রোড-কমিটিকে।

কীর্তিনগরের লোকেরা তাঁকে যেভাবে অভিনন্দন জানাল তাতে তিনি নিজে কতখানি অভিভূত হয়েছিলেন জানা না গেলেও কলোনীর অধিবাসীরা যে অভিভূত হল তাতে কোন সন্দেহ রইল না। এমন চাঞ্চল্য আর এতখানি উৎসাহ উদ্দীপনা এ অঞ্চলে আর দেখা যায়নি। বড় রাস্তার দু'ধারে সারি সারি লোক দাঁড়িয়ে গেল। বেপরোয়া দুরন্ত দুটি ছেলে গাছের ডাল ভেঙে পড়ল। তিন-চারটি কলোনীর কিশোরী মেয়েরা এই প্রথম দলবদ্ধ হয়ে সেজেগুজে রাস্তায় দাঁড়িয়ে শাঁখ বাজাবার সৌভাগ্য লাভ করল।

বাপের অমত সত্ত্বেও জিতেন বিশ্বাসের মেয়ে পুঁটি লুকিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল সেই সারিতে। কিন্তু তার হাতে শাঁখ ছিল না। তার দিকে চোখ পড়ায় মণিময় মালাকে ডেকে বলল, 'ওকে একটা শাঁখ দাও।'

মালা একটু বিব্রত হয়ে বলল, 'বাড়িতে গেলে আর আসতে দেবে না।'

মণিময় বলল, 'আঃ, তোমার বোনের শাঁখটাই কিছুক্ষণের জন্ম দাও না ওকে।'

মালা একটু লজ্জিত হয়ে কোথেকে একটা শাঁখ এনে পুঁটির হাতে তুলে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে হাসি ফুটল পুঁটির মুখে। অনেক ভিড় আর কাজের মধ্যেও সেই হাসিটুকু মণিময়ের চোখে লেগে রইল, এক ফোঁটা মধু পড়ল মনের ভাণ্ডারে। মনে হল, 'এমনি একেকবার একেকজনের ভিতর দিয়েই আমরা অনেকজনকে পাই। সমগ্র জনসমাজকে ধরা-ছোঁয়ার আর কোন পথ নেই।'

২৫

কয়েকদিন বাদে এনাক্ষী শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি এলো। এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি। মাঝখানে কতটুকুই বা পথ। কিন্তু মেয়েকে দেখে অবনী-মোহনের মনে হল ও যেন সত্যিই সাতসমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসেছে। সন্ত-বিবাহিতা মেয়ের দিকে তাকাতে কেমন যেন একটু লজ্জা হয়। সিঁথিতে সিঁদুর পরলে কি মেয়েদের চেহারা এমন করে পালটে যায়? যে সমাজে সিঁদুর পরার প্রথা নেই সেখানে বিয়ের পর কোন মেয়ের পরিবর্তন কি এমন চট করে চোখে পড়ে? না পড়েই পারে না। বিয়ে তো শুধু গৃহান্তর গোত্রান্তর নয়, মেয়েদের পক্ষে জন্মান্তরের মত।

অবনীমোহন মেয়ের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, 'কীরে পুনটুরী, কেমন আছিস?'

এনাক্ষী মুখ নিচু করে বলল, 'ভালোই আছি বাবা।'

অবনীমোহন স্নিগ্ধস্বরে বললেন, 'এখন তো তুই কত বড়লোক। কত বড় বাড়ির বউ। কত দাসদাসী'—।

অবনীমোহন হাসিমুখে মেয়ের দিকে তাকালেন।

'কী যে বল বাবা।'

এনাক্ষী বাবার পড়বার ঘর থেকে সরে এল। তিনি আবার তাঁর বইতে চোখ রাখলেন। কলেজের ছেলেদের পড়াতে হবে। এনাক্ষী ভাবল এতদিন তার শ্বশুর বড়লোক বলেই বরং তার বাবার আপত্তি ছিল। একদিন যা তাঁর চিন্তা আর উদ্বেগের কারণ ছিল আজ তাই তাঁর কাছে হাসি-ঠাট্টার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সত্যিই ব্যাপারটা যদি শুধু কৌতুকেরই হত!

শতদলবাসিনী আড়ালে নাতনীর ি বুক তুলে ধরে বললেন, 'কই

দেখি আমার সোনার পিরতিমার মুখ কেমন ঝকমক ঝকমক করছে দেখি। ওমা, গায়ের গয়নাগুলি সব খুলে রেখেছিস কেন পুনটুরী! ওরা যে সেই জড়োয়া হারটা তোকে দিয়েছে—।'

এনাক্ষী বলল 'তুলে রেখেছি ঠাকুরমা। পরে পরব।'

শতদলবাসিনী বললেন 'পরিস পরিস, আহা মেয়েমানুষের এইতো সুখ! স্বামীর আদর শশুরের আদর সেইতো মেয়েমানুষের সোহাগের স্বর্গ। কিন্তু আমার করুণার জন্তে আর তা হল না।'

ছোট একটু নিঃশ্বাস চাপলেন শতদলবাসিনী।

এনাক্ষী ভাবল মেয়েদের সুখের যে আদর্শ তার মা-ঠাকুরমার মনে স্থায়ী হয়ে রয়েছে সেও যদি সেই সুখকেই সবচেয়ে বড় বলে ভাবতে পারত তাহলে তার কোন দুঃখ থাকত না। কিন্তু এরই মধ্যে এনাক্ষীর সুখের ধারণা বদলাতে শুরু করেছে। শুধু প্রচুর আসবাবপত্র শাড়ি গয়নার প্রাচুর্য কোন মেয়েকে সুখী করতে পারে না। এমন কি স্বামীর আদরও যথেষ্ট নয়। আদর মৃগাঙ্ক তাকে যথেষ্টই করেছে। তাকে তৈরী হবার অবকাশ না দিয়ে তাকে গ্রহণ করবার জন্য উন্মুখ না করে মৃগাঙ্কের অনুরাগের ধারা বন্তার মত যেন বিপুল আবেগে তার ওপর নেমে এসেছে। তার নিষেধ মানেনি, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্য দেয়নি। এনাক্ষীর রুচির সম্ভ্রম রাখেনি। যেন পুরোহিতের দুটি মন্ত্রোচ্চারণের অপেক্ষাতেই এতদিন ছিল মৃগাঙ্ক। সেই মন্ত্র আওড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রজালের মত সে এনাক্ষীকে একেবারে দখল করে বসেছে। সব পুরুষই কি এই রকম? এনাক্ষী জানে না। কিন্তু যে রুচিশীল মার্জিত স্বভাব উদার একটি পুরুষের ধারণা এনাক্ষীর মনে অস্পষ্ট ভাবে রয়েছে তার সঙ্গে মৃগাঙ্কের কোন অংশে মিল নেই। অবশ্য কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের পুরোপুরি মিল হয় না। কিন্তু এতখানি অমিল যে হবে এনাক্ষী তা ভাবতে পারেনি। শোবার ঘরে যে ধরণের কথাবার্তা মৃগাঙ্কের মুখ থেকে শুনেছে এনাক্ষী, যে ধরণের আচার-আচরণ দেখেছে তাতে মানুষটিকে স্থূল রুচির একজন সাধারণ স্তরের লোক ছাড়া তার আর কিছু মনে হয়নি। কিন্তু রুচির স্থূলতা কি

প্রথম দিনের আলাপ থেকে এনাক্ষী লক্ষ্য করেনি! এখন আর ওসব কথা ভেবে লাভ কি। যদি ভুল হয়ে থাকে এনাক্ষীর নিজের দায়িত্বেই হয়েছে। তার জন্যে আর কাউকে সে দোষ দিতে পারবে না। ভেবে লাভ নেই বরং ভাবনার ছায়া যে তার মনে পড়েছে সে কথা লুকোতে হবে।

কল্যাণী বঁটি পেতে তরকারি কুটছিলেন। এনাক্ষী সেখানে এসে বসল। 'মা, আমাকে দাও। আমি কটা আলু কুটে দিচ্ছি।'

কল্যাণী হেসে বললেন, 'না বাপু, তুমি এখন বড় মানুষের বউ। তোমার হাতে দাগটাগ লেগে যাবে। দরকার নেই।'

এনাক্ষী এবার একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'মা, বাড়িতে এসে অবধি কী যে বড়লোক বড়লোক করছ ভালো লাগে না শুনতে!'

কল্যাণী হেসে বললেন, 'বাঃরে হয়েছিস বড়লোক, আর বড়লোক বললেই দোষ হল?' এনাক্ষী আর প্রতিবাদ করল না। বড়লোকের ঘরে মেয়ে দিয়ে মা যে আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন তা নষ্ট করে লাভ নেই। সে সুখে আছে ভেবে বাবা-মা যদি সুখী হন তাতেই এনাক্ষীর সুখ। কী দরকার দুঃখ-দুশ্চিন্তার মধ্যে ডেকে এনে?

কল্যাণী আলুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন, 'তারপর তোর শ্বশুর-বাড়ির গল্পটল্প বল দেখি শুনি।'

'গল্প করবার আবার কী আছে।'

'ওমা, কথা শোন মেয়ের। গল্প করবার আবার কী আছে মানে। নতুন জায়গায় গিয়েছিস, আহা দূরের না হোক বাড়িটা তো নতুনই। সেখানকার হালচাল কেমন, লোকজন কেমন, শ্বশুর-শাশুড়ী কেমন আদর যত্ন করেন বলবি তো?'

এনাক্ষী বলল, 'বলব মা আস্তে আস্তে সবই বলব। এই কদিনের মধ্যে কতটুকু বা জানতে-শুনতে পেরেছি। সব যখন জানব বলব তোমাকে।'

মেয়ের রূঢ় ভঙ্গিতে একটু অবাক হলেন কল্যাণী। কিন্তু যেন লক্ষ্য করেননি কি বুঝতে পারেননি এমনি একটা ভাব তাঁর হাসির মধ্যে ফুটেরইল।

কল্যাণী বললেন, 'হুঁ তাই তুমি বলবে কিনা! একটু পুরোন হয়ে গেলে তোমার শ্বশুরবাড়ির একটা কাকপক্ষীর বিরুদ্ধেও যদি আমরা কোন কথা বলি তুমি ফোঁস করে উঠবে।'

নিজে হেসে মেয়েকে হাসাতে গেলেন কল্যাণী কিন্তু মেয়ে হাসল না।

কল্যাণী বললেন, 'মৃগাঙ্ক ও বেলা আসবে তো!'

এনাক্ষী বলল, 'তাঁর আসবার তো কোন কথা নেই।'

কল্যাণী মুখ টিপে হাসলেন, 'তাইতো এখন তো আর কথাটথা না থাকলে আর আসতে পারে না। আগেকার দিনতো আর নেই। ইচ্ছে হলেই চলে এস। এখন সে এ বাড়ির জামাই। এখন আগে থেকে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ কত কি দরকার হবে। তারপর কয়েকবছর পুরোন হয়ে গেলেই যে কে সেই। তোমার বাবার বেলায় অবশ্য তা হয়নি। তিনি এখনো নতুন জামাইর মতই চলতে চান।'

বাবার স্বভাব সম্বন্ধে এনাক্ষীর কোন ঔৎসুক্য আছে বলে আজ আর মনে হল না। সে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'মা, আমি একটু পিসীমার ঘর থেকে আসছি। দেখে আসি কী করছে পিসীমা।'

কল্যাণী বললেন, 'এসো।'

মনে মনে হাসলেন কল্যাণী। 'ব্যাপার কি তোমাদের। এরই মধ্যে কথান্তর-টথান্তর হয়েছে নাকি—তারই মান অভিমানের পালা চলেছে! ভয় নেই এ বেলার রাগ ও বেলা মিটে যাবে। এ জীবনে কত দেখলাম, কত রাগ করলাম, অভিমান করলাম, ঝগড়া করলাম আবার সে ঝগড়া মিটিয়েও নিলাম—সংসারের নিয়মই এই। একসঙ্গে থাকতে গেলে অমন কত হয়—জীবনভর আরো কত হবে।'

আলু-পটলগুলি কুটে রাখতে রাখতে নিজের অভিজ্ঞতার আলোয় দাম্পত্য জীবনের তত্ত্ব আবিষ্কার করে খুশি হয়ে উঠলেন কল্যাণী। মনে মনে ভাবলেন তাঁর ছেলে-মেয়ের জীবনের ধারাও এমনি পথই নেবে। মোটামুটি একই বাঁধা পথ দিয়ে সবাইকেই হাঁটতে হয়। তাতেই সুখ।

মার কাছ থেকে উঠে এসে এনাক্ষী পিসীমার ঘরে ঢুকল। এঘর এই সেদিন পর্যন্ত তারও ঘর ছিল। আজ আর তা নেই। অবশ্য ইচ্ছা করলে এখনো এনাক্ষী এ বাড়িতে যতদিন খুশি থাকতে পারে কেউ কিছু বলবে না। তবু বিয়ের পর কোন মেয়ে বাপের বাড়িতে বেশিদিন থাকে না, থাকলেও অতিথি হিসাবেই থাকে। সেই আতিথ্যের মেয়াদ বাড়ালে মর্যাদা বাড়ে না। তবু ছেড়ে-যাওয়া এই আধখানা ঘরের জন্যে এনাক্ষীর মন গোপনে গোপনে কেন যেন ব্যাকুল হয়ে উঠল। মনে পড়ল এঘর অনেক শান্তি অনেক তৃপ্তি অনেক স্বাধীনতার স্বাদে ভরা ছিল। এই ছোট ঘরে নিজেকে সে নিবিড়ভাবে অনুভব করতে পেরেছিল। নতুন সুখ এই ঘরখানির মধ্যে যেন পূর্ণ হয়ে ছিল। হাত-ছানিতে সে হাতের মুঠোয় পাওয়া এতদিনের সুখকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।

করুণা ক্লাসের ছাত্রীদের টার্মিনাল পরীক্ষার খাতা দেখছিল, পিছনে পায়ের শব্দ শুনে মুখ ফিরাল। এনাক্ষীকে দেখে হেসে বলল, 'আরে পুনটুরী যে! আয়।'

এনাক্ষী বলল, 'এসে আর কী হবে পিসীমা, তোমরা সবাই কাজে ব্যস্ত।'

করুণা হেসে বলল, 'ব্যস্ত না হয়ে কি উপায় আছে। মেয়েগুলি নম্বর নম্বর করে অস্থির করে তুলবে যে। আগে তুই ছিলি, নম্বরটম্বরগুলি যোগ করে দিতিস। এখন তো আর তা হবার জো নেই।'

এনাক্ষী বলল, 'হবার জো থাকবে না কেন পিসীমা। দাও না যোগ করে দিচ্ছি।'

তারপর একটু চুপ করে থেকে এনাক্ষী বলল, 'পিসীমা, তোমার স্কুলে আমাকে একটা কাজটাজ দাও না জুটিয়ে।'

করুণা ভাইঝির মুখের দিকে একটু তাকিয়ে কী দেখল, তারপর হেসে বলল, 'ওরে বাবা। আমার কাঁধের ওপর কটা মাথা আছে রে পুনটুরী! আমি তোকে স্কুলে চাকরি জুটিয়ে দিই আর তোর শ্বশুর এসে আমাকে একেবারে কাঁচা গর্দান—'

এনাক্ষী বলল, 'কী যে বাজে কথা বল পিসীমা! আমার শ্বশুরই হোক

আর শ্বশুরকুলই হোক কেউ তোমার কিছু করতে পারবে না। তুমি সবাইর ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তোমার মনে কোন কিছুর আঁচ লাগে না। তুমি সংসারে থেকেও সন্ন্যাসিনী আমি সব জানি পিসীমা।'

করুণা ভাইঝির পিঠে সস্নেহে হাতখানা রেখে বলল, 'না রে আমি মোটেই সন্ন্যাসিনী নই। আচ্ছা পুনটুরী, আমাকে একটা কথা সত্যি করে বলবি ?'

এনাক্ষী করুণার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, 'আমি তো তোমার কাছে কখনো কোন মিথ্যে কথা বলিনি পিসীমা।'

করুণার মুখে এসেছিল, 'তুই কি সুখী হয়েছিস ?' কিন্তু সরাসরি কথাটা জিজ্ঞাসা না করে করুণা একটু ঘুরিয়ে বলল, 'ওবাড়িতে তোর কি কোন অসুবিধে হচ্ছে ?'

এনাক্ষী একটু চুপ করে থেকে বলল, 'না, অসুবিধে আর কি।'

করুণা বলল, 'তবে ? আচ্ছা মৃগাঙ্কের সঙ্গে কি তোর কোন—। না, দাদা বউদির মত ঝগড়াঝাটির কথা বলছিনে—এই সাধারণ পছন্দ-অপছন্দ রুচি মতামত এ সব ব্যাপারে কি তোদের মধ্যে কোন অমিল—'

পিসীমা কী জানতে চান এনাক্ষী তা বেশ বুঝতে পারল। কিন্তু সরাসরি জবাব দেওয়াটা তারও ইচ্ছা নয়। আর ইচ্ছা থাকলেই কি সব সময় তা দেওয়া যায় ?

এনাক্ষী বলল, 'যে কোন দুজন মানুষের মধ্যেই তো সেই অমিল থাকতে পারে পিসীমা।'

'তা তো পারেই।'

করুণা ফের খাতা দেখতে বসল।

এনাক্ষী তার কাছে এসে গা ঘেঁষে বসে ছোট মেয়ের মত বলল, 'রাগ করলে পিসীমা ?'

করুণা মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে বলল, 'রাগ করব কেন। খাতাগুলি না দেখে দিতে পারলে আমাদের হেডমিস্ট্রেসই বরং—।'

এনাক্ষী বলল, 'হেডমিস্ট্রেসকে অত ভয় তোমার করতে হবে না। আচ্ছা পিসীমা, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করি। আহা, খাতাগুলি এখন রাখো! পরে দেখলেও পারবে।'

করুণা হেসে বলল, 'আমার ছাত্রীদের জবাবের চেয়ে তোর জিজ্ঞাসটাই দেখছি বেশি জরুরী। বল না কী বলবি।'

এনাক্ষী বলল, 'আচ্ছা ঘর-সংসার ছাড়া কি মেয়েদের কাজের আর জায়গা নেই?'

করুণা হেসে বলল, 'আছে যে আমিই তো তার চাক্ষুষ প্রমাণ। কিন্তু আমার বেলায় যা খাটে তোর বেলায় তা না খাটতেও পারে। তোর পক্ষে হয়তো ঘর-সংসারের মধ্যেই—'

এনাক্ষী বলল, 'পিসীমা তুমি আমাকে একেবারেই পর করে দিয়েছ? আমাকে শুধু শোবার ঘর আর রান্নাঘরের মধ্যে ঠেলে দিতে চাইছ কেন? আমি কি সত্যিই তোমার মাব বয়সী?'

করুণা বলল, 'আমি কেন ঠেলে দেব? যারা ঠেলবার তারাই ঠেলবে। যারা ধরে রাখবার তারাই রাখবে। তুই নিজেই সাধ করে ধরা দিবি, বাঁধা পড়বি।'

এনাক্ষী বলল, 'আচ্ছা দেখা যাক তোমার ভবিষ্যদ্বাণী কতখানি ফলে।'

পিসীমাকে নিরুপদ্রবে কাজ করতে দিয়ে এনাক্ষী ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সে যেন টের পেয়ে গেছে, শুধু এ ঘর কেন এ বাড়ির কোন ঘরেই সে আর মানিয়ে নিতে পারছে না। নিজের জন্য এতটুকু জায়গা খুঁজে নিতে গিয়েও ব্যর্থ হচ্ছে। বাবা-মা পিসীমা-ঠাকুরমা সবাই প্রায় তেমনিই আছেন অথচ কোথায় যেন একটু বদলেও গেছে। সে যে এ পরিবারের কেউ নয় তা এঁদের প্রত্যেকের কথাবার্তা ধরণ-ধারণে এমনকি অতিরিক্ত আদর-সোহাগের মধ্যে ফুটে উঠছে। কিন্তু চিরকালের জন্যে এ বাড়ির কেউ একজন হয়ে থাকবারই বা এমন কী গরজ এনাক্ষীর। সংসারে বেশির ভাগ মেয়েকেই তো এইভাবে এক পরিবারকে ছেড়ে আর এক

পারিবারকে গড়ে তুলতে যেতে হয়। আর সেই গড়ে তুলতে পারার মধ্যেই মেয়েদের কৃতিত্ব। পিসীমার মত যে মেয়ে শুধু ছাত্রীদের পড়িয়ে আর পরীক্ষা নিয়ে সারাজীবন কাটিয়ে দেয় তাকে কেউ সার্থক বলে না, অন্তত মা-ঠাকুরমা বলেন না। এনাক্ষীর নিজের ধারণাও তাই। চিরকুমারীর জীবন যেন এক অসম্পূর্ণ নক্সা। এমব্রয়ডারির যে কাজ শুধু একটুখানি শুরু হয়েই থেমে গেছে প্যাটার্নকে পূর্ণতায় এনে শেষ হয়নি। কিন্তু এনাক্ষী যে নতুন প্যাটার্ণের মধ্যে গিয়ে পড়েছে তার ওপর রঙীন সুতোয় রসের রূপ ধরিয়ে দিতে সে কি পারবে? আসলে এই প্যাটার্ণটাই যে সে মনে মনে মেনে নিতে পারছে না। শ্বশুরবাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয়েছে এই প্রাসাদের মত বাড়িটির কোনকিছুর সঙ্গে তার মিল নেই। এ বাড়িতে আলমারি-বোঝাই বই আছে কিন্তু তার কোন একখানা বই খুলে দেখবার কারো সময় নেই, ইচ্ছাও নেই। শুধু তাই নয়, এঁদের নিজেদের যে সব বিষয় নিয়ে আলোচন হয় তাতে এনাক্ষীব প্রবেশের কোন ক্ষমতা নেই, অধিকারও নেই। সবই এঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য, বিষয়-সম্পত্তি ঘটিত। যাঁরা বিষয়ী মানুষ তাঁরা বিষয় নিয়ে তো আলোচনা করবেনই কিন্তু তার মধ্যে একটু ফাঁক একটু মুক্তির অবকাশও তো থাকা চাই। সেই মুক্তি এঁদের গানে নয়, সাহিত্যে নয়, ছবিতে নয়—কিসে তা এনাক্ষী এখনো জানতে পারেনি। সেই তুলনায় বাবার সঙ্গে দাদার সঙ্গে বিয়ের আগের দিন পর্যন্তও কী ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই না ছিল, তাদের আলাপ আলোচনা অন্তরঙ্গতার যেন সীমা ছিল না। সেই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক কয়েকদিনের মধ্যেই শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে গড়ে উঠবে তা অবশ্য এনাক্ষী আশা করতে পারে না, করেও না। কিন্তু ও বাড়িতে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এনাক্ষীর কেন যেন মনে হয়েছে এঁরা ভিন্ন জাতের, ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। এঁদের সঙ্গে গভীর ভাবে পরিচিত হতে এঁদের আত্মীয়তা অর্জন করতে সময় লাগবে। যত সহজে এক ঘর থেকে আর এক ঘরে, এক গোত্র থেকে আর এক গোত্রে চলে আসা যায়, এক আত্মীয়মণ্ডল থেকে বেরিয়ে আর একটি মণ্ডলীর আত্মীয় হওয়া তত সহজ

নয় এনাক্ষী তা জানে। মৃগাঙ্ক তার বাবা কি দাদার মত নয় বলেই সে একদিন উল্লাস বোধ করেছিল কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছে যে সব বৈচিত্র্য, এনাক্ষীর রুচির পক্ষে অনুকূল নয়, স্বভাবে চালচলনে যে বিভিন্নতা বাইরে থেকে এনাক্ষীকে আকর্ষণ করেছিল একান্ত কাছে এসে এনাক্ষী দেখতে পাচ্ছে সেই বিভিন্নতা তার রুচির পক্ষে বিসদৃশ। এনাক্ষী তরকারিতে পেঁয়াজ পছন্দ করে না। পেঁয়াজের গন্ধ পর্যন্ত ওর দুঃসহ। মা ঠাট্টা করে বলেন, 'বাবারে বাবা, আর পারিনে তোর জ্বালায়! এ কোন বৈষ্ণব ঠাকরুণ আমার ঘরে এসে পিঁড়ি পেতেছেন।' সব সময় শুধু ঠাট্টা নয়, বিরক্ত হয়ে রাগও করেন। বলেন, 'আমি পারব না এমন সাত রকমের রান্না রাঁধতে, একেক জনের জন্যে একেক রকম ব্যবস্থা করতে।'

মুখে বলেন বটে পারব না, কিন্তু কোনদিনই না করে পারেন না। এনাক্ষী যা খেতে ভালোবাসে যে ধরণের রান্না ভালোবাসে, মা নিজের হাতে তা রান্না করে দেন।

কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে এসে এনাক্ষী দেখল এখানকার ব্যবস্থা সব অন্যরকম। এখানে দুজন রাঁধুনী আছে। কিন্তু তাদের রান্নাঘর মার রান্নাঘরের মত পরিপাটি নয়। এঁরা নিরামিষ আমিষ সব তরকারিতে যেমন ঝাল খান তেমনি পেঁয়াজ খান। এনাক্ষী যে এত ঝাল আর এত পেঁয়াজ ভালোবাসে না তা প্রথম কয়েকদিন মুখ ফুটে বলতেই পারেনি, জোর করে খেতে গিয়ে খেতে পারেনি। সব পড়ে রয়েছে। শাশুড়ী অবশ্য পরে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন। একটু কম ঝাল আর পেঁয়াজ দিয়ে রান্নার ব্যবস্থা তিনিও করলেন। কিন্তু মায়ের হাতের স্বাদ এ বাড়ির রান্নায় কিছুতেই ফিরে এল না। তাছাড়া সেই যে প্রথম দিন অরুচি ধরে গিয়েছিল, বিতৃষ্ণা এসেছিল তা আর কিছুতেই কাটাতে পারছে না এনাক্ষী।

রান্না খেয়ে যেমন অতৃপ্তি এসেছে তেমনি অস্বস্তি আর অতৃপ্তির কারণ ঘটিয়েছে মৃগাঙ্ক। সে যে সিগারেট খায় তা আগে থেকেই লক্ষ্য করেছিল এনাক্ষী। তাতে সে ক্ষুব্ধ হয়নি। তার দা' কমলাক্ষ অবশ্য পান সিগারেট

কিছু খায় না। কিন্তু সবাইকেই যে অমন হতে হবে তার কি মানে আছে। বরং যে ছেলে সিগারেট খায় না তাকে যেন এনাক্ষীর কেমন মেয়ে-মেয়ে লাগে। তাই মৃগাঙ্কের সিগারেট খাওয়াটাকে পৌরুষের লক্ষণ বলেই মনে করেছিল এনাক্ষী। কিন্তু মদ খাওয়াটাকে মেনে নিতে পারেনি। আদর করবার জন্যে মৃগাঙ্ক প্রথম যেদিন মুখের কাছে মুখ এগিয়ে এনেছিল সেইদিনই সব বুঝতে পেরেছিল এনাক্ষী। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অস্ফুটস্বরে বলেছিল, "তুমি মদ খাও?"

মৃগাঙ্ক অস্বীকার করেনি, হেসে বলেছিল, "তোমার নাসিকা শুধু দেখতেই অদ্ভুত নয়, ঘ্রাণশক্তিও বেশ তীব্র দেখতে পাচ্ছি।'

এনাক্ষী একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, 'হাসির কথা নয়। তোমার যে এসব বিশ্রী অভ্যাস আছে আমি তা ভাবতে পারিনি।'

মৃগাঙ্ক বলেছিল, 'পৃথিবীতে অনেক অস্বাভাবিক ঘটনার জায়গা আছে। এত মেয়ে থাকতে তুমিই যে আমার বিছানার অর্ধেকভাগ নেবে আমিই কি তা ভাবতে পেরেছিলাম?'

বলবার ভাষা আর ভঙ্গি দুইই এনাক্ষীর খারাপ লাগল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ করল না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমি ওর গন্ধ একেবারেই সহ্য করতে পারিনে।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'তুমি তবু শুধু গন্ধের কথা বলছ। অনেকে এর নাম পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না। তারপর আস্তে আস্তে সব সয়ে যায়। শরীরের নাম মহাশয়। নাকটাও শরীরেরই অঙ্গ।'

সেই রাত্রেই মৃগাঙ্ক এনাক্ষীর সম্মতি না নিয়ে তাকে তৈরি হবার সুযোগ না দিয়ে তাকে জোর করে বুকের কাছে টেনে নিয়ে আদর করেছিল। মদের গন্ধে ভরা সেই প্রথম চুম্বনে অত্যন্ত অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল এনাক্ষীর। সারাক্ষণ সে অস্বস্তি আর বিতৃষ্ণায় আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল। রাত্রে একটুও সে ঘুমোতে পারেনি। কেবল ভেবেছে এই কি সে চেয়েছিল? এই কি তার সেই রূপকথার রাজপুরী আর রাজপুত্র?

মৃগাঙ্ক তার ভাবভঙ্গি দেখে পরেও ঠাট্টা করেছে।

'হল কি তোমার? চুম্বনমদিরার ওপর এত যে বিরাগ? ওই দেখ তোমাদের কাব্যেই আছে চুম্বনমদিরা। কখনো কখনো চুম্বনই মদিরা—কর্মধারয় সমাস। কখনো বা চুম্বন ও মদিরা—দ্বন্দ্ব। আমি অবশ্য দ্বন্দ্বেরই পক্ষপাতী। দেখেছ ছেলেবেলায় মুখস্ত-করা ব্যাকরণ কেমন আজও কণ্ঠলগ্ন হয়ে আছে। কিন্তু তবু তোমার ধারণা আমার চালচলন ধরণ-ধারণ নীতিশাস্ত্রের ব্যাকরণসম্মত নয়।'

এনাক্ষী এ পরিহাসের কোন জবাব দেয়নি। কিন্তু নিজের মনে বেশ বুঝতে পেরেছে তাদের মিলনটা এখন পর্যন্ত গোঁজামিলের মধ্যেই রয়েছে। সত্যিকারের মিলনে যদি কোন মিল পৌঁছতে পারে তবেই সুখের দেখা মিলবে। নইলে তার ভাগ্যে কোনদিন সুখ হবে না। কিন্তু পৌঁছাবার আগে যে পথযাত্রা তা যে কত দীর্ঘ আর কত কষ্টকর হতে পারে সে সম্বন্ধে এনাক্ষীর কোন ধারণা নেই। সবচেয়ে উদ্বেগের কথা পা বাড়াবার আগেই হাঁটবার উদ্যম আর উৎসাহ সব নষ্ট হয়ে গেছে।

'আরে পুনটুরী, তুই যে এখানে একেবারে স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছিস, কী ব্যাপার?'

কমলাক্ষ কোথায় বেরিয়েছিল। বাড়িতে ঢুকে বারান্দায় এনাক্ষীকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

এনাক্ষী এতক্ষণ বাদে দাদাকে দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে উঠল। ঝড়ের সমুদ্র থেকে সে যেন নিরাপদ তীরে এসে আশ্রয় পেয়েছে। দাদা শুধু ভাই নয় বন্ধুও। বাবা মা কি পিসীমার চেয়েও এ বাড়িতে দাদার সঙ্গেই এনাক্ষীর বেশি ঘনিষ্ঠতা। তার কথা দাদা যেমন বুঝতে পারে আর কেউ তেমন পারে না। দাদাও কি তাই ভাবে না? না কি মনের কথা বলবার মত দাদা আর কাউকে পেয়েছে? কে সে? নীলকান্ত কাকাবাবুর মেয়ে মালা? সেই নার্স মেয়েটি? সে কি আজকাল দাদার মনের সব রকম দুঃখ ক্লেশ বিকলতার

শুশ্রূষার ভার নিয়েছে? একটু যেন ঈর্ষার খোঁচা লাগল এনাক্ষীর মনে। তারপর সে নিজেই যেন সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্ষতচিহ্নের ওপর হাত বুলিয়ে দিল। ভাবল যদি পেয়ে থাকে তো ভালোই। এজীবনে একান্ত অন্তরঙ্গভাবে কাউকে পাওয়াটাই হল পরম পাওয়া—অ্যাচিভমেণ্ট। সেই অ্যাচিভমেণ্ট আজও হয়নি এনাক্ষীর। বিয়ের পর সে স্বামীকে পেয়েছে কিন্তু তার মধ্যে বন্ধুকে পায়নি, প্রিয়কে-প্রেমিককে পায়নি। তা বোধ হয় এত তাড়াতাড়ি পাওয়াও যায় না। পুরোহিত শুধু একটি শুভলগ্ন দেখে হাতে হাত মিলিয়ে দিতে পারেন কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে যে মিল তা নিজেদের চেষ্টায় তিল তিল করে গড়ে তুলতে হয়।

এনাক্ষী দাদার সঙ্গে তার ঘরে এসে বসল।

সেই নিরিবিলি ছাদের ওপরে ছোট ঘরখানা এখনো দখল করে রেখেছে কমলাক্ষ। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে এই ঘরেই তার সময় কাটে। আসবাব-পত্রের কোন বাহুল্য নেই। দুটি সেতার দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। একদিকে সস্তা একটি লোহার সেলফে অল্পকিছু বই। এনাক্ষী লক্ষ্য করল তার বেশির ভাগই সঙ্গীত-শাস্ত্রের। কাব্যের মধ্যে আছে কালিদাস, বৈষ্ণব-পদাবলী, আর রবীন্দ্রনাথের কিছু বই। রচনাবলীর রাজসংস্করণ নয়? কাগজের মলাটের ছোট ছোট বই ছাত্রবয়স থেকে কমলাক্ষ যা একখানা দুখানা সঞ্চয় করেছে। এনাক্ষী লক্ষ্য করল দাদার এই সংগ্রহে তারও কয়েকখানা বই স্থান পেয়েছে। সোনারতরী আর নৈবেদ্য থার্ড ক্লাসে আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিল সেই দুখানা আছে। প্রবন্ধ লিখে পেয়েছিল ছিন্নপত্র, সেখানা আছে। দাদা কিছুই ফেলে দেয়নি কি হারিয়ে ফেলেনি। অনেকদিন বাদে বইয়ের এই যৌথ সম্পত্তি দেখতে পেয়ে এনাক্ষীর মন হঠাৎ এক সুখের আবেগে আর্দ্র হয়ে উঠল। মনে হল দাদা তাকে এখনো ভালোবাসে। এনাক্ষীর বই যেমন সে হারায়নি এনাক্ষীকেও তেমনি সে হারিয়ে যেতে দেয়নি।

'জানিস পুনটুরী, আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।'

কৈশোরের স্মৃতি-সরোবরে এনাক্ষী এতক্ষণ পরম আনন্দে আকণ্ঠ ভরিয়ে রেখেছিল। এবার ভেসে উঠল, তীরে উঠল। দাদার মুখের দিকে তাকাল এনাক্ষী। বলল 'জানি।'

রামলালের কাজ ছেড়ে দেওয়ার কথা এনাক্ষীরও কানে গেছে। নিজের সমস্যা নিয়ে বিব্রত ছিল বলে এনাক্ষী আর কারো কথা ভাবতে পারেনি।

"চাকরিটা চট করে কেন ছেড়ে দিলে দাদা? বেশ তো ছিল।'

কমলাক্ষ বলল, 'বেশ থাকলে কি আর ছাড়তাম। আর যে ওখানে টিকে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না পুনটুরী। আমি ছেড়ে না এলে ওরা আমাকে ছাড়িয়ে দিত। তাই মানে মানে চলে এলাম।'

এনাক্ষী বলল, 'বেশ তো আর একটা খুঁজে পেতে নিলেই পারবে। যারা খোঁজ-খবর জানে চাকরি-বাকরি তারাই পায়।'

কমলাক্ষ বলল, 'কিন্তু আমি আর খোঁজখবর করতেই চাইনে। আমি ভেবে দেখলাম পুনটুরী, একসঙ্গে আমি দুজনকে সার্ভ করতে পারব না।'

"দুজনকে মানে?"

কমলাক্ষ বলল, 'একজন বাইরের অফিসের মনিব আর একজন অন্দরের, নিজের মনিব, মনিব নয় মনের মানুষ। ত্বমেব পিতা চ মাতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব; ত্বমেব বিদ্যা দ্রবীণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্বং মম দেব দেব। তিনি মনিব নন, তিনি আমার সুরের দেবতা পুনটুরী।"

নিজের শিল্পসাধনা নিয়ে এমনভাবে আর কোনদিন কথা বলেনি কমলাক্ষ। সঙ্গীতকে ঘিরে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা একান্তভাবে নিজের কাছে গোপন করে রেখেছে।

আজ বাইরে থেকে ঘা খেয়ে খেয়ে কমলাক্ষের সেই হৃদয়ের গোপন দরজা কি হঠাৎ এমন করে খুলে গেল।

ভিতরের মনিব আর বাইরের মনিব! এনাক্ষীরও কি তাই। না,

এনাক্ষীর বাইরে আর কিছু নেই। সাধ নেই আহ্লাদ নেই। আশা-আকাঙ্ক্ষা নেই, সবই ঘরের মধ্যে। কিন্তু সেই ঘরকে নিজের ঘর না করে তুলতে পারলে তাতে বাইরেরই শূন্যতা খাঁ খাঁ করবে। ঘরকে সত্যিই কি অন্তরের আনন্দ দিয়ে ভরে তুলতে পারবে এনাক্ষী! ঘরকে ভরে তুলবার জন্যে শুধু ঘরই কি যথেষ্ট?

কমলাক্ষ বলল, "জানিস, ভেবেছিলাম আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি একথা সবাইর কানে গেলে বাড়িতে একটা কুরুক্ষেত্র হবে।"

এনাক্ষী হেসে বলল, 'কিন্তু কিছুই হল না দেখে তুমি বোধ হয় হতাশ হয়ে পড়েছ।'

কমলাক্ষ বলল, "হতাশ হয়েছেন বাবা নিজে। ভেবেছিলাম তিনি হয়তো এ ব্যাপার নিয়ে খুব রাগ করবেন, দুঃখ করবেন কিন্তু কিছু না। তিনি কদিনের মধ্যে আমার সঙ্গে কোন কথাই বললেন না। অথচ মনে মনে যে দারুণ রাগ করেছেন তা আমি ওঁর মুখ দেখে বুঝতে পেরেছি।'

এনাক্ষী বলল, 'বাবা তো ওইরকমই। রাগ হোক, দুঃখ হোক মুখে টু শব্দটি করবেন না। শুধু ভিতরে ভিতরে পুড়ে খাক হয়ে যাবেন।'

কমলাক্ষ বলল, 'শুধু কি উনি একাই খাক হন? সংসারে আরো যে কেউ দুঃখ পেতে পারে তা উনি ভেবে দেখেন না। যিনি আর কাউকে তাঁর দুঃখের অংশ দিতে পারেন না আর কারো দুঃখের ভাগ নেওয়ারও তাঁর ক্ষমতা নেই। আর ভেবে দেখ পুনটুবা, সব সময় যদি কেউ তোর দিকে অনুকম্পার চোখে চেয়ে মনে মনে কেবল ভাবেন ওর দ্বারা সংসারে কিছু হবে না তা হলে বাপ হলেও তাঁর সঙ্গে একজায়গায় বাস করা যে কী কষ্ট তা তুই ভাবতে পারবিনে পুনটুরী।'

শ্বশুরবাড়ির তুলনায় বাপের বাড়িকে শান্তির নীড় মনে করেছিল এনাক্ষী। কিন্তু এখানে এসে দেখল বাপের বাড়িতেও অশান্তির অন্ত নেই। ছেলেকে নিয়ে বাবার মনে অশান্তি, বাপের বিরুদ্ধে ছেলের মনে অসন্তোষ। তাহলে শান্তি কি সংসারে কোথাও নেই?

কমলাক্ষ বলল, 'জানিস একেক সময় আমার মনে হয় আমাকে এসংসারে কেউ বুঝল না, কেউ বুঝবেও না। আমাকে একা একা চলতে হবে তুনিয়ায়, চিরকাল নিঃসঙ্গ থাকতে হবে।'

এনাক্ষী হঠাৎ হেসে ফেলল। অনেক সময় অনেক গভীর কথা, অনেক তুঃখের কথা শুনতে শুনতেও মানুষের হাসি পেয়ে যায়। দাদার ঠোঁট ফোলানোর ভঙ্গিতে একটি অসহায় কিন্তু পরম ছেলেমানুষকে যেন আবিষ্কার করে বসল এনাক্ষী। সেই হাসিটুকু গোপন করবার চেষ্টা করতে করতে কমলাক্ষের দিকে চেয়ে সে বলল, 'একা থাকবার তুঃখটাই যদি তোমার কাছে সবচেয়ে বড় তুঃখ বলে মনে হয় দাদা সে তুঃখ দূর করা এমন কিছু শক্ত নয়। তুমি মুখফুটে বললেই ঠাকুরমা তোমার জন্যে একটি নাতবউ এনে ঘরে তুলবেন।'

কমলাক্ষ বলল, 'যেমন তোর জন্যে নাতজামাই এনে তোর সব তুঃখ ঘুচিয়ে দিয়েছেন।'

এনাক্ষী বলল, 'কী করে জানলে যে সব তুঃখ ঘুচেছে। কী করে জানলে সঙ্গী না-পেলেই তুঃখ, পেলে তুঃখ নেই ?'

কমলাক্ষ একটু চমকে উঠে বোনের দিকে তাকাল। তবে কি ও বিয়ে করে সুখী হয়নি ? অত বড়লোকের ঘর, অমন স্বাস্থ্যবান শক্তিমান বর তবুও কি সুখী হয়নি পুনটুরী ? বেশিরভাগ মেয়েই তো স্বামী হিসাবে এমন একজন শক্ত জবরদস্ত পুরুষকে চায় যার ওপর তারা নির্ভর করতে পারবে। ভারসহ নয় এমন পুরুষকে তারা তুচারদিনের সঙ্গী হিসাবে চাইলেও চিরদিনের সঙ্গী হিসাবে পেতে চায় না। সেদিক থেকে গাঙ্কটা বেশ নির্ভরযোগ্য পুরুষ। তাছাড়া বিয়ের আগে দীর্ঘকাল ধরে তুজনের মধ্যে মন জানাজানির সুযোগ না এলেও মুখ চেনাচেনি তো হয়েছিল। প্রথম দর্শনের প্রেম হতেও বাকি থাকেনি। সেই প্রেম কি কয়েকবারের দর্শনেই কর্পূরের মত উধাও হয়ে গেল ?

এনাক্ষী বলল, 'আচ্ছা দাদা, মালার খবর কি ? তোমার সেই বান্ধবী মালা ?'

কমলাক্ষ প্রতিবাদের সুরে বলল, 'বান্ধবী আবার কিসের? আমার কোন বান্ধবী-টান্ধবী নেই। বাবার বন্ধু তাঁর মেয়ে এই পর্যন্ত।'

এনাক্ষী হেসে বলল, 'ওরে বাবা, বড় ঘুরপথের সম্পর্ক তো। আমার শাশুড়ী যেমন বলেন, 'আমার মেজো ননদের ভাসুরঝি, তার পিসতুতো দেওর। সিঁড়ি-ভাঙার অঙ্ক কষে হিসেব করে দেখ, কী সম্পর্ক দাঁড়ায়। যাই হোক, তোমার বান্ধবীই হোক আর বাবার বন্ধুর মেয়েই হোক সেই সেবিকা মহোদয়া আছেন কেমন?'

কমলাক্ষ বলল, 'কী জানি।'

মনে পড়ল মালার কাছেও সে তার চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছিল, মালা এখবরটায় খুব যে গুরুত্ব দিয়েছে তা কমলাক্ষের মনে হয়নি। এমন কি যখন মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা বলেছিল গোপন ক্ষতের যন্ত্রণার কথা শুনিয়েছিল তখনো মালা খানিকটা পরিহাসই করেছে। হেসে বলেছে, 'হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যান।' এই ঠাট্টা কি পুরোপুরিই ঠাট্টা? নাকি আর কোন মনোভাবের ছদ্মবেশ? বাসে করে আসা-যাওয়ার পথে মাঝে মাঝে মালার সঙ্গে যে সব কথাবার্তা হয়েছে কমলাক্ষের তাতে কি একধরণের প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি সমবেদনাই ফুটে বেরোয়নি? সে কি শুধুই সহানুভূতি? তার মধ্যে কি কমলাক্ষের বাঞ্ছনার প্রতি অনুরাগ সপ্রশংস শ্রদ্ধার ভাবও ছিল না? তার কৃতিত্বকে একাধিকবার মালা স্বীকার করেছে। আর কি মধুর এই স্বীকৃতি। কমলাক্ষ ভাবল: 'আমাকে একজন স্বীকার করে শুধু এই কথাটুকু জানতে পারার মধ্যেও অপূর্ব আনন্দ আছে। আমার বাইরেও আমি আছি, আমি আর একজনের সঙ্গে আছি একথা জেনে এত আনন্দ কেন? কারো মুখ থেকে একথা শুনবার এত আগ্রহ কেন? কেন শুধু আমি আমার নিজের সাধনা নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারি না? কী লজ্জা এই পরনির্ভরতায়! কিন্তু সেই লজ্জাই কি শেষ কথা? তারপরে কি আর কিছু নেই?'

নিজের সমস্যা, পারিবারিক সমস্যা, বোনের নতুন দাম্পত্যজীবনের কথাকে

ভুলিয়ে দিয়ে নিতান্ত অসময়ে অসঙ্গতভাবে একটি অনাত্মীয়া অসম্পর্কিতা মেয়ের মুখ কমলাক্ষের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখল।

এনাক্ষী দাদার দিকে চেয়ে হেসে বলল, কিছুই জানো না! আমি কিন্তু তোমার বান্ধবীর খবর একটু একটু জানি।'

কমলাক্ষ বলল, 'কী জানিস শুনি?

এনাক্ষী বলল, 'সে বড় বড় মীটিং করছে, রাস্তা করছে, আর মণিময়-বাবুর সঙ্গে যেখানে-সেখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দাদা, তোমার বরাত একেবারে খারাপ! চাকরি গেছে, চকোরীটিও যায় যায়!'

কমলাক্ষ লজ্জিত হয়ে বলল, 'কী বলে ইয়ার্কি দিচ্ছিস! বিয়ে হলে মেয়েদের মুখ ফাজলামি করবার জন্যে চুলবুল করতে থাকে। লঘুগুরু জ্ঞান থাকে না।'

এনাক্ষী বলল, 'ঈস, কী আমার গুরুদেব রে! শুনেছি মালা একদিন মণিময়বাবুর সঙ্গে এখানেও এসেছিল। পিসীমার সঙ্গে মোলাকাত হয়েছে।'

কমলাক্ষ বলল, 'হুঁ, আমিও শুনেছি। বাড়ি ছিলাম না—তখন।'

এনাক্ষী বলল, 'না থেকে ভালোই করেছ, পিসীমা যেমন মনে মনে জ্বলেছেন তোমাকেও তেমনি জ্বলতে হত।'

'তার মানে?' কমলাক্ষ ভ্রূ কুঁচকে তাকাল।

'মানে আবার কি?'

এনাক্ষী জোর গলায় হেসে উঠল। অনেকদিন বাদে যেন হাসবার আনন্দকে আবিষ্কার করেছে।

মণিময়ের জন্যে চা করতে বসেছিল মালা।

ও-ঘরে নির্মলার সঙ্গে মণিময় তার রোড-কমিটির কথা নিয়ে আলোচনা করছিল। আজ অবশ্য আর কেউ আসেনি। অন্যদিন আসে। রোড-কমিটির বৈঠক প্রায় রোজ মালাদের বাড়িতেই বসে। সদস্যদের মধ্যে যারা তরুণ তারা গরহাজির থাকে না। মণিময় তো হাজির থাকেই। তার উদ্যম

উৎসাহ কর্মতৎপরতায় কম-বয়সী যুবকরাও তার কাছে হার মানে। আসলে কমিটি নামেমাত্র আছে, মণিময় একাই সব। সরকারী দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগের ফাইল বগলে নিয়ে রাইটার্স বিল্ডিং-এ ছুটোছুটি থেকে শুরু করে সব কাজ মণিময় একাই করে। এখানে যতক্ষণ থাকে প্রায় সব সময়ই রাস্তার আলোচনা, রাস্তা নিয়ে জল্পনাকল্পনা করে মণিময়। আর তার সেই উৎসাহ সে মালার মধ্যে সঞ্চারিত করে দেয়। যে লোক কাজ করতে জানে, প্রাণপণ করে নিজের কাজকে বড় বলে আর একজনের সামনে উপস্থিত করতে জানে, তাকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না।

এই মণিময়কে তো আগেও দেখেছে মালা। তাদের বাড়িতে এসে শুয়ে-বসে কাটাতো। মাঝে মাঝে তাদের রাজনৈতিক দলের গল্প করত, যে দলের অস্তিত্ব আর নেই, যে দলের ক্রিয়াকলাপের কথা লীন হয়ে যাওয়া পুরনো খবরের কাগজের পাতায় পাওয়া যাবে, কি প্রবীণ সদস্যদের স্মৃতির পাতায়। সেই দল কবে ভেঙে গিয়েছে, মানুষগুলিও আর আস্ত নেই। মণিময়ও সেই ভেঙে-যাওয়া মানুষের একটি টুকরোতে এসে ঠেকেছিল। অফিসে গতানুগতিক কাজ করত, মেসে গিয়ে খেত ঘুমোত আর ছুটিছাটার দিনে মালাদের বাড়িতে চলে আসত সময় কাটাবার জন্যে, খানিকটা পারিবারিক জীবনের স্বাদ পাওয়ার জন্যে, মালার মায়ের হাতে দুটো ভালোমন্দ ঝোল-তরকারি রান্না খাওয়ার জন্যে। কিন্তু কোত্থেকে রাস্তা করবার একটা কল্পনা মাথায় এসে ঢুকল, সেই কল্পনাকে পুরোপুরি বাস্তব চেহারা দেবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগল মণিময়, আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষটির চেহারা পালটে গেল। একটি সঙ্কল্প নিয়ে একটি উদ্যম নিয়ে একটি টুকরো হয়েই রইল বটে মণিময় কিন্তু সে যেন হীরের টুকরো।

মণিমামার এই পরিবর্তনের কথা মাঝে মাঝে ভেবে অবাক হয় মালা কিসের প্রেরণা তাকে এই কাজে নামিয়েছে? এই পাড়াগাঁয়ের মধ্যে একটি পাকা রাস্তা করে তাঁর কোন অক্ষয় কীর্তির প্রতিষ্ঠা হবে। প্রথম প্রথম

মালার মনে হয়েছিল করুণাদির জন্যে ওঁর এই আকর্ষণ। করুণাদি কীর্তি-পুরে আছেন কোন-একটা কাজের উপলক্ষ নিয়ে, মণিমামাও তাই এখানে থাকতে চান। তাঁর চোখের সামনে কাজ করতে চান, নিজের কাজের কথা তাঁকে শোনাতে চান। কিন্তু সেদিন করুণাদির সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হওয়ার পরেও মণিমামার মুখে ওঁর সম্বন্ধে কোন কথা শুনতে পায়নি মালা। মনে হয় যে বন্ধুত্ব প্রীতি অনুরাগের আগুন একদিন জ্বলে উঠেছিল আজ তার শুধু স্মৃতিমাত্র আছে। ওঁদের দুজনের মধ্যে সেই সম্পর্ক আর নেই, যে সম্পর্ক থাকলে একজন আর একজনের কাছে প্রেরণা পায় একজন আর একজনকে কাছে টানে। সেই সম্পর্ক কি আজও আছে ওঁদের মধ্যে? মালার যেন তা মনে হয় না। তবে কার জন্যে মণিমামার এত উৎসাহ-উদ্যম? কাকে উনি নিজের ক্ষমতা-প্রতিপত্তি দেখাতে চান? কাকে আবার? মানুষ কি শুধু কাজের জন্যে কাজ করবে না? কাজের মধ্যেই নিজের আনন্দ খুঁজে পায় না? হাসপাতালে মালা যখন রোগীদের শুশ্রূষা করে সে কি সবসময় মাইনের কথা মনে রাখে? প্রমোশনের আশা রাখে? না কি কাজ করতে ভালো লাগে বলেই করে? সেতারী কমলাক্ষের মুখেও সে একদিন এমনি একটা কথা শুনেছিল। সে বলেছিল সব কাজের মধ্যেই সুর আছে শুধু কান পেতে শুনতে জানলে হয়। অদ্ভুত এই মানুষটি। মণিমামার যেমন কাজ আর কাজ, রাস্তা আর রাস্তা, কমলাক্ষেরও তেমনি সুর আর সুর। মোটেই কাজের মানুষ নয়। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে জানাশোনা নেই বললেই চলে, কৌতূহলও বো হয় নেই। সবচেয়ে বড় দোষ আত্মবিশ্বাসের অভাব। যে নিজেকে নিজে সম্মান করতে পারে না তাকে কে সম্মান দেবে? অনেক দোষ আছে মানুষটির, দুর্বলতা আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও কোথায় যেন কেন যেন কমলাক্ষকে ভালো লেগে গেছে মালার। একথা কারো কাছে সে স্বীকার করে না এমন কি নিজের কাছেও নয় কিন্তু ভাবতে ভালো লাগে। ভাবতে ভালো লাগে যার সঙ্গে সুরসাধনার কোন

সম্পর্কই নেই, সংসারের কাজ করে, আর হাসপাতালে রোগীদের সেবা করে যার দিন কাটে সেই মালার সঙ্গে কমলাক্ষের কোথায় যেন মিল আছে। একেবারে যে সম্পর্ক নেই তাই বা কী করে বলা যায়। গান-বাজনা সে না জানলেও শুনতে তো ভালোবাসে। শুনতে শুনতে তো সেই সুরের সমুদ্রের মধ্যে সে ডুবে যায় হারিয়ে যায়। যে এমন করে মানুষকে ভোলাতে পারে, এক নাম-না-জানা অপরূপ রাজ্যে নিয়ে যেতে পারে, সে না যেন কতই গুণী কতই না যেন রহস্য তার মধ্যে আছে। কমলাক্ষের সেই শক্তির কথা যখন মনে হয় তখন তার আর কোন অক্ষমতার কথা মালার মনে পড়ে না। পড়লেও যেন সে আমল দিতে চায় না। পরে অবশ্য অনেক দোষ-ত্রুটিই বেরিয়ে পড়ে। বেশ শক্ত মজবুত ধরণের মানুষ হলে যেন আরো ভালো হত কমলাক্ষ। মণিমামা যে ধাতুতে গড়া যে রকম কাজের মানুষ সেই রকম হলে যেন খানিকটা স্বস্তি পেত মালা। কিন্তু তাই কি? তাও যেন মালার ঠিক পছন্দ হয় না। কমলাক্ষ যে আর কারো মত নয়, মণিময়ের মত নয়, যে ঠোঁট বাঁকিয়ে চোখা চোখা কথা বলে, পৃথিবীর কোন কিছুতেই বিশ্বাস করে না, কমলাক্ষ যে তার মত নয় এ ভালোই হয়েছে। যে গুণী, যে সুরস্রষ্টা, কমলাক্ষের মত মানুষ না হলে তাকে যেন অন্য কোন বেশে অন্য কোন চেহারায় মানায় না। সুর নিয়ে যার দিনরাত কাটে, তার যেন অমন রমণীয় সুশান্ত সুদর্শন হওয়াই স্বাভাবিক। মালার মনে পড়ল সেই চায়ের দোকানে দেখা হওয়ার পর থেকে কমলাক্ষের সঙ্গে তার আর যোগাযোগ হয়নি। সেদিন মন ভালো ছিল না বলে অনেক কাটাকাটা কথা বলেছিল। সেজন্যে কি কমলাক্ষ রাগ করেছে? মালা সেদিন মণিময়ের সঙ্গে ওদের বাড়িতেও তো গিয়েছিল। মনে মনে আশা করেছিল দেখা হবে। দেখা হলে ক্ষমা চেয়ে নেবে। কিন্তু ভদ্রলোকের কোন খোঁজই পাওয়া গেল না।

'কী রে, চা করতে গিয়ে বুড়ী হয়ে গেলি নাকি মালা?'

মায়ের গলা শোনা গেল।

মালা সাড়া দিয়ে বলল, 'যাচ্ছি মা।'

তারপর দুকাপ চা নিয়ে রান্নাঘর থেকে নেমে উঠান পেরিয়ে ঘরের মধ্যে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল।

নির্মলা বললেন, 'মণিময়ের শুধু রাস্তা আর রাস্তা। শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল! এবার একখানা ঘরের ব্যবস্থা করে ফেল। আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।'

মণিময় চায়ের কাপ হাতে নিয়ে একটু তরল স্বরে বলল, 'দাঁড়ান নির্মলাদি, আগে রাস্তাটা হয়ে নিক। তারপর ঘরদোর সবই আস্তে আস্তে হবে।'

নির্মলা বললেন, 'তোমার আর হয়েছে! নিজে তো ঘর বাঁধলেই না, আমার মেয়েটাকে পর্যন্ত রাস্তামুখী করে তুলেছ। ওর ঘরের কাজ সব গেছে। ও এখন—'

মালা প্রতিবাদ করে বলল, 'এ কি অকৃতজ্ঞতা মা। আমি বুঝি তোমার ঘর-সংসারের কোন কাজই করিনে।'

মণিময় স্মিতমুখে মা আর মেয়ের এই ছদ্মকলহ শুনতে লাগল। এই বাড়িতে সত্যিকারের কলহই বেশি দেখেছে। অভাব অনটন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর অবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে যে ঝগড়াঝাঁটি এতদিন চলেছে তাতে কান পাততে কষ্ট হয়েছে মণিময়ের। ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করেছে। কিন্তু পালিয়ে যেতে পারেনি মায়ামমতায় কর্তব্যবোধে বেঁধেছে। তার স্বজন-বন্ধুহীন জীবনে এই দূর-সম্পর্কের অসুখী পরিবারটি এক অদ্ভুত বন্ধন-জালে জড়িয়ে ফেলেছে। সেই বন্ধন লোহার শিকল নয়, তার মধ্যে কোথায় যেন একটু মাধুর্যের স্বাদ এসে জমেছে—মণিময় তা মুখ ফুটে কাউকে না বললেও মনে মনে স্বীকার করে, অনুভব করে।

মণিময় নির্মলাকে বলল, 'আপনি বুঝি ভেবেছেন ঘরের মত রাস্তাটাও আমার না-বাঁধাই থাকবে?'

নির্মলা বললেন, 'শুধু আমি কেন, যে শুনছে সেই তো হাসছে। আড়ালে-

আধিডালে সবাই বলছে আস্ত এক পাগল। আমার কপালই এই রকম। ঘরে এক পাগল, বাইরে এক পাগল।'

মণিময় হেসে বলল, 'আপনি আপনার ঘরের পাগলকে সামলান, বাইরের পাগলের জন্যে ভাববেন না। আমরা পাগলামি করতে করতে এক জায়গায় গিয়ে পৌছব এ বিশ্বাস আমাদের আছে। কী বলো মালা।'

মণিময়ের এই অন্তরঙ্গ স্বরে মালা কেন যেন বড় লজ্জা বোধ করল। মুখ নিচু করে বলল, 'আমাকে আবার এর মধ্যে জড়াচ্ছেন কেন। আপনার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের খবর আমি কি জানি?'

মণিময় এর কোন প্রতিবাদ না করে মৃদু হাসল। মালা সব জানে। ফাইলপত্র সবই মালার কাছে এনে দেয় মণিময়। তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা জল্পনা-কল্পনার কথা বসে বসে বলে। এইসব ব্যক্তিগত কথা কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকেও সে আজকাল আর বলে না। প্রথম যৌবনের সেইসব বন্ধুই বা এখন কোথায়। বেশির ভাগই রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে সংসারনীতি ধরেছে। স্ত্রী-পুত্র পালনে ব্যস্ত। পরিবার পরিবৃত হয়ে সুখেই আছে তারা। কেউ কেউ সরকারী প্রসাদ পেয়ে আত্মতুষ্ট। যারা তা পায়নি অন্য কোন দলে নিজেদের জায়গা করে নিতে পারেনি তারা হতাশায় নৈরাশ্যে দূরে এক কোণে সরে রয়েছে। দিনরাত সংসারের মধ্যে তাদের বাস। ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ তাদের আত্মরক্ষার আর পরকে বিদ্ধ করবার অস্ত্র। তাদের সঙ্গও বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না মণিময়। তারা কাজের বাইরে চলে গেছে। এখানে রোড-কমিটিতে যাদের সঙ্গে মণিময় কাজ করছে তাদের সঙ্গে তেমন অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ তার গড়ে ওঠেনি। তাদের সঙ্গে কাজ চালাবার মতই শুধু সম্পর্ক। মণিময়ের সৌহৃদ্যের জগৎ তাই একটি পরিবারের মধ্যেই এসে সীমাবদ্ধ হয়েছে। আর সেই পরিবারের মধ্যমণি মালা। মণিময় মালাকে তার কর্মোদ্যমের সব খবরই জানিয়েছে। মণিময়ের ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু প্রশান্ত দাস হাজার পঁচিশেক টাকার মধ্যে এই রাস্তা করে দিতে পারবে এস্টিমেট দিয়েছে।

তার মধ্যে সরকারী ভাণ্ডার থেকে অর্ধেক টাকা পাওয়া যাবে। বাকি অর্ধেক এই অঞ্চলের লোকদের তুলে দিতে হবে। টাকাটা মণিময় ইচ্ছা করলে সরাসরি নিজেদের রোড-কমিটির নামে নিতে পারত। কিন্তু তাতে পাছে গোলমাল হয় তাই ইউনিয়ন বোর্ডের মারফতই টাকাটা নেওয়ার সে ব্যবস্থা করেছে। এতে রোড-কমিটির মেম্বাররা অসন্তুষ্ট হলেও ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট খুশি হয়েছেন। তাঁর এখানে বিত্তপ্রতিপত্তি আছে। তাঁর কাছে থেকে মণিময় খানিকটা সাহায্য আশা করে। দান হিসাবে না দিলেও ধার হিসাবে টাকাটা তিনি দিলেও দিতে পারেন। দশ বারো হাজার টাকা এখানকার বাসিন্দারা চাঁদা তুলে দিতে পারবে না তা মণিময় জানে।

নির্মলা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভালো কথা মণিময়, কীর্তিপুরের প্রভাকরবাবু নাকি তোমাকে খবর পাঠিয়েছিলেন ?'

মণিময় হেসে বলল, 'কে বলল আপনাকে ?'

নির্মলা বললেন, 'আমার একটি খুদে গুপ্তচর আছে তোমাদের দলে। সে আমাকে সব খবর এনে দেয়।'

মণিময় হাসিমুখে বলল, 'ভটু বুঝি ? দাঁড়ান, ওকে দল থেকে বের করে দিতে হবে। হ্যাঁ, প্রভাকরবাবু তাঁর এক দালালকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর প্রস্তাব এই রাস্তার সব ভার তাঁর ওপর দেওয়া হোক।'

নির্মলা বললেন, 'বেশ তো দাও না ছেড়ে। তোমাদের রাস্তা নিয়ে কথা। রাস্তা হলেই হল। লোকজনের যাতায়াতের সুবিধে হলেই হল। কে করেছে না করেছে তার নাম তো আর রাস্তার গায়ে লেখা থাকবে না।'

মণিময় বলল, 'কিন্তু কনট্রাকটারের ফাঁকির পরিমাণ রাস্তার মধ্যে লুকিয়ে থাকবে। এ কাজে কিছু লাভের গন্ধ পেয়েছেন বলেই প্রভাকরবাবুরা এগিয়ে এসেছেন। যেই শুনেছে কাজ খানিকটা এগিয়ে গেছে, কিছু সরকারী টাকা হাতে আসবার ব্যবস্থা হয়েছে অমনি তিনি হাত বাড়িয়েছেন আমি সব করে দেব, আর হাত-সাফাই করে যা নিতে পারি তারও কসুর করব না।

ওঁরা রাস্তা করে দিলে সে রাস্তা ছ'মাসের বেশি টিঁকবে না। গরীব মানুষের রক্ত জলকরা টাকা ওঁদের হাতে এভাবে তুলে দিতে পারব না নির্মলাদি।'

মালা বলল, 'তার চেয়ে এক কাজ করুন না। ওঁদের বলুন না কেন বাকি অর্ধেক টাকা ওঁরা রোড কমিটির ফাণ্ডে দিয়ে রাস্তা তৈরি করে দিন।

মণিময় বলল, 'ছিঃ মালা, তুমি একথা কী করে বললে? ওঁরা কাজ হাতে নিয়ে লাভ করতে চান দান করতে চান না। চাইলেও ওঁদের কাছ থেকে দান আমরা নিতাম না। আমাদের নিজেদের মধ্যে যদি তুজন একজন কাজের•মানুষও থাকে, টাকার জন্যে কাজ আটকে থাকবে না একথা তুমি ঠিক জেন।'

যাঁর নিজের হাতে টাকা নেই তাঁর কী করে এমন আত্মবিশ্বাস থাকে ভেবে অবাক হল মালা। নিজের হাতে কাজ করবার, নিজের কর্তৃত্বে কিছু গড়ে তুলবার ইচ্ছাই মণিময়ের মনে প্রবল। কিন্তু শুধু কি তাই? কারো স্বার্থবুদ্ধিতে কাজটা যাতে নষ্ট না হয় সেই সতর্কতাও সঙ্গে সঙ্গে আছে।

মণিময় বলল, 'সত্যি আমি টাকার জন্যে ভাবিনে। আমাদের যদি ইচ্ছার জোর থাকে—'

'টাকা আকাশ থেকে পড়বে, মাটি ফুঁড়ে উঠবে।' বলতে বলতে নির্মলা হেসে উঠলেন।

আর সেই সময় মালার ছোটভাই বিশু ছুটতে ছুটতে এল।

নির্মলা হাসি থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার। অমন হাঁপাতে হাঁপাতে আসছিস যে!'

বিশু বলল, 'জানো মা কারা আসছে আমাদের বাড়িতে?'

মায়া বলল, 'ওই যে যাদের বাড়িতে আমরা নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলাম। সেই যে যে সেতার বাজায়—'

সেতার বাজায় শুনে মালা ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল, 'কোথায় রে? সত্যি আমাদের বাড়িতে আসছেন?'

জবাবের অপেক্ষা না করে মালা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উঠানে নামল।

মালার সেই আগ্রহ সেই ব্যগ্রতার দিকে মণিময় অপলকে তাকিয়ে রইল। একটি ছোট্ট সূক্ষ্ম কাঁটা যেন মনে গিয়ে বিঁধল। অসঙ্গত অহেতুক এই ঈর্ষা। কিন্তু পায়ের কাঁটা যত সহজে মণিময় তুলে ফেলে মনের কাঁটা তুলতে তার চেয়ে বেশি সময় লাগতে লাগল।

মালা বেরিয়ে এসে দেখল বাঁশের বেড়া-দেওয়া বাগানের পথটুকু পেরিয়ে কমলাক্ষ মালাদের উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে অবশ্য এখন আর ওর সেতার নেই, যেমন আগে আগে থাকত। সঙ্গে একটি মেয়ে। মালা দেখেই চিনতে পারল ওর বোন এনাক্ষী। বড়লোকের ঘরে বিয়ে হয়েছে। কিন্তু খুব গয়না-টয়না পরে আসেনি মালা লক্ষ্য করে খুশি হল।

মালা হেসে বলল, 'এই যে আপনারা এসেছেন। আমি ভাবতেই পারিনি—।'

কমলাক্ষ বলল, 'যাক, এতদিনে তাহলে একটা অভাবিত ঘটনা ঘটল।'

মালা বলল, 'অভাবিত ছাড়া কি! আপনারা কি আর কোন খোঁজখবর নেন?'

কমলাক্ষ বলল, 'যেন আপনাদের দিক থেকেই খোঁজখবর নেওয়ার খুব গরজ দেখা গেছে।'

এনাক্ষী বলল, 'দাদাকে কিন্তু বেশি খোঁচা দেওয়া উচিত নয় মালাদি, দাদা না এলেও আসবার কথা প্রায়ই বলে, তার চেয়ে আরো বেশি ঘন ঘন মনে মনে ভাবে। তবে একটা ধ[illegible]বাদ আমার প্রাপ্য। আর কিছু না হোক আমি একটি সুসঙ্গত উপলক্ষের কাজ করেছি। দাদা আমাকে বেড়াতে নিয়ে আসবার নামে এখানে সরাসরি চলে আ[illegible]তে পেরেছে।'

কমলাক্ষ বলল, 'আমার এই বোনটি একটি মহা মিথ্যাবাদিনী। নিজের বোন হলেও ওর এই দোষটা আমি কিছুতেই ঢেকে রাখতে পারিনে।'

ভাইবোনের এই মধুর ঝগড়া মিটাবার চেষ্টা না করে মালা মৃদু হেসে বলল, 'চলুন ভিতরে চলুন।'

এনাক্ষী বলল, 'কাকে চলুন বলছ?'

মালা হেসে বলল, 'তোমাকে নয়।'

এনাক্ষী বলল, 'দাদাকেই বা অত সম্মান দেখাবার কী দরকার? আমার দাদা নিশ্চয়ই কারো ঠাকুরদার বয়সী নয়।'

কমলাক্ষ বলল, 'আঃ কী হচ্ছে!'

কথা বলতে বলতে সবাই ঘরের মধ্যে ঢুকল।

ততক্ষণে নির্মলাও অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্যে বেরিয়ে এসেছেন। এনাক্ষীদের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'কী ভাগ্যি। তোমরা! এতদিন বাদে গরীব জেঠীমার কথা তোমাদের মনে পড়ল মা?'

এনাক্ষী নিচু হয়ে নির্মলার পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, 'মনে অনেকদিন ধরেই পড়ছে জেঠীমা। কিন্তু পর করে দিয়েছেন যে! মনে পড়লেই কি আর আসতে পারি?'

নির্মলা হেসে বললেন, 'শত চেষ্টা করলেও তোমাদের আজকালকার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে কথায় পেরে উঠব না। এসো ভেতরে এসো।'

এনাক্ষী জিজ্ঞাসা করল, 'জ্যাঠাবাবু কি এই ঘরে আছেন? কেমন আছেন তিনি?'

নির্মলা আঙুল দিয়ে পুব দিকের ছোট আর একখানা ঘর দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'না, তিনি থাকেন ওই ঘরে। আগের মতই আছেন। ও ঘরে তোমাদের পরে নিয়ে যাব। এ ঘরেও তোমাদের একজন চেনা মানুষ আছেন। এসো, আলাপ করবে এসো।

মণিময় তক্তপোষের ওপর বসে ছিল। নির্মলা সবাইকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

মণিময়ের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'অমিয়বাবুর ছেলেমেয়েরা এসেছে। দেখ তো চিনতে পারো কিনা।'

মণিময় গম্ভীরভাবে বলল, "না চিনবার কী আছে?'

এনাক্ষী আড়চোখে মণিময়কে একবার দেখে নিল। এরই জন্যে পিসীমা চিরকুমারী হয়ে রয়েছেন, দুঃখ বরণ করেছেন, এরই জন্যে পিসীমার জীবনটা

শুষ্ক নিষ্ফল হয়ে গেছে। মণিময়কে এর আগেও দু' একবার দেখেছে এনাক্ষী, কিন্তু এমন কাছে থেকে দেখেনি। সে ভেবে পেল না এই সাদাসিধে সাধারণ-দর্শন মানুষটির মধ্যে আকর্ষণ করবার কী আছে? সারাজীবন ধরে মনে করে রাখবার মত কী আছে! হয়তো পিসীমা এমন কিছু দেখেছেন যা এনাক্ষী দেখতে পাচ্ছে না, তিনি এমন কিছু পেয়েছেন যা এনাক্ষীর পক্ষে অনুমান করা অসম্ভব। এনাক্ষী কি কোনদিনই তা পাবে?

মণিময়ও তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল এনাক্ষীকে। বহুকাল আগে যে বাড়ির একটি মেয়েকে ভালোবেসেছিল মণিময়, এনাক্ষীও সেই বাড়িরই মেয়ে। সেই বাড়িরই কিন্তু আর এক বয়েসের আর এক সম্পর্কের। করুণা প্রথম যৌবনেও এমন রূপবতী স্বাস্থ্যবতী ছিল না। আজ তার সেই স্বল্প সৌন্দর্যও শেষ হতে চলেছে। কিন্তু শুধু দেহের লাবণ্যই নয়, দেহের কোমলতাও হারিয়ে ফেলেছে করুণা। একটি শুষ্ক কঠিন স্কুল-মিস্ট্রেস ছাড়া তাকে আর কিছু বলে ভাবা যায় না। মণিময় জানে এই অপচয়ের জন্যে তাকেই দায়ী করবে করুণা। কিন্তু সত্যই কি সে একা দায়ী? মণিময় কি বারবার এগিয়ে যায়নি, সহযোগিতার জন্যে হাত বাড়ায়নি? বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আসেনি? আজ সব আলো নিবে গেছে, সব উত্তাপ শেষ হয়েছে। কিছুই যে আর অবশিষ্ট নেই সেদিন মণিময় তা দেখে এসেছে। আজকাল তার মাঝে মাঝে মনে হয় এমনভাবে নিজেকে বঞ্চিত করে কোন লাভ হয়নি। যা ভোগ করবার তার অধিকার ছিল সেই অধিকার হেলায় হারিয়ে সে নিজের ক্ষতিই করেছে। নিজের কোমল সুকুমার বৃত্তিগুলিকে শুকিয়ে নষ্ট করেছে। একটি যৌবনবতীকে সামনে দেখে নিজের নিষ্ফল যৌবনের জন্য মণিময়ের মনে ক্ষোভ জমে উঠল।

হঠাৎ খেয়াল হল সে ওদের সঙ্গে একটি কথাও বলেনি, এই নীরবতাকে ওরা কী অর্থে নিয়েছে কে জানে।

মণিময় তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল, "অমিয়দা কেমন আছেন?"

এনাক্ষী ভেবেছিল দাদাই জবাব দেবে। কিন্তু কমলাক্ষ যখন কোন

কথা বলল না, এনাক্ষীকেই খানিকক্ষণ কথাবার্তা চালিয়ে রাখবার ভার নিতে হল।

'বাবার শরীর তেমন ভালো যাচ্ছে না। এত পরিশ্রম করেন।'

নির্মলা বললেন, 'এবার কিন্তু শরীরের দিকেও তাকানো উচিত। বয়স তো হচ্ছে?'

এনাক্ষী একটু অভিযোগের ভঙ্গিতে বলল, 'বাবা কারো কথা গ্রাহ্য করেন না। ভালো মন্দ, কারো কাছে মন খুলে কিছু বলবেন তেমন মানুষই নন।'

নির্মলা বললেন, 'তোমার জ্যাঠাবাবুও ওই এক ধাতের। নইলে কি আর বন্ধুত্ব হয়! তবে ইনি যেমন একেবারে চরমে উঠে বসে আছেন, তোমার বাবা তার তুলনায় অনেক নিচের সিঁড়িতে।'

বলেই অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে নির্মলার মনে হল অমিয়বাবুর ছেলেমেয়ের সামনে কথাটা বলা ঠিক হল না। তাছাড়া সত্যিই তো অমিয়ভূষণের সঙ্গে তাঁর স্বামীর তুলনা চলে না। শত হলেও অমিয়ভূষণ জীবনে কৃতী হয়েছেন! বাড়ি করেছেন, ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, বড় ঘরে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। সংসারী মানুষের সাফল্য বলতে যা বোঝায় তাঁর তা হয়েছে। প্রকৃতিতে যতই মিল থাকুক নির্মলার স্বামীর সঙ্গে তাঁর তফাত আকাশ পাতাল। নিজের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে নির্মলা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন। তাঁর ছেলে মেয়েরা বাপের কাছ থেকে কিছুই পেল না। বাপ থাকতেও ওরা অনাথ, বিষয়-সম্পত্তির আশা নির্মলা করেন না কিন্তু যাতে ওরা মানুষ হয়ে নিজেদের পায়ে নিজেরা দাঁড়াতে পারে সেই সাহায্যটুকু তো সব বাপই করে। কিন্তু তাঁর নাবালক ছেলেমেয়েদের বহুকাল পর্যন্ত অভাব-অনটনের সঙ্গে যুদ্ধ করে যেতে হবে। শেষ পর্যন্ত সব কটি মানুষ হতে পারবে কিনা তাই বা কে জানে।

মণিময় কমলাক্ষের দিকে চেয়ে বলল, 'তারপর তোমার গানবাজনা চলছে।'

গানবাজনা সম্বন্ধে মণিময়বাবুর যে কোন উৎসাহ ঔৎসুক্য আছে তাঁর কোন লক্ষণ কমলাক্ষ এর আগে লক্ষ্য করেনি। এখনো বেশ একটু সূক্ষ্ম পরিহাসের সুরই তার কানে বেজে উঠল। সেও তেমনি বেশ একটু নিস্পৃহ ভঙ্গিতে জবাব দিল, 'এই চলছে একরকম। আপনাদের রাস্তার খবর কি ?'

মণিময় বলল, 'রাস্তার খবর! সে খবর রাখবার কোন গরজ কি তোমাদের আছে ? আমাদের রাস্তা আর তোমাদের রাস্তা একেবারে আলাদা।'

প্রথম দিকে শ্লেষ আর শেষদিকে খানিকটা আক্রোশ ফুটে উঠল মণিময়ের গলায়। সবাই একটু অবাক হল। এর তো কোন দরকার ছিল না।

মালা দোরের পাশে দাঁড়িয়েছিল। মণিময়ের এই ব্যবহারে সে শুধু বিস্মিতই হয়নি বিরক্তও হয়েছে। ওঁর গায়ে পড়ে এই ঝগড়ার কোন মানে হয় না।

কমলাক্ষ মৃদু হেসে বলল, 'একেবারেই আলাদা ? কোন মিলই কি নেই ?'

মণিময় বলল, 'কী মিল আছে বলো। আমি তো কোন মিল দেখি নে। আমরা দশজনের ভালোর জন্যে দশজনকে নিয়ে কাজ করি।'

কমলাক্ষ বলল, 'আমরাও কি তাই করিনে ?'

মণিময় বলল, 'তোমরাও দল বাঁধো অবশ্য কিন্তু তাতে কতটা কার ভালো হয় তা বলা শক্ত। বরং আমার তো মনে হচ্ছে ললিতকলার বড় বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে দেশে। এ ই তো নরম জোলো মাটির দেশ। কাদের উৎসাহে জানিনে সস্তা গান-বাজনা আর নাটকে দলে দেশ ছেয়ে গেল। সংস্কৃতি এখন এই নৃত্যগীতে এসে ঠেকেছে। কই শুনিনে তো কোন পাড়ায় নতুন কোন জিমন্যাসিয়াম গড়ে উঠেছে, কি ছেলেরা মিলে এমন কিছু করছে যাতে দশজনের কল্যাণ হয়। মানে গঠনমূলক কোন কাজের দিকে আজকালকার ছেলেদের ঝোঁক নেই। তাতে যে শক্তির দরকার। হৈ-চৈ আর রঙ তামাশার ব্যাপার তো নয় '

' এসব কথা মণিময়ের মুখে মালা আগেও শুনেছে। কথাগুলি যে সত্য তা সে অস্বীকারও করে না। কিন্তু মালার কেন যেন মনে হতে লাগল আজ হঠাৎ এই তর্ক না তুললেও কোন ক্ষতি ছিল না। এ আলোচনা আজ একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক।

কমলাক্ষ কোন তর্কে যোগ দিল না। স্মিতমুখে আগের মতই চুপ করে রইল।

ওর এই অসহযোগকে আরো আপত্তিকর বলে মনে হল মণিময়ের। ভিতরে ভিতরে তার বিক্ষোভও বেড়ে গেল। কিন্তু আর কোন কথা না বলে সে এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'যাই, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একটু দরকার আছে।'

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মালাকে একটু কাছে ডেকে নিয়ে বলল, 'চল খানিকটা এগিয়ে দেবে। শুধু চাঁদা তুলে তো আর বারো তের হাজার টাকা উঠবে না। আর একটা হদিস পেয়েছি। চল যেতে যেতে বলব।'

মালা একটু বিব্রত হয়ে নিচু গলায় বলল, 'আজ থাক, ওঁরা যে রয়েছেন।'

মণিময়ের বিরক্তি আরো বেড়ে গেল। কিন্তু সে তা সাধ্যমত চেপে রাখবার চেষ্টা করে বলল, 'বেশ'। কিন্তু মালার কাছে কিছুই চাপা রইল না।

মণিময় তার পোর্টফলিও ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে গেলে কেউ কিছুক্ষণ কোন কথা বলল না। যেন কেউ কোন বলবার কথা খুঁজে পেল না। একটু বাদে কমলাক্ষ নির্মলার দিকে চেয়ে বলল, 'এবার আমরা উঠব। চলুন তার আগে একবার ওঁর সঙ্গে দেখা করে যাই।'

নির্মলা বললেন, 'এই তো এলে, এক্ষুনি উঠবার কী হয়েছে। মালা তুই বরং তোর বাবার কাছে ওঁদের নিয়ে যা। আমি ততক্ষণে চা-টা করি।'

এনাক্ষী বলল, 'না না জেঠীমা, ওসব কিছু করতে যাবেন না। আমরা খেয়েই বেরিয়েছি।'

এ কথার জবাবে নির্মলা কোন মন্তব্য না করে স্মিতমুখে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

মালা এনাক্ষীদের নিয়ে নীলকান্তের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। তিনি তাঁর ছোট ঘরখানার মধ্যে চুপ করে বসেছিলেন। আশেপাশে কিছু বইপত্র ছড়ানো। সামনে একটা পুরনো ডালা-খোলা স্থটকেস। তার ভিতর থেকে এলোমেলো কতকগুলি লেখা কাগজ দেখা যাচ্ছে। আগন্তুকদের দেখে তিনি তাড়াতাড়ি স্থটকেসটা বন্ধ করে ফেললেন। লুকিয়ে ফেললেন নিজের পিছনে। যেন কোন চোরাই মাল রয়েছে ওর মধ্যে। কি এমন কোন বস্তু যা কেউ দেখতে পেলে নীলকান্তের লজ্জার শেষ থাকবে না।

বাইরে থেকে যারা এসেছে তাদের বসতে বলবার জন্যে কোন আগ্রহ দেখালেন না নীলকান্ত। তিনি যে ওদের চিনতে পেরেছেন এমন লক্ষণও দেখা গেল না।

মালা বলল, 'বাবা, ওঁরা অমিয়কাকার ছেলে আর মেয়ে। চিনতে পারছ? ওঁরা তোমাকে দেখতে এসেছেন।'

নীলকান্ত সাদায় কালোয় মেশানো দুটি ভ্রূ-কুঁচকে বললেন, 'কেন কী হয়েছে আমার?'

মালা বলল, 'বাঃ রে, হবে আবার কি! মানুষ কি মানুষের কাছে আসে না?'

নীলকান্ত অদ্ভুত একটু হাসলেন, 'মানুষ বনমানুষের কাছে আসে না।'

এর জবাবে কারো পক্ষেই কিছু বলা কঠিন হল।

মালা আর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে বলল, 'জানো বাবা, কমলাক্ষবাবু খুব ভালো সেতার বাজান। তুমি তো গান-বাজনা ভালবাসো। শুনবে একদিন ওঁর সেতার?'

নীলকান্ত বললেন, 'আমাকে শোনাবার মত আগ্রহ কি ওঁর আছে? আমি কি কোন রাজা না মহারাজা?'

কমলাক্ষ বলল, 'একি বলছেন জ্যেঠাবাবু! আপনি আমাদের কাছে রাজামহারাজার চেয়েও বড়। আপনি যদি শুনতে চান আমি কালই আপনাকে এসে খানিকক্ষণ বাজনা শুনিয়ে যাব।'

এনাক্ষী বলল, 'সতি দাদা, এখন তো তোমার তেমন কোন কাজকর্ম নেই। শুধু একদিন কেন তুমি মাঝে মাঝে এসে ওঁকে তোমার সেতার শুনিয়ে যেতে পারো?

কমলাক্ষ হাসিমুখে বলল, 'শুনবেন জ্যোঠাবাবু?'

নীলকান্ত বললেন 'শুনব।'

এরপর ওরা সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

নির্মলা ততক্ষণে ওদের জন্যে জলখাবারেব আয়োজন করেছেন। মুড়ি নারকেল কোরা। বিশুকে দিয়ে মিষ্টি আনিয়েছেন রাস্তার মোড়ের দোকান থেকে।

এনাক্ষী বলল, 'একী কাণ্ড জ্যেঠীমা। এমন করলে আর তো আসব না।'

নির্মলা হেসে বললেন, কী আর এমন করেছি! তুমি তো আর এখন শুধু আমাদের মেয়ে নও বড ঘরের বউ, যত্ন-আত্তি করতে হয় বইকি।'

এনাক্ষী বলল, 'এবার কিন্তু ঠকে গেলেন জ্যেঠীমা, ঠিক মায়ের মত কথাটা হল না।'

বিশু, যীশু, রীনা, মীনা—মালার ভাইবোনেরা কমলাক্ষ আর এনাক্ষীকে ঘিবে বসেছে। যেন মহামান্য অতিথির আসায় বাড়িতে মহোৎসব পড়ে গেছে।

দরিদ্রের ঘরে উৎসবের উপলক্ষ হতে পেরেছে বলে কমলাক্ষের ভারি অদ্ভুত লাগতে লাগলে। সবচেয়ে বিস্মিত হল নির্মলার স্বভাবের মাধুর্য দেখে। এনাক্ষীর শ্বশুর-শাশুড়ীর কথা তুলে তিনি হাসি-কৌতুক করেই চলেছেন। পরণে লালপেড়ে একখানা আটপৌরে শাড়ি, হাতে দুগাছি শাঁখা ছাড়া আর কোন গহনা নেই। পাতলা রোগাটে চেহারা। বয়স নিশ্চয়ই পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু দেখলে অত মনে হয় না। কমলাক্ষ অবাক হয়ে ভাবল মনে যার এত অশান্তি এত দুশ্চিন্তা তিনি তাঁব ব্যবহারে এমন স্নিগ্ধ প্রসন্নতা আনেন কী করে। এ যদি অভিনয় হয় নিশ্চয়ই উনি পাকা

অভিনেত্রী। কিন্তু অভিনয় বলে কমলাক্ষের মনে হয় না। হয়তো উনিও ভুলে থাকতে চান। কিছুক্ষণের জন্যে নিজেদের দুঃখদৈন্য দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেতে চান মালার মা। পারুক আর না-পারুক সুখী হতে সবাই চায়। সুখের সন্ধানে সবাই ফেরে। কেউ বলতে পারে না কোথায় কিসের আড়ালে সেই দুর্লভ সুখ অপেক্ষা করে আছে। এখানে আসবার আগে কমলাক্ষ নিজেই কি বলতে পারত?

আরও কিছুক্ষণ গল্পসল্পের পর এনাক্ষীরা উঠে পড়ল।

এনাক্ষী মালার দিকে চেয়ে বলল, 'এস, আমাদের একটু এগিয়ে দিয়ে আসবে।'

নির্মলা বললেন, 'মালা, তোকে আজ হাসপাতালে যেতে হবে না?'

মালা বলল 'না মা, আজ আমার ছুটি। কাল থেকে মর্নিং সিফট।'

নির্মলা বলল, 'বাঁচিয়েছিস বাপু। তাহলে আজ একটু দেরিতে রান্না চড়ালেও চলবে।'

বিশু-যীশুরাও সঙ্গে সঙ্গে যেতে চেয়েছিল কিন্তু নির্মলা ধমক দিয়ে বললেন, 'না তোমরা এখন পড়তে বোসো। সারাদিন আজ আর কেউ বই নিয়ে বসলে না—।'

এনাক্ষী নির্মলাকে বারবার করে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করে বিদায় নিল।

মালা ওদের এগিয়ে দেওয়ার জন্যে চলল সঙ্গে সঙ্গে। কলোনী ছাড়িয়ে ওরা রাস্তায় নামল। এই রাস্তাকেই পাকা-রাস্তা করবার জন্যে মণিময় উঠে-পড়ে লেগেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে কথা কেউ তুলল না। কারো বোধ হয় মনেই পড়ল না।

দুদিকে ঝোপঝাড়, বাঁশবন আগাছার জঙ্গল। মাঝে মাঝে দু একখানা করে বাড়ি। ভিতরের ঘরগুলি থেকে জোনাকির মত আলো জ্বলছে। পুবদিকে নারকেল গাছগুলির মাথার ওপর বড় হয়ে চাঁদ উঠেছে। গাছের সবুজ পাতাগুলি তার আলোয় ঝিকমিক করছে।

'বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ কমলাক্ষ পথ ছেড়ে ডানদিকের একটি ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল। একমুঠো নীলরঙের বুনো ফুল নিয়ে ফিরে এল তক্ষুনি।

মালা বলল, 'কী মানুষ আপনি। সাপটাপ থাকতে পারে তো!'

এনাক্ষী বলল, 'দাদার কি এখন আর সাপ বাঘ ভাবা আছে?'

মালা গোপনে এনাক্ষীর হাতে একটা চিমটি কেটে দিল।

কমলাক্ষ দুজন সঙ্গিনীকে ভাগ করে দিল ফুলগুলি। এনাক্ষী সঙ্গে সঙ্গে খোঁপায় পরল।

মালা রাখল মুঠির মধ্যে লুকিয়ে।

এনাক্ষী বলল, 'ফুলগুলি তো চটকাবার জন্যে নয়। পরো না খোঁপায়। নাকি আমি পরিয়ে দেব?'

মালা বলল, 'না।'

এনাক্ষী বলল, 'তাইতো আমি পরালে মন উঠবে কেন।'

মালা বলল, 'আঃ কী হচ্ছে।'

আর একটু বাদে মালা বিদায় নিল। বেশিদূর গেলে একা একা ফিরতে তার অসুবিধা হবে।

খানিকদূর গিয়ে মুঠির ফুল মালা খোঁপায় পরল। কমলাক্ষ যে ঠিক সেই মুহূর্তে পিছন ফিরে দৃশ্যটুকু দেখে নিচ্ছিল সে তা জানতে পারল না।

২৭

কয়েকদিন শ্বশুরবাড়িতে বন্দিনী হয়ে থাকবার পর বাপের বাড়িতে এসে যেন মুক্তির স্বাদ পেল এনাক্ষী। বাইরে ঘুরে বেড়াবার পুরো সুযোগও সে গ্রহণ করল। কমলাক্ষকে তাগিদ দিয়ে দিয়ে সেই মালাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। আবার করুণাকে খোসামোদ করে করে তার সঙ্গে স্কুল পর্যন্ত ছুটল। আসলে চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকতে চায় না এনাক্ষী। বসে থাকলেই রাজ্যের ভাবনা ঝাঁক বেঁধে উড়ে আসে। যেসব সমস্যার সমাধান এনাক্ষী খুঁজে পায় না সেগুলিকে সে এখনকার মত এড়িয়ে যেতে চায়, ভুলে থাকতে চায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী পার হয়ে আসবার পর এনাক্ষী স্বেচ্ছায় বাড়ির সীমানার গণ্ডীকে মেনে নিয়েছিল। ভালো লাগত না হৈচৈ করতে, টোটো করে ঘুরে বেড়াতে। কিন্তু বিয়ের পর কদিনের মধ্যেই শ্বশুরবাড়ির চালচলন রীতিনীতি প্রচ্ছন্ন শাসন-অনুশাসন যখন তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধবার চেষ্টা করল আর এদিকে স্বামীকে মনে হল নিজের রুচি প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ বিপরীত মার্গের এনাক্ষীর মনে ঘরের আকর্ষণ শিথিল হয়ে গেল। বাইরের পৃথিবীর বৈচিত্র্যে আর বিশালতায় আশ্রয় খুঁজতে চেষ্টা করল এনাক্ষী।

জানতে পেরে মা ঠাকুরমা বাধা দিতে লাগলেন।

শতদলবাসিনী রাগ করে বললেন, 'এ কী কাণ্ড! বউ হয়ে তুই এমন টো টো করে বেড়াচ্ছিস যে। শেষে যদি ওরা এক কথা বলে বসে তখন কী হবে।'

এনাক্ষী বলল, 'কী আবার হবে। কিছু বললে তোমাকে খবর দিয়ে নিয়ে যাব। নাতনীর হয়ে তুমি তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারবে না?'

শতদলবাসিনী বললেন, 'দায় পড়েছে আমার ঝগড়া করতে। অন্যায় ঝগড়া আমি লোকের সঙ্গে করিনে। মন্দকাজে আস্কারা আমি কাউকে দেব না। সে আমার ছেলেই হোক, মেয়েই হোক, নাত্তিই হোক আর নাতনীই হোক।'

কল্যাণীও মেয়েকে শাসন করলেন, 'না বাপু, তোমার এসব কাণ্ড-কারখানা আমার মোটেই ভালো লাগছে না। এমন যদি করো তোমাকে আমি তোমার শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দেব। যাদের জিনিস তারা এসে নিয়ে যাক, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি।'

এনাক্ষী বলল, 'তাই ঠিক বলেছ মা।...আসলে আমরা একটা জিনিসেরই সামিল। আমাদের নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা রুচি বুদ্ধি বলে কিছু থাকতে নেই।'

কল্যাণী বললেন, 'তোমার স্বাধীন ইচ্ছার মানে যদি শহরময় ঘুরে বেড়ানো হয় তাতে কিন্তু বাপু আমার মত নেই।'

শুধু ঘুরে বেড়ানো নয়, এনাক্ষী স্বাধীনভাবে কাজ করতে চায়, স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্রের মধ্যে নিজেকে মুক্তি দিতে চায়—একথাটা মাকে আর সে জানাল না। মার মত শুধু ঘরসংসার নিয়ে তৃপ্ত থাকতে সে রাজী নয়।

কমলাক্ষ বলল, 'সত্যি পুনটুবী, বিয়ে হবার পর মেয়েরা ঘরণী হয় আর তুই কিনা ঘুরুণী হয়ে উঠলি—একি অনসৃষ্ট ব্যাপার?'

তাকে আড়ালে ডেকে এনাক্ষী বলল, 'দাদা, তাই বলে তোমার কিন্তু এমন খোঁটা দেওয়া উচিত নয়। কৃতজ্ঞতা বলে একটা কথা আছে সেটা ভুলে যেয়ো না।'

কমলাক্ষ বলল, 'কিসের কৃতজ্ঞতা?'

এনাক্ষী হেসে বলল, 'মালাদিদের বাড়িতে অমন একটি ভালো চাকরি তোমাকে আমিই জুটিয়ে দিয়েছি।'

কমলাক্ষ বলল, 'চাকরি!'

এনাক্ষী হেসে বলল, 'মানে সভাবাদকের কাজ।'

'বিনা মাইনেয়।'

এনাক্ষী হেসে বলল, 'আহা মাইনেটাই কি সব? চা, চকিত দৃষ্টি, স্মিত হাসির বুঝি দাম নেই?'

রোজ না হলেও প্রায়ই যে কমলাক্ষ সেতার নিয়ে জেঠাবাবুকে বাজনা শোনাতে যায় তা এনাক্ষী বেশ জানে। আর কমলাক্ষ যতই ভালো ছেলে হোক তার আকর্ষণের পাত্র যে শুধু ওই বুড়ো আধ-পাগলা নীলকান্ত চক্রবর্তী নন সে কথাও কারো বলে দেবার অপেক্ষা রাখে না। বরং কমলাক্ষ সেদিন এনাক্ষীর কাছে গোপনে স্বীকার করেছে তার বাজনায় বাপের চেয়ে মেয়ের উৎসাহই বেশি। এমন কি শিষ্যা হবার আগ্রহও সে নাকি প্রকাশ করেছে।

এনাক্ষী হেসে বলেছে, 'বেশ তো, ভালো দিন-টিন দেখে তাহলে দীক্ষাটা দিয়ে দাও।'

কমলাক্ষ বলেছে, 'কিন্তু তার সময় কোথায়? সে হাসপাতালে কাজ করবে, রাস্তা-ঘাট বাঁধবে না সেতার শিখবে?'

এনাক্ষী জবাব দিয়েছে, 'আহা ইচ্ছা থাকলে কি আর উপায় হয় না? বিশেষ করে একজনের ইচ্ছার সঙ্গে আর একজনের ইচ্ছাও যদি জুড়ে যায় তা হলে কি আর কথা আছে?'

কমলাক্ষের কাছ থেকে আরো কিছু শুনবার কৌতূহল অবশ্য এনাক্ষীর ছিল। কিন্তু কমলাক্ষ বড় চাপা। বেশি কথা সে বলে না। মালার সঙ্গে আলাপ পরিচয় বন্ধুত্ব কেমন এগোচ্ছে তা ওর ভাষায় প্রকাশ পায় না। কিন্তু ওর সুরের উল্লাসে সব ধরা পড়ে। রেওয়াজের সময় আরো বেড়ে গেছে কমলাক্ষের। অনেক রাত অবধি সে বাজায়। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর যে বিষণ্ণতা বিমর্ষতা তাকে পেয়ে বসেছিল তা যেন একটু একটু করে সে ফের কাটিয়ে উঠছে। তার এই পরিবর্তনে বাড়ির সবাই খুশি হন। শুধু এনাক্ষীই জানে এর মূলে কে আছে। দাদার এই সুরসঙ্গীটি কে।

এই কীর্তিপুর কলোনীতেই একটি দুটি করে ছাত্রছাত্রী জুটেছে কমলাক্ষের। তাদের নিয়ে তার সারা সকাল কাটে। নিজেদের বাড়িতে

জায়গা কম, বাবার লেখাপড়ার অসুবিধা হবে বলে সে কাছেই আর একটি বাড়ির একতলার একখানা ঘর ব্যবস্থা করে নিয়েছে, তার ছাত্রছাত্রীরা সেখানেই আসে।

অমিয়বাবু স্ত্রীকে একদিন ঠাট্টার সুরে বললেন, 'কীর্তিপুরে এই কীর্তিটুকুই তোমার ছেলের বাকি ছিল। চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে এখানে বুঝি সঙ্গীতের বিশ্ববিদ্যালয় খুলবে তোমার নন্দন।'

ছেলে চাকরি ছেড়ে দেওয়ায় কল্যাণী প্রসন্ন ছিলেন না। কিন্তু তাই বলে স্বামীর কাছে ছেলের নিন্দা শুনতেও তিনি রাজী নন। তিনি বললেন, 'যার যা সাধ্য সে তাই করে। সবাই তো আর তোমার মত পাশ-করা পণ্ডিত হয় না। তাই বলে সবসময় মানুষকে হতাশ করবার আমি পক্ষপাতী নই। ভেবে দেখ তো ওই বয়সে তোমার কতখানি ক্ষমতা ছিল? মাসে কত শো টাকা তুমি রোজগার করতে?'

অমিয়ভূষণ আর বেশি কথা বলা অর্থহীন মনে করে চুপ করে থাকেন।

এনাক্ষী বরং কমলাক্ষের কাছে উল্টো সুরের কথাই শোনে। আজকাল মালাকে নিয়ে একটু ঠাট্টা-তামাসা করতে গেলে কমলাক্ষ ভারি গম্ভীর হয়ে যায়। তার সেই তরলতা চপলতা কোথায় যেন অদৃশ্য হয়েছে।

কমলাক্ষ বলে, 'ওসব কথা রাখ পুনটুরী! ওসব প্রেম ভালোবাসা, বিয়ে-টিয়ে আমাদের জন্যে নয়।'

এনাক্ষী বলে, 'কেন দাদা, তোমরা এমন কোন্ অপকর্ম করেছ?'

কমলাক্ষ বলে, 'যারা জীবনে বেশ সাকসেসফুল ওসব তাদেরই মানায়।'

এনাক্ষী বলে, 'তুমিই বা সাকসেসফুল নও কিসে?'

কমলাক্ষ জবাব দেয়, 'মিথ্যে মনরাখা কথা বলছিস পুনটুরী। একে সাকসেস বলে না। আমি জানি worldly success আমার জীবনে কোনদিন আসবে না। আমার মধ্যে সেই আত্মবিশ্বাসের জোর নেই। তা যার নেই তার ভালোবাসবার অধিকার, বিয়ে করবার অধিকার কোথায়?'

এনাক্ষী একটু হেসে বলে বিয়েটা অবশ্য আজকাল টাকা পয়সা না জমিয়ে কোন ছেলে করতে সাহস করে না। কিন্তু ভালোবাসা তো আর তা নয়। ভালোবাসা ত বিশেষ করে প্লেটোনিক প্রেম অনেক কম ব্যয়ে হয় বলেই তো আমার ধারণা। ফুল, কবিতা, কি সুরের মধ্যে নিজের মনের কথা ভরে দিতে বোধ হয় বিশেষ বেগ পেতে হয় না।'

কমলাক্ষ হঠাৎ বলে বসে, 'পুনটুরী, তোর বড়লোকের ঘরে বিয়ে হয়েছে, জীবনের বড় একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে তোর। তুই আর এখন দারিদ্র্যের দুঃখ বুঝবিনে।'

দাদার এই কথায় এনাক্ষী খুবই ক্ষুণ্ণ হল। দাদা কি জানে না বিয়ের পর তার সমস্যার সমাধান হয়নি, সমস্যা আরও জটিল হয়েছে? তার স্বামী আর শ্বশুরের অর্থ আছে কিন্তু তাতে এনাক্ষীর কি? সে তো আজও ওদের ঐশ্বর্যকে নিজের বলে ভাবতে পারছে না।

এনাক্ষী বলে, 'দাদা, তোমার এ ধরণের কথার কোন মানে হয় না, তুমি পুরুষ ছেলে। তুমি চেষ্টা করলে নিজের সংসার চালাবার মত টাকা কেনই বা রোজগার করতে পারবে না? এইটুকু মনের জোর তোমার থাকা উচিত।'

কমলাক্ষ জবাব দেয়, 'পারব না কেন? কিন্তু সেই সামান্য প্রয়োজনটুকু মেটাবার জন্যে যা আমাকে ছাড়তে হবে তা অন্তত আমার কাছে অসামান্য। আমি তা ছাড়তে চাইনে। তার চেয়ে এই একক জীবনই আমার ভালো। সুর ছাড়া দ্বিতীয় আর কাউকে আমার দরকার নেই।'

এনাক্ষী মনে মনে হাসে। দাদা মুখে যাই বলুক দরকার যে আছে এনাক্ষী তা জানে, না হলে প্রায় রোজ বিকাল বেলায় সেজেগুজে সে নীলকান্তবাবুর বাড়ির দিকে যাত্রা করত না।

এর মধ্যে সেদিন এক কাণ্ড ঘটল। পাড়ার কয়েকটি কিশোরী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে মালা এসে হাজির। হাতে চাঁদার খাতা; ছাপানো রসীদ-বইও আছে।

এনাক্ষী বলল, 'কী ব্যাপার ?'

মালা বলল 'ব্যাপার কিছুই না। তোমাকে আমাদের সঙ্গে আসতে হবে। শাড়িটা পালটে নাও।'

এনাক্ষী বলল, 'কিন্তু কোথায় যেতে হবে, কী করতে হবে তা না জেনে—।'

মালা বলল, 'ভয় নেই, তোমাকে কোন অপকর্মে সাথী হবার জন্মে ডাকছিনে। রাস্তার জন্যে কীর্তিপুরের ঘরে ঘরে আমরা মেয়েদের কাছে চাঁদা তুলব। যা আদায় হয় তাই লাভ।'

প্রস্তাবটা এনাক্ষীর মন্দ লাগল না। ইদানীং ঘোরাঘুরির কাজে তার খুব আগ্রহ বেড়ে গেছে। ঘরে বসে থাকতে আর ভালো লাগে না। চুপচাপ বসে থাকলেই যতসব দুরূহ সমস্যা মনের মধ্যে ভিড় করে আসে। তাদের কোন সহজ সমাধান নেই।

এনাক্ষী বলল, 'মন্দ হবে না ব্যাপারটা। এই উপলক্ষে পুরী প্রদক্ষিণ হবে। চল পিসীমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাই।'

কিন্তু করুণা কিছুতেই যেতে রাজী হল না। তার স্কুল আজ ছুটি। তবু সে ঘর থেকে বেরোতে রাজী নয়। শুয়ে শুয়ে নভেল পড়বে, যখন কিছু পড়বে না, তখন চুপ করে শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাববে তবু বাইরে এসে চন্দ্রসূর্যের মুখ দেখবে না। কোন কাজে কোন উৎসাহ নেই, কৌতূহল নেই, স্কুল আর এই ঘরখানির মধ্যে করুণা নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। এনাক্ষী ভাবল জীবনের বড় একটা দিক পিসিমার অপূর্ণ রয়ে গেছে। সেই ক্ষোভ আর নৈরাশ্যেই কি তাকে এমন করে শুকিয়ে ফেলেছে ? এনাক্ষীর জীবনে যদি এমন দুর্দিন আসে সে কিন্তু এমন করে নিষ্ফলতাকে মেনে নেবে না। জীবনের আরো নানাদিক নানা পথকে সে খোলা রাখবে। সংসারে আনন্দের উপকরণের কি অন্ত আছে ! যে দুহাতে নিতে না পারল সেই ঠকল।

মা ঠাকুরমা এবারও নিষেধ করলেন। কিন্তু এনাক্ষী বেপরোয়া। সিঁদুর

পরেছে বলে কি অন্য সব কাজকর্ম শিকেয় তুলে রাখতে হবে? তার নিজের কোন স্বাধীন ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই? যে সৎকাজে আরো পাঁচটি মেয়ে নামতে পারে এনাক্ষীই বা তা পারবে না কেন? বিয়ে হয়েছে বলে সে তো আর সত্যি সত্যি সেই ঐতিহাসিক আমলের 'মোগল' হারেমে ঢুকে বসেনি।

দলের সঙ্গে এনাক্ষী প্রায় সারা কীর্তিপুর টহল দিয়ে বেড়াল। কত সব অজানা বাড়িঘর, অচেনা মুখ, ছোটবড় রাস্তা, গাছপালা দোকানপাট। এত কাছের এই লোকালয়কে এমন উৎসুক নতুন দৃষ্টি দিয়ে যেন এনাক্ষী আর কোনদিন দেখেনি। তার মনে হল ঘরের মত বাইরের আকর্ষণও কম নয়। এই সূর্যকরোজ্জ্বল পৃথিবীকে শুধু দুচোখ মেলে চেয়ে দেখার মধ্যেও যে অপূর্ব আনন্দ আছে তা যেন এনাক্ষী এতদিন টের পায়নি।

মালা যতই বক্তৃতা করুক চাঁদা অবশ্য বেশি আদায় হল না। পাকা রাস্তার দরকার আছে ঠিকই। প্রায় প্রত্যেক বাড়ির কর্তা গিন্নীই সে কথা স্বীকার করলেন। কিন্তু কিছু দেওয়ার মত তাঁদের সমর্থ কই। উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্যে এনাক্ষী অবশ্য প্রথমেই একশ টাকার এক প্রতিশ্রুতিতে নাম সই করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশেষ সাড়া পাওয়া গেল না। কয়েকজন একটাকা দুটাকা রাস্তার তহবিলে দান করলেন, কেউ কেউ পরে আসবেন বলে কথা দিলেন। কেউ বা সেটুকুও দিলেন না।

শুধু তাই নয়, পিছন থেকে নানারকমের মন্তব্যও এনাক্ষীদের শুনতে হল।

'কালে কালে কতই দেখব। বউ-ঝিরা সব হাতাখুন্তী ছেড়ে দেশোদ্ধারের জন্যে রাস্তায় বেরিয়েছেন।'

'পথে বসাবার মতলব আর কি।'

'আরে দাদা, তেমন তেমন হলে পথে বসেও সুখ।'

'আমাদের মত চুনোপুঁটিদের কাছে ..দা চাইতে আসা কেন? রাঘব-

বোয়াল শ্বশুরমশাইকে গিয়ে ধরলেই হয়। তিনি তো ইচ্ছা করলে বউমার জন্যে সোনা দিয়ে পথ বাঁধিয়ে দিতে পারেন।'

কিন্তু এসব উপহাস-পরিহাস এনাক্ষী গায়ে মাখল না। মালাদের সঙ্গে হৈ চৈ করে বেলা প্রায় দুপুরের সময় সে বাড়িতে ফিরে এল। ঠাকুরমার বকুনিটা যেন সত্যিকারের বকুনি নয়; বছরের প্রথম বৃষ্টির ধারা। এনাক্ষীর মনে পড়ল ছেলেবেলায় দুষ্টুমি করে বৃষ্টিতে ভিজলে ঠাকুরমা এইরকমই বকতেন। বহুদিন পরে যেন সেই ফেলে আসা বাল্যকৈশোরের দিনগুলির স্বাদ পেল এনাক্ষী।

কিন্তু সেইদিনই বিকাল বেলায় শ্বশুরবাড়ি থেকে ঝি এল বউকে নিতে শতদলবাসিনী বললেন, সেকি পুনটুরী এই অবেলায় কোথায় যাবে!'

ঝি বলল, 'কী যে বলেন দিদিঠাকরুণ। এবাড়ি থেকে ওবাড়ি তার আবার বেলা আর ওবেলা।'

তারপর শতদলবাসিনীকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গলা নামিয়ে বলল, 'নাতনীকে আজই দিয়ে দিন দিদিঠাকরুণ। আর দেরি করবেন না। ও বাড়ির কর্তাগিন্নী সব রেগে আগুন হয়ে আছেন।'

শতদলবাসিনী বললেন, 'কেন, কেন?'

ঝি বলল, 'আমরা বাইরের মানুষ, আমরা কী করে জানব দিদিঠাকরুণ? তবে শতহলেও নতুন বউ, তাকে বাইরে ওভাবে টো টো করে বেড়াতে দেওয়া আপনাদের উচিত হয়নি। দুচার দশমাইল দূরে হলেও নাহয় কথা ছিল। এ একেবারে চোখের সামনে কুটুমবাড়ি। তাও যে সে কুটুম নয় রাজার মত কুটুম। এখানে কী আর ওসব সাজে!'

এনাক্ষী তো প্রথমে কিছুতেই যেতে রাজী হয় না। সে বলল, 'ঝি কেন পাঠালেন ওঁরা? নিজেরা কেউ আসতে পারলেন না বুঝি? যাব না আমি।'

কিন্তু কল্যাণী আর শতদলবাসিনী ওকে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে রাজী করালেন। আজ যখন ওঁরা নেওয়ার জন্যে লোক পাঠিয়েছেন এনাক্ষীর পক্ষে না-যাওয়াটা

ভালো দেখায় না। বরং দু'চার দিন বাদে এনাক্ষী ফের আসতে পারবে। তার বাবাই গিয়ে তাকে নিয়ে আসবে।

এনাক্ষী চলে যাওয়ার পর শতদলবাসিনী আসল কথাটা ফাঁস করলেন। কল্যাণীকে বললেন, 'জানো ওরা খুব রেগে গেছে। মেয়েকে ওভাবে ছেড়ে দেওয়া তোমার উচিত হয়নি বউমা। ওতো এখন আর নিজের জিনিস নয়, পরের জিনিস। সবদিক ভেবে চিন্তে কাজ করতে হয়। গোঁয়ারতুমি করলে তোমার মেয়েরই কষ্ট হবে।'

মেয়ের কথা ভেবে কল্যাণী নিজেও শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। এই মুহূর্তে শাশুড়ীর সমালোচনা তাঁর অসহ্য মনে হল। তিনি বললেন, 'আমার মেয়ের ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। কিন্তু শুধু কি আমার মেয়ের একারই দোষ? ও ছেলেমানুষ। ওর কি তেমন পাকা বুদ্ধি হয়েছে? পাঁচজনে যারা ওকে উসকানি দেয় আমি তাদের আক্কেলখানার কথা একবার ভাবি।'

করুণা ঘরেই ছিল। বউদির কথাগুলি তার ঠিকই কানে গেল। অর্থটাও দুর্বোধ্য রইল না। বউদির অনেক অপবাদ সে সহ্য করেছে কিন্তু আজ সব দুঃসহ মনে হল।

করুণা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'অনর্থক' মানুষকে দোষ দেওয়া তোমার স্বভাব বউদি। পাঁচজনে তোমার কোন অনিষ্ট করেছে? কী কুপরামর্শ দিয়েছে তোমার পুনটুরীকে?'

কল্যাণীও ঝগড়ার মুখে বলে ফেললেন, 'কেন তুমি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে টৈ টৈ করতে বেরোওনি? চাকরি কর চাকরি কর বলে পরামর্শ দাওনি? কী দরকার ওর চাকরিতে শুনি? সবাইরই চাকরি করতে হবে তার কী মানে আছে? সবাইর ভাগ্য কি সমান? সবাইর দশা কি একরকম?'

করুণা বলল, 'মিথ্যে কথা বোল না বউদি। আমি তোমার মেয়েকে কখনো চাকরি নেওয়ার পরামর্শ দিইনি। সে নিজেই ওসব কথা তুলেছিল।'

কল্যাণী বললেন, 'আমি মিথ্যে কথা বলিনে। তেমন বাপের বেটি নই

আমি। তোমার সলাপরামর্শ আমি নিজের কানে যা শুনেছি তাই বলেছি। একটি কথাও বানিয়ে বলিনি।'

অমিয়ভূষণ কলেজ থেকে ফিরে এসে স্ত্রী আর বোনের ঝগড়া শুনলেন। মিটাবার খানিকক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। ঝগড়ার হেতুটা শুনে তিনি স্ত্রীকেই বেশি অনুযোগ দিলেন। বললেন, 'সত্যি করুণার কী দোষ! ও তো সংসারে থেকেও নেই। বইপত্তর নিয়ে বাড়ির এক কোণে পড়ে থাকে। মেয়ে কী করছে না করছে কোথায় যাচ্ছে না যাচ্ছে তোমারই উচিত লক্ষ্য রাখা।'

কল্যাণী বললেন, 'তোমার সোহাগী বোনের কোন দোষ নেই, সব দোষ আমার! চিরকাল তো তুমি এই করে' করেই গেলে। একজনকে পায়ে তলায় ফেলে চটকালে আর একজনকে মাথায় তুললে।'

অমিয়ভূষণ একটুবাদে করুণাকে ডেকে বললেন, 'তোরও উচিত হয়নি করুণা পুনটুরীকে সঙ্গে নিয়ে বাসে টাসে বেরোন। ওঁদের চালচলন যখন জানিসই আমাদের একটু সমঝে চলাই ভালো ছিল।'

বউদির সঙ্গে খুবই তর্ক করেছিল ঝগড়া করেছিল করুণা, কিন্তু দাদার কাছে একেবারে চুপ করে রইল। একটি কথারও প্রতিবাদ করল না। শুধু অল্পবয়সী মেয়ের মত ঠোঁট দুটি বার কয়েক ফুলে ফুলে উঠল।

ফলটা দেখা গেল দুদিন পরে। করুণা তার বাক্স বিছানা বেঁধে তৈরী। সে এখান থেকে বিদায় নিচ্ছে। কেউ ভাবতেই পারেনি এই সামান্য ঝগড়ায় করুণা এতবড় কাণ্ড বাঁধিয়ে বসতে পারে। অমিয়ভূষণ বললেন, 'কোথায় যাবি?'

করুণা বলল, 'বিবেকানন্দ রোডে মেয়েদের একটা হোস্টেল আছে। আমাদের স্কুলের আরো দুজন টিচার সেখানে থাকে। আমি আগে থেকেই একটা সীটের জন্য অ্যাপ্লাই করে রেখেছিলাম, এবার পেয়ে গেলাম।'

অমিয়ভূষণ বললেন, তোর রাগ করে আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার মত এমন কী হয়েছে করুণা?'

করুণা জবাব দিল, 'রাগ করে তো নয় দাদা। এমনিই যাচ্ছি। অনেক

দিন ধরে এক জায়গায় আছি। আমার নিজের মন-মেজাজও কেমন যেন তিরিক্ষে হয়ে গেছে। এবার একটু হাওয়া বদলানো ভালো দাদা। তাতে সকলেরই একটু মুখবদল হবে।'

অমিয়ভূষণ নিজের বোনকে ভালো করেই চেনেন। তিনি বুঝতে পারলেন এখন কোন অনুরোধ উপরোধেই কাজ হবে না। আজ বরং ওকে যেতে দেওয়া ভালো। তারপর একদিন বরং ওর হোস্টেল থেকে একদিন গিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন।

কল্যাণী এগিয়ে এসে বললেন, 'করুণা, একী তোমার সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড বল তো। এক জায়গায় থাকলে ঝগড়াঝাঁটি কি হয় না?'

করুণা হেসে বলল, 'ভেব না বউদি, ভিন্ন জায়গায় থেকেও ঝগড়া চালাতে আমার কোন অসুবিধে হবে না। ছুটি-ছাটার দিনগুলি তো আছে তখন বাড়ি বয়ে এসে ঝগড়া করে যাব।'

শতদলবাসিনী এক কোণে বসে কাঁদছিলেন। করুণা এসে ধমক দিল, 'তুমি তো আচ্ছা ছিচকাঁদুনী হয়েছ মা! আমি কি জন্মের মত বিদায় নিয়ে যাচ্ছি নাকি? দু-এক মাসের জন্যে যাচ্ছি, আবার চলেও আসব। মানুষের কি চিরকাল এক জায়গায় থাকতে ভালো লাগে?'

কমলাক্ষ যখন বাড়িতে ছিল না পালাবার সেই সময়টাই সব চেয়ে সুবিধাজনক বলে মনে করল করুণা। সে এলে পিসীকে সহজে ছেড়ে দিত না। তার হাত এড়ানো করুণার প[...] কঠিন হত।

অমিয়ভূষণ সারাক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন। শুধু একখানা ঘর নয় সারা বাড়িটাই তাঁর কাছে শূন্য মনে হতে লাগল। জীবনে একদিনের জন্যেও তিনি বোনকে কাছছাড়া করেননি। বড় হওয়ার পর বন্ধুর মত, তার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। কত আনন্দের কথা, দুঃখের কথা সাংসারিক দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার কথা তাকে বলেছেন। কতদিন বা কিছুই বলেননি শুধু চুপ করে বসে রয়েছেন। সেই নিঃশব্দ আর অন্ধকার দুজনের মনের সহানুভূতি আর সমবেদনা গোপনে আবৃত করে রেখেছে।

তুচ্ছ একটা ঝগড়াকে উপলক্ষ করে করুণা চলে গেল কেন? শুধু কি কল্যাণীই এর জন্তে দায়ী? না কি আরো কেউ আছে? অমিয়ভূষণের মনে হল হয়তো করুণার এই বৈরাগ্যের আরো কিছু কারণ আছে যা সহজ নিরীক্ষ্য নয়। হয়তো মনিময়ের নিষ্ঠুরতায় উদাসীনতায় সে আরো বেশি আঘাত পেয়েছে। মণিময় এই কীর্তিপুর দিয়েই ঘোরাফেরা করে অথচ করুণার সে একবারও খোঁজখবর নেয় না, তার এই নিস্পৃহতা করুণার কাছে হয়তো আরো বেশি অসহনীয় মনে হয়েছে। জীবনে যে কিছুই পেল না, চিরকাল বঞ্চিত সেই ছোট বোনটির জন্তে অমিয়ভূষণের মন এক অসহায় বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে রইল।

কিন্তু তাঁর জন্তে আরো অপ্রীতিকর দুঃখময় অভিজ্ঞতা পুঞ্জিত হয়েছিল। সেদিন তাঁর ধনী বেয়াই তাঁকে চায়ে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। নিমন্ত্রণের ধরণটাই অমিয়ভূষণের ভালো লাগল না। ওঁরা নিজেরা কেউ আসেননি। ছোকরা এক কর্মচারী দিয়ে বলে পাঠিয়েছেন, প্রভাকর অমিয়বাবুর সঙ্গে আজ বিকালে চা খেতে চান। তাঁর কিছু বৈষয়িক কথাও আছে। তাও এই সঙ্গে সারা যাবে।

অমিয়ভূষণ স্ত্রীকে বললেন, 'নিমন্ত্রণ করবার ধরণ দেখ। এ ধরণের নিমন্ত্রণ কি রাখতে যাওয়া উচিত?'

কল্যাণী বললেন, 'কী করবে বলো। মেয়ের সুখের জন্যে বাপ-মাকে অনেক সহ্য করতে হয়। শুধু মান-অভিমান নিয়ে থাকলে তো চলে না। তাছাড়া তোমার মান তোমার কাছে। কেউ অভদ্রতা করে তোমার সম্মান নষ্ট করতে পারবে না। মনে হয় পুনটুরীর বিরুদ্ধে প্রভাকরবাবু কিছু নালিশ টালিশ করবেন।' কল্যাণী একটু হাসলেন, 'যদি কিছু বলেন ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে যেয়ো না, অবশ্য তোমাকে দিয়ে সে ভয় নেইও। তুমি শুধু আমার সঙ্গেই ঝগড়া করতে পারো। না, নতুন কুটুম্বের সঙ্গে কোন রকম কথান্তর-টথান্তর করে দরকার নেই। মেয়ের বিরুদ্ধে যদি কিছু বলেনই তুমি বোলো ছেলেমানুষের বুদ্ধি। একটু বয়স হলেই সব শুধরে যাবে।'

অমিয়ভূষণ হেসে বললেন, একেবারে তোতাপাখীর মত পড়িয়ে দিচ্ছ। দাঁড়াও কথাগুলি লিখে নিয়ে যাই। না হলে মুখস্থ করতে পারব না। কল্যাণীও হাসলেন, 'আমার কথাগুলি শুধু মুখস্থই রেখেছ যদি অন্তরে ধরে রাখতে আর সব কথা শুনে চলতে—'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'তাহলে আমি আমার বেয়াইমশাইর মত বড়লোক হতে পারতাম এই তো ?'

বড়লোক বৈবাহিক চায়ের নিমন্ত্রণে শুধু চা বিস্কিটের ব্যবস্থাই করেন নি। লুচিমাংস মিষ্টি ক্ষীর দই—লেহ্য পেয়ের কোন আয়োজনেরই ত্রুটি করেন নি। অমিয়বাবুর আপ্যায়নের জন্যে চাকর বাকরগুলিকে ব্যস্ত করে রাখলেন।

কিন্তু অমিয়ভূষণ লক্ষ্য করলেন বাইরের দিকের একটি ঘরে তাঁর এই অভ্যর্থনার ব্যবস্থা হয়েছে। মেয়ের কেউ তাঁর সামনে বেরোলেন না। প্রভাকরবাবুর স্ত্রী, না এনাক্ষী। অমিয়ভূষণ যেন সম্মানিত কুটুম্ব নন, ইট-কাঠের কোন কনট্রাকটর। তিনি সবই বুঝলেন। নিজে যেচে কারো কথা জিজ্ঞাসা করলেন না। এমন কি নিজের মেয়ের সম্বন্ধেও উদাসীন হয়ে রইলেন।

টেবিলের অন্যদিকে অমিয়ভূষণের মুখোমুখি প্রভাকরবাবু হাসিমুখে বসেছিলেন। অমিয়ভূষণ কিছুই ছুঁলেন না দেখে বললেন, 'ও কি কিছুই খাচ্ছেন না যে।'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'অভ্যাস নেই, ওসব কিছুই আজকাল আর হজম হয় না। আপনি মিছামিছি কষ্ট করলেন। এসব কিছুর দরকার ছিল না।'

প্রভাকর গম্ভীর হয়ে উঠলেন। তারপর একটু হেসে বললেন, 'কথাটা অবশ্য ঠিক। এখন সব ভোগ সুখ থেকে আমাদের সরে থাকবার বয়স। এখন থেকে হজম হবে না, শুয়ে ঘুম হবে না। সরাসরি কিছু করবার দিন আমাদের আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে। এখন শুধু উত্তরপুরুষের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবো। তাদের সুখে সুখ তাদের দুঃখে দুঃখ। তাদের প্রশংসায় প্রশংসা। সেই তাদের যদি নিন্দামন্দ শুনি প্রাণে বড় লাগে অমিয়বাবু।'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'ছেলেমেয়ের নিন্দা শুনলে কার না কষ্ট হয়! কিন্তু আপনার তো তেমন কষ্ট পাবার কোন কারণ ঘটেছে বলে তো মনে হয় না।'

প্রভাকরবাবু বললেন, 'না ঘটলে বড়ই সুখের ব্যাপার হত। কিন্তু ঘটেছে। আপনি অধ্যাপক পণ্ডিত মানুষ। নিজের বাড়িঘরের খোঁজখবর রাখবার মত সময় আপনার নেই। মেয়েদেরই এসব লক্ষ্য রাখতে হয়।'

প্রভাকরবাবু অমিয়ভূষণের দিকে তাকালেন।

অমিয়ভূষণ বললেন, 'বলুন এমন কী ঘটেছে যা আপনার কাছে অঘটন বলে মনে হয়েছে।'

প্রভাকরবাবু বললেন, 'অঘটনের মাত্রাজ্ঞান তো সবাইর সমান নয় অমিয়বাবু। একটু আগে ছেলেমেয়েদের কথা হচ্ছিল। পুত্রবধূকে আমি আমার মেয়ের মতই মনে করি। আমি চাইনে আমার বাড়ির কোন বউ রাস্তায় রাস্তায় হৈ হৈ করে বেড়ায়, দোরে দোরে চাঁদা ভিক্ষা করে ফেরে।'

প্রভাকরবাবুর গলা এবার বেশ কঠিন শোনাল। ভঙ্গিতে শাসনের ঔদ্ধত্য।

অমিয়বাবু বললেন, 'নিজের জন্যে তো চাঁদা চাইতে যায়নি। এই অঞ্চলের একটি রাস্তার জন্যে—।'

প্রভাকরবাবু বললেন, 'চুলোয় যাক রাস্তা! সে রাস্তার সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক থাকতে পারে। শুনেছি এ ব্যাপারে যিনি পাণ্ডা তার সঙ্গে আপনাদের—। সে যাকগে। আর একজনের পারিবারিক স্ক্যাণ্ডাল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা আমার স্বভাব নয়। আমার সে সময়ও নেই। কিন্তু আমি আমার নিজের পরিবারের শুচিতা ক্ষুণ্ণ হতে দিতে পারিনে। আর যাঁরা অসতর্ক, অবুঝ, কি জেনেশুনেও অন্য কোন স্বার্থে না-বুঝবার ভান করে থাকেন তাঁদের আমি সতর্ক করে দিতে চাই।'

অমিয়ভূষণ মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তাঁর মনে হল এই প্রবল প্রতিপক্ষ তাঁকে আর তাঁর মেয়েকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারেন।

যে কোন রকমের নিগ্রহ চালাতে পারেন তাঁদের ওপর। এই বিরাট বাড়ির চোরা-কুঠুরীতে তাঁদের আটকে রাখতে পারেন। প্রভাকরবাবুর অর্থ প্রতিপত্তি তাঁর তুলনায় এতই বেশি যে অমিয়ভূষণের ওপর যে কোনরকম নিগ্রহ নির্যাতনের ক্ষমতা আছে তাঁর।

কিন্তু এই ভয় এই বিমূঢ়তা অমিয়ভূষণকে বেশিক্ষণ বিহ্বল করে রাখতে পারল না। খানিক বাদে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'এবার চলি প্রভাকরবাবু। আপনি মিথ্যেই একরাশ মিষ্টির ব্যবস্থা করেছিলেন। চায়ের সঙ্গে এমন কড়া ঝাল নোনতা না হলে কি মানায়? আপনার কথাগুলি মনে থাকবে।'

প্রভাকরবাবু বললেন, 'ওকি রাগ করলেন নাকি অমিয়বাবু? আরে বসুন বসুন!'

অমিয়বাবু অবশ্য বসলেন না। দাঁড়িয়ে থেকেই মুখে একটু হাসি টেনে বললেন, 'না না রাগ করব কেন। আপনি বেয়াই মানুষ। নিশ্চয়ই এতক্ষণ ধরে ঠাট্টা-তামাসা করছিলেন। বড়লোক বেয়াইর বড় বড় পরিহাস বুঝতে পারব না আমরা কি এত বড়ই অরসিক?'

প্রভাকরবাবু হঠাৎ যেন জবাব খুঁজে পেলেন না। একটু বাদে বললেন, 'তাতো বটেই তাতো বটেই। বসুন বসুন, আপনার মেয়ের সঙ্গে দেখা করে যান। না না তা কি হয়? আপনি এলেন অথচ বউমার সঙ্গে দেখা না করে চলে গেলে আপনার বিরুদ্ধে কী যে নালিশ উঠবে আপনি তা ভাবতে পারেন না।'

এনাক্ষী যখন তার বাবার সামনে সে দাঁড়াল সেঘরে তার শ্বশুর-কুলের আর কেউ রইলেন না। অমিয়ভূষণ অনুমান করলেন হয়তো কাছাকাছি এমন কোথাও ওঁরা আছেন যেখান থেকে বাপমেয়ের কোন কথাই ওঁদের অশ্রুত থাকবে না।

অমিয়ভূষণ মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'কেমন আছিস?'

ক্লিষ্টক্লান্ত এনাক্ষীর মুখ। যেন তার নিজের সঙ্গে নিজের এক বিরামহীন

সংগ্রাম চলেছে। এনাক্ষী অবশ্য জোর করেই একটু হাসল, বলল 'ভালোই আছি বাবা।'

অমিয়ভূষণ বললেন, 'ওঁদের রীতিনীতি সব মেনে চলবি। কোনরকম নিন্দে-মন্দ না শুনি।'

এনাক্ষী হেসেই বলল, 'তুমি ভেব না বাবা। ওঁদের রীতিনীতি যখন আর মানতে পারব না, তখন আমি নিজে থেকেই সরে দাঁড়াব।'

অমিয়ভূষণ শঙ্কিত হয়ে এদিক ওদিক তাকালেন। সর্বনাশী মেয়েটা বলে কী? দেয়ালেরও কান আছে। কোত্থেকে কে কী শুনে ফেলবে, বোকা মেয়েটার সেই খেয়ালটুকুও কি নেই?

বুঝে-শুনে চলবার জন্যে মেয়েকে আরো দুএকটা সদুপদেশ দিয়ে অমিয়ভূষণ বেরিয়ে এলেন। প্রাসাদের মত বিরাট বাড়ির লন পার হলেন, ফটক পার হলেন। আবছা অন্ধকারের ভিতর দিয়ে নিজের ছোট্ট বাড়িটির দিকে আস্তে আস্তে এগোতে লাগলেন অমিয়ভূষণ। মনে মনে ভাবলেন এই শেষ নয়, এই শুরু। প্রতিপক্ষ যত প্রবলই হোক বিনা সংঘর্ষে তিনি টিঁকতে পারবেন না। মেয়েকে যত সাবধানই তিনি করে দিয়ে আসুন সে তার নিজের পথ বেছে নেবেই। সেই দূরবর্তী এমন কি অদূরবর্তী ভবিষ্যৎ কী চেহারা নেবে তা এখন থেকেই অমিয়ভূষণ অনুমান করতে পারেন না। সামনের অন্ধকারের মতই তা আবৃত। রাত্রির স্তব্ধতায় কলোনীর বাইরের আম কাঁঠাল আর তেঁতুলের গাছগুলি নিঃশব্দে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অমিয়ভূষণ চোখ ফিরিয়ে নিলেন। ওদিকে তাকালেই কেমন একটা অস্বস্তিকর অশুভ আশঙ্কায় মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। অমিয়ভূষণ বহু চেষ্টা করেও এ ধরণের কুসংস্কারকে একেবারে নির্বাসন দিতে পারেননি।

২৮

যে তীব্র বিক্ষোভ আর বীতস্পৃহা নিয়ে করুণা দাদার বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল হস্টেলে এসে পৌছবার দিন ছয়েকের মধ্যেই তা প্রশমিত হল। সেই উত্তেজনার পরিবর্তে এক গভীর নৈরাশ্য আর শূন্যতা বোধ তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। করুণা ভেবেছিল এই নতুন জায়গা নতুন পরিবেশ হয়তো তার জীবনে নতুন স্বাদ এনে দেবে। কিন্তু এখানে এসে সে দেখল তার মন এতই জীর্ণ হয়ে গেছে যে নতুন 'কোন আনন্দ গ্রহণ করবার তার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই।

হস্টেলের নানাবয়সী উচ্ছল চাঞ্চল্য, কলকোলাহল করুণাকে বরং বিরক্ত আর বিকৃতই করে তুলল। কেউ আলাপ পরিচয় করতে এলে সাধারণ ভদ্রতা সৌজন্যের খাতিরে যে দুটো একটা কথা বলতে হয় তার চেয়েও একটি কথাও সে অতিরিক্ত ব্যয় করল না। ফলে সবাই তার কাছ থেকে দূরে সরে রইল। প্রত্যেকেরই দুচারজন করে বন্ধু আছে। অফিস ছুটির পরে তারা একসঙ্গে বেরোয়। হয়তো সিনেমায় যায়, কি আর কোথাও বেড়াতে যায়। দু তিনটি তরুণী মেয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে সদ্য বোধহয় অফিসে ঢুকেছে। তাদের একজনের নামে নীলরঙের পুরু খামে চিঠি এলে দল বেঁধে সবাই তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। তাই নিয়ে মান অভিমান ঝগড়াঝাঁটি, ফের আপোস মীমাংসা।

করুণা অমিশুক অসামাজিক বলে এরই মধ্যে অখ্যাতি অর্জন করেছে। কেউ তাকে ডাকে না, সবাই তাকে এড়িয়ে চলে। সে নিজে যে এগিয়ে গিয়ে কারো সঙ্গে মিশবে তেমন ক্ষমতা নেই করুণার। কেমন যেন সংকোচ হয়, ভয় হয়। সে ভেবে দেখেছে বিচিত্র এই রঙের সমুদ্রের মান

করবার, সাঁতার কাটবার তার আর অধিকার নেই। সে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দূর থেকে দেখতে পারে। কিন্তু শুধু চেয়ে দেখাও নিরাপদ নয়। চোখ বড় বিশ্বাসঘাতক। দৃষ্টি এক অসহায় অবুঝ তৃষ্ণার সৃষ্টি করে। সে কি সৃষ্টি না ধ্বংস? যা নৈরাশ্যে ক্ষোভে অনুশোচনায় সমস্ত সত্তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে এক অর্থহীন আক্রোশে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চায়।

জনতাও ভাল লাগে না করুণার, নির্জনতাও ভালো লাগে না।

হস্টেলে এসে বউদির ঝগড়াঝাঁটি অনর্থক দোষারোপের হাত থেকে অবশ্য সে বেঁচেছে। কিন্তু তা ছাড়া কোন নতুন লাভ হয়নি, নতুন কোন অর্থগৌরব সংযোজিত হয়নি জীবনে।

রাস্তার দিকে একটি ঝুলবারান্দা আছে। যখন হাতে কোন কাজ থাকে না বইয়ে মন বসে না করুণা এসে সেই বারান্দার সামনে দাঁড়ায়। শূন্যদৃষ্টিতে লোক চলাচল দেখে, ছুটন্ত গাড়িগুলির দিকে তাকিয়ে থাকে। মানুষগুলি যেন মানুষ নয় মানুষের ছায়া। কোত্থেকে এরা আসছে কোথায় এদের গন্তব্য কিছুই জানে না করুণা। নিজের জীবনও যেন এমনি এক অর্থহীন অসঙ্গতিতে ভরা। চেষ্টা করেও তাকে কোন এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছে দিতে পারছে না করুণা। অথচ বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে তার চালচলনে স্বাভাবিকতার কোন ব্যতিক্রম নেই। স্কুলে টিচার হিসাবে তার বেশ সুনামই আছে। করুণা তেমন মিশুক নয় বলে তাকে তারা বেশ একটু ভয় করে চললেও অশ্রদ্ধা করে না। কলীগ্‌রা তাকে নির্লিপ্ত নিস্পৃহ বলে জানে। যদিও তাদের কারো কাছেই নিজের জীবনের কথা করুণা উদ্ঘাটিত করেনি, তবু কেউ কেউ সন্দেহ করে তার একটি বিশেষ ধরণের অতীত জীবন আছে। করুক সন্দেহ তাতে কিছু এসে যায় না করুণার। তার ব্যক্তিত্ব, গুরুত্ব, গাম্ভীর্য তাতে কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয় না। তা ছাড়া মণিময়ই যে তার জীবনকে এমনভাবে ব্যর্থ করে দিয়েছে একথা স্বীকার করতেও করুণার আত্মমর্যাদায় বাধে। মণিময়ের উদাসীনতাকে সেও তো ঔদাসীন্য দিয়েই আঘাত করেছে। প্রতিশোধ নিতে সেও তো

বাকি রাখেনি। করুণার জীবন যদি ব্যর্থ হয়ে থাকে মণিময়ের জীবনও এমন কিছু ফুলেফলে সার্থকতায় ভরে ওঠেনি। সেও সাধারণ কেরানী হয়েই রয়েছে। কোন দলের নেতৃত্ব পায়নি। তারও তেমন নাম হয়নি খ্যাতি হয়নি। সেও এতদিনে প্রায় অপরিচয়ের আড়ালে পড়ে গেছে। সেও সাহস করে আর কাউকে বিয়ে করতে পারেনি। ইচ্ছা করেই হোক, আর বাধ্য হয়েই হোক সংসারের সুখ থেকে সেও তো নিজেকে বঞ্চিত রেখেছে। প্রতিশোধটা একেবারে কম নেয়নি করুণা। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তার একেবারে হার হয়নি। তা নিয়ে করুণার ক্ষোভ করবার কিছু নেই। কিন্তু ক্ষোভ করবার নেই এই কি সবচেয়ে বড় কথা! আর একজনের জীবনকে দূর থেকে সেও নিজের শুষ্কজীবনের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে এই কি সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা? কই এই আত্মপ্রসাদ তো করুণার জীবনকে পূর্ণতায় প্রসন্নতায় ভরে তুলতে পারেনি। মণিময় সব ছেড়ে দিয়ে এক অখ্যাত পল্লীর রাস্তা বাঁধবার জন্যে কোমর বেঁধে লেগেছে। করুণার মনে হয় মণিময় এই তুচ্ছ কাজে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চাইছে। এর চেয়ে জীবনে অনেক বড় কাজের জন্যে বড় সড়ক তৈরি করবার জন্যে মণিময় পৃথিবীতে এসেছিল। সে কথা সে ভুলে গেছে। কি ইচ্ছা করে ভুলে রয়েছে। করুণার কতদিন ইচ্ছা হয়েছে সে নিজে এগিয়ে গিয়ে মণিময়কে সব মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু পারেনি। কিসের এক সংকোচ যেন দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলের মত পা জড়িয়ে ধরেছে। কিছুতেই এগোতে পারেনি করুণা। সংকোচ না অভিমান না আর কিছু? ঠিক করে জানবার উপায় নেই। শুধু এইটুকু জেনেছে তাদের মধ্যে আর কিছু ঘটবে না। দুইটি গ্রহ নিজেদের কক্ষপথে চলতে চলতে শুধু একটিবারের জন্য একটি নিমেষের জন্যে পরস্পরকে স্পর্শ করেছিল। সেই সংঘাতে জীবন অপূর্ব জ্যোতির্ময়তায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, তারপর তারা ফের দূরে সরে গেছে। আর কাছে আসবার কোন সম্ভাবনা নেই। সেই স্পর্শ এখন সুদূর অতীতের অস্পষ্ট স্মৃতিমাত্র।

দারোয়ান এসে খবর দিল এক ভদ্রলোক করুণার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে নিচের বসবার ঘরে অপেক্ষা করছে।

করুণার বুক দুরুদুরু করে উঠল, অস্ফুটস্বরে বলল, 'কই দেখি, স্লিপ দেখি।'

কাগজের ভাঁজ খুলে করুণা দেখল পেনসিলে লেখা কমলাক্ষ সেনগুপ্তের নাম। করুণা যেন নিভে গিয়ে বলল 'ও'।

তারপর দারোয়ানকে বলল, 'আচ্ছা বল গিয়ে আমি যাচ্ছি।'

একটু বাদে করুণা সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল।

ভিজিটিং রুমে কমলাক্ষ বসে রয়েছে। করুণা ওর সামনের চেয়ারে এসে বসল। মাঝখানে ছোট একটি টেবিল।

করুণা বলল, 'কী ব্যাপার?'

কমলাক্ষ হাসিমুখে বলল, 'ব্যাপার আবার কি। ঢের রাগ দেখানো হয়েছে। এবার ফিরে চল পিসীমা।'

ঘরের অন্যদিকে আরো দুজন সাক্ষাৎপ্রার্থী এসেছেন। দুটি কমবয়সী মেয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন। করুণা ইসারায় তাদের দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'আস্তে।' কমলাক্ষ বলল, 'আমার কথা যদি শোন তাহলে সব কথা ফিস্‌ফিস্ করে বলব। না হলে গলা ফাটিয়ে চেঁচাব। পিসীমা পিসীমা বলে ভেউ ভেউ করে কাঁদব।'

করুণা হেসে বলল, 'তুমি যা ছেলে তা তুমি পারো। তারপর তোদের কীর্তিপুরের খবর-টবর কি তাই শুনি।'

কমলাক্ষ বলল, 'বাঃ রে, এই কদিনেই তোদের কীর্তিপুর হয়ে গেছে। খবর আর কি। এখন খবর মানেইতো রাস্তার খবর। পথে ঘাটে বৈঠকখানায় দোকানপাটে সব ওই এক আলোচনা।'

করুণা বলল, 'রাস্তা তা হলে হচ্ছে?'

কমলাক্ষ বলল, 'ঘোড়ার ডিম হচ্ছে! অত টাকা কোথায় পাবেন মণিময়বাবু? মালা এনাক্ষীরা সেদিন চাঁদা তুলতে বেরিয়েছিল। সবশুদ্ধ বোধ হয় তেত্রিশ টাকা সাড়ে সাত আনা উঠেছে।'

মণিময়ের চেষ্টা পণ্ড হচ্ছে শুনে মনে মনে খুশী হল করুণা। আর একবার ঘা খাক মণিময়, আরো আঘাত পাক দুঃখ পাক। সারা জীবন ব্যর্থ প্রয়াসে আর পণ্ডশ্রমের প্রতীক হয়ে থাকুক। কমলাক্ষ বলল, 'পরের খবরতো শুনলে এবার ঘরের খবরও শোন। তুমি নেই বলে বাড়িঘর সব খাঁ খাঁ করছে। মা তবু অনুশোচনায় জর্জর, বাবা সহোদরার বিচ্ছেদে মুহ্যমান, আর ঠাকুরমা তো বিছানা ছেড়ে উঠছেনই না। চল পিসীমা।'

করুণার মন একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেও সে মুহূর্তের মধ্যে সেই চাঞ্চল্য দমন করল। বলল, 'এখন কীকরে যাই বল ? এখন কি যাওয়া সম্ভব ?'

কমলাক্ষ বলল, 'তবে কবে যাবে ?'

করুণা বলল, 'তোর যেদিন বিয়ে হবে।'

কমলাক্ষ বলল, 'তাহলে আর আশা দেখছি না। তাহলে এ জন্মটা তোমাকে হস্টেলেই কাটাতে হবে পিসীমা।'

অনেক অনুনয়-বিনয় কাকুতি-মিনতি অনুরোধ-উপরোধ কিছুতেই যখন করুণা ফিরে যেতে রাজী হল না কমলাক্ষ তখন পকেট থেকে একটা প্যাকেট বার করল। বলল, 'এইটা তাহলে তোমার কাছে রেখে দাও। বাবা বললেন এটা তোমার কাছেই থাক।'

হাতে নিতে হল না, কাগজের প্যাকেটের চেহারা দেখেই করুণা বুঝতে পারল তার পাস-বই চেক-বই। দাদা তাহলে সব ফিরিয়ে দিচ্ছেন। করুণার সঙ্গে কোন যোগাযোগই আর তিনি তাহলে রাখতে চান না। এক সময় তার বিয়ের জন্যে করুণার নামেই কিছু কিছু করে যে টাকা জমিয়েছিলেন, বাড়ির জন্যে দেনা করেছেন তবু সে টাকা থেকে এক পয়সাও খরচ করেননি, এমন কি ধার পর্যন্ত নেননি। দাদা তার এত আপন অথচ এত পর !

হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা কমলাক্ষের হাত থেকে তুলে নিল করুণা। তারপর চুপ করে বসে রইল।

কমলাক্ষ যাওয়ার সময় বলে গেল সে দু-চার দিনের মধ্যে আবার আসছে। ততদিনে করুণা যেন ফিরে যাওয়ার জন্যে তৈরী হয়ে থাকে। তখন

আর কোন বাধা-নিষেধ কমলাক্ষ মানবে না। একেবারে হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গাড়িতে তুলবে।

নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে একই কথা করুণা ভাবতে লাগল। দাদা এত পর আর এত নিষ্ঠুর। দুদিনেই সব সম্বন্ধ চুকিয়ে ফেললেন তিনি। আসলে কেউ তাকে চায় না কেউ তার নেই। করুণার মনে হল সংসারে থেকেও এমন আত্মীয় বন্ধুহীন বন্ধনহীন ভাবে থাকা বড় কষ্ট, বড় অসহনীয়। এর চেয়ে কোন আশ্রম-টাশ্রমে গেলেও বোধ হয় আশ্রয় জোটে। মনের আশ্রয়, হৃদয়ের আশ্রয়। করুণার জানাশোনা একটি মেয়ে বীণা সোম শেষপর্যন্ত এই আশ্রমেরই স্মরণ নিয়েছে। তার নাম বদলে গেছে, পোষাক বদলে গেছে, অমন একরাশ চুল ছিল মাথায় ন্যাড়া করে ফেলেছে। করুণা দেখে ঠাট্টা করেছিল, রাগ করেছিল কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ওই পথই বা মন্দ কি। কী হবে বেশভূষায় সাজসজ্জায়। মাথার চুল রইল কি না রইল কিছুই এসে যায় না মন যদি কোথাও আশ্রয় পায় শান্তি পায়, তার যদি কোথাও একটুখানি অবলম্বন জোটে।

রাত বাড়ল। সারা হস্টেল আস্তে আস্তে ঘুমে নিঝুম হয়ে পড়ল। বড় রাস্তার গাড়ি চলাচলের শব্দও একসময় থেমে গেল। কিন্তু করুণার চোখে কিছুতেই ঘুম এল না। বিছানায় শুয়ে সে বার বার এপাশ ওপাশ করতে লাগল।

২৯

রাস্তার জন্যে টাকা সংগ্রহের চেষ্টায় বিশেষ আশার লক্ষণ দেখতে পেল না মণিময়। ছেলে-মেয়েরা পাড়ায় পাড়ায় ঘোরাঘুরি করে চাঁদা যা তুলেছে হাস্যকর। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের কাছ থেকেও বিশেষ ভরসা পাওয়া যায়নি। তিনি দু-এক হাজার টাকা ধার হিসাবে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু তাতে আর কতটুকু কি সুরাহা হবে? তবু মণিময় আর পিছিয়ে যেতে পারে না। পিছিয়ে গেলে এই কীর্তিপুর অঞ্চলে সে কোনদিন মুখ দেখাতে পারবে না। সবাই হাসাহাসি করবে। এমন কি মালা পর্যন্ত হাসবে। তার কাছে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা আর সম্মান বজায় থাকবে না মণিময়ের। তার যোগ্যত নেতৃত্বে মালা আর বিশ্বাস করবেনা।

এরই মধ্যে মালা যেন দূরে সরে যেতে শুরু করেছে। রাস্তার কাজে আগে তার যে পরিমাণ উৎসাহ দেখা যেত এখন আর তা নেই। কেন নেই তা মণিময়ের পক্ষে বোঝা কঠিন নয়। মালা আজকাল অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। গানবাজনা নিয়ে মেতেছে। অমিয় সেনের ওই বেকার বাজিয়ে ছেলেটি এখানে এসে আড্ডা গেড়েছে। তার ফলে মালার রোড-কমিটির আকর্ষণ এখন বড়ই শিথিল। কোন রকমে হাসপাতালের চাকরিটুকু সেরে এসে মালা উন্মুখ হয়ে বসে থাকে কমলাক্ষ কখন তার সেতার নিয়ে আসবে। তারপর সে এলেই গান আর গল্প। গানের একটা সহজ আকর্ষণ আছে। মানুষের মনকে তা চট করে টেনে নিতে পারে। বিশেষ করে মেয়েদের মন যেন আকৃষ্ট হবার জন্যেই তৈরী হয়ে রয়েছে। সুর তো বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয় না। শুধু কান দিয়ে শুনলেই চলে। কিন্তু এই সুরের নেশা বড় মারাত্মক নেশা। মদ কি যে কোন মাদকের মতই সর্বনাশা। মানুষকে অন্য কাজ অন্য

কর্তব্য ভুলিয়ে দেয়। শক্ত কাজের পথ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে এনে অকর্মণ্য করে ফেলে। মালার মত মেয়েকে এমন করে কাজের বাইরে চলে যেতে দেবে না মণিময়। ও একটা অ্যাসেট। শক্ত মুঠিতে সেই সম্পদকে ধরে রাখতে হবে। মুঠি আলগা হলেই বহুমূল্য মুক্তা হারিয়ে যাবে কি কোন বাঁদরের গলায় পরলে তার আর কোন দামই থাকবে না।

তাই মালার ওপর মণিময় আরো দায়িত্ব চাপিয়েছে। ফাইল-পত্রের সংখ্যা বাড়িয়েছে। সেগুলি সব ঠিকঠাক রাখবার ভার মালার ওপর। দলের কে কী মনে করল না করল তা মণিময় গ্রাহ্য করে না। শক্ত কাজ দিয়ে এই মেয়েটির শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে।

কিন্তু কলোনীগুলির লোকজন আবার উৎসাহ হারাতে শুরু করেছে। তাদের ঔৎসুক্য আর যেন টেনে রাখা যায় না। সাধারণ মানুষ কোন বড় কাজের উদ্যোগপর্বকে দেখতে চায় না। তারা কাজটাকেই প্রত্যক্ষ করতে চায়।

রোড-কমিটির সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে মণিময় তাই অবিলম্বে কাজ শুরু করে দেওয়াই ঠিক করল। সেবার উপমন্ত্রী আসায় যেমন এ অঞ্চলে দৃষ্টিগ্রাহ্য এক নাটক ঘটেছিল তেমন কিছু ফের ঘটানো চাই। নইলে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। শুধু জল্পনা-কল্পনা নয়, বৈঠকে বসে সলাপরামর্শ আর সভায় দাঁড়িয়ে ভাষণ বক্তৃতা নয় লোকে চেয়ে দেখুক সত্যিই কিছু ঘটছে।

প্রথমে মাটির কাজ। এই দু'মাইল পথে মাটি ফেলতে হবে। তারপর ইট খোয়া রাবিশ রোলিংএর ব্যবস্থা।

মণিময় মাটি-কাটা কুলি একদল ঠিক করে ফেলল। কিন্তু তাদের আগে কাজ করবে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। এই অঞ্চলেরই ভদ্রঘরের স্কুল-কলেজের ছেলেরা কোদাল ধরবে। নিজের হাতে মাটি কাটবে, মাটির ঝাঁকা নিজেরা মাথায় তুলে নেবে। যারা অর্থ দিতে পারে না, তারা নিজেদের শ্রম দেবে। দিনের পর দিন সেই শ্রমের মূল্যের হিসাব হবে। জমার ঘর আর শূন্য থাকবে না।

ভণ্টু খুব উৎসাহী হয়ে উঠল। তার সমবয়সী বন্ধুর সংখ্যা কম নয়। ভণ্টু বলল, 'আর যদি কেউ না আসে আমরাই পারব মণিময়দা। আপনি কিছু ঘাবড়াবেন না।'

মালা কিন্তু একটু ঘাবড়ে গেল। বলল, 'টাকার জোগাড় না করেই যে কাজ শুরু করে দিলেন শেষপর্যন্ত সামলাতে পারবেন তো?'

মণিময় বলল, 'সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। সব টাকা তো একসঙ্গে দরকার নেই। কিছু কিছু করে টাকার জোগাড় হবে কাজও কিছু কিছু করে এগোতে থাকবে।'

মাটি কাটার কাজে যোগ দেওয়ার জন্যে, অন্তত উপস্থিত থেকে উৎসাহ দেওয়ার জন্যে মণিময় সবাইকেই ডেকে ডেকে বেড়াতে লাগল। ডাকতে এল নীলকান্তবাবুকেও। মালার সঙ্গে মণিময় এসে তাঁর ঘরের সামনে দাঁড়াল।

নীলকান্তের অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। ঘরের মধ্যে বসে একা একা বিড় বিড় করে কী যেন বকছেন আর যা কিছু লেখা-টেখা তাঁর ছিল সব টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ছেন।

মণিময় বলল, 'চলুন নীলকান্তবাবু। আমাদের সঙ্গে আপনিও কোদাল ধরবেন চলুন।'

নীলকান্ত একবার বন্য হিংস্র পশুর মত চোখে মণিময়ের দিকে তাকালেন, তারপর মাথা নিচু করে ফের নিজের কাজে মন দিলেন।

মণিময় হাসি চেপে দোরের সামনে থেকে সরে এল। মালাকে বলল, 'চল'। মালা, বিষণ্ণ মুখে বলল, 'বাবার এই অবস্থা দেখে আমার আর কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না।'

মণিময় বলল, 'সত্যি এবার ওঁকে ডাক্তার-টাক্তার দেখাতে হবে।'

নির্মলা পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি পরম নিষ্ঠুরভাবে বললেন, 'ডাক্তার এসে কচু করবে। সব ওঁর বুজরুকি।' মালা বলল, 'তুমি কী বলছ মা? বাবা ইচ্ছা করে এসব করছেন? ইচ্ছা করে কেউ এসব করতে পারে! বছরের

পর বছর ঘরের মধ্যে ইচ্ছা করে বন্দী হয়ে থেকে নিজেকে মানুষ এভাবে কষ্ট দিতে পারে ?'

নির্মলা বললেন, 'নিজেকে তো কষ্ট দিচ্ছে না। কষ্ট দিচ্ছে আমাকে। শোধ তুলছে আমার ওপর। আমি যে ওঁর সব ব্যাপারে বাধা দিয়েছি। ওঁর নিজের খেয়াল মত চলবার পথ বন্ধ করেছি। শোধ তুলবেন না? আমিও দেখছি, আমিও দেখে যাচ্ছি। কতদূর উনি যেতে পারেন।'

স্বামীর মাথা স্বাভাবিক ভাবেই একটু একটু খারাপ হতে পারে একথা নির্মলা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চান না। নীলকান্ত ইচ্ছা করেই এইসব বুজরুকি চালাচ্ছেন, পাগল সেজে সবাইকে কষ্ট দিচ্ছেন, রোজগারের দায়িত্ব এড়াচ্ছেন এই ধারণাই নির্মলার কাছে যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়। একজীবন যে অভিনেত্রীর সঙ্গে কাটিয়ে আসতে পারল বাকি জীবন কি সে আর এইটুকু অভিনয় করে যেতে পারবে না? মণিময়কে আগেও দু একবার এই তত্ত্ব বুঝিয়েছেন নির্মলা। মণিময় ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তাই কি সম্ভব? নীলকান্ত যদি তাই পেরে থাকেন, পাগল না হয়েও বছরের পর বছর ধরে তাঁর এই ছোট সংসারের রঙ্গমঞ্চে পাগল সেজে মজা করতে পেরে থাকেন, তাহলে তাঁকে অসাধারণ অভিনেতা বলতে হবে।

নির্মলা বলেন, 'তোমরা ওঁকে আর কতটুকু জানো? আমি সব জানি। ওঁকে আমার আর চিনতে বাকি নেই।'

মণিময় ভাবে হবেও বা। সংসারে স্ত্রীই স্বামীকে সবচেয়ে ভালো করে জানে। কী একটা বইতে যেন পড়েছিল মণিময়। স্ত্রীর কাছে স্বামীকে বেশ, ছদ্মবেশ সবই খুলে ফেলতে হয়। এঁদের দাম্পত্য জীবনের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। যা আছে তা শুধু অবিশ্বাস অশ্রদ্ধা, বিদ্বেষ আর বিতৃষ্ণা। অথচ নারীপুরুষের মিলিত জীবন কত সুন্দর আর সৃষ্টিশীল হতে পারে। মণিময় নিজে তার স্বাদ পেল না। কিন্তু সেই জীবনের অপূর্বতা অনির্বচনীয়তা অনুমান করা তার পক্ষেও কঠিন নয়।

মণিময় বলল, 'চল মামা, বাড়িতে বসে থেকে তোমার কোনই লাভ হবে

না। নীলকান্তবাবু এখন সেবাশুশ্রূষার বাইরে। বরং তাঁর কাছে গেলেই তিনি বিরক্ত হবেন। কিন্তু যেখানে কাজ হচ্ছে সেখানে গিয়ে তুমি যদি দাঁড়াও অনেকে উৎসাহ পাবে। তাদের কাজ করবার শক্তি দ্বিগুণতো বাড়বেই। কারো কারো তিনগুণ চারগুণও বাড়তে পারে।'

মণিময়ের এ ধরণের কথায় মালা লজ্জিত হয়ে চোখ নামিয়ে নিল। আর তার সেই মধুর লজ্জাটুকু দুটি অপলক চোখে উপভোগ করল মণিময়।

সারাদিনভর মাটি-কাটা আর মাটি-ফেলার কাজ চলল। ক্ষমতা আছে মণিময়ের। পাড়ার নানাবয়সী ছেলেদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা সে সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছে। মণিময় নিজেও বসে থাকেনি। সে নিজেও কখনো কোদাল নিয়েছে, কখনো বা মাটি-বোঝাই ঝাঁকা তুলে নিয়েছে মাথায়। ভণ্টুদের কোন নিষেধ শোনেনি। দরদর করে ঘাম ছুটেছে গা দিয়ে। গেঞ্জিটা ভিজে যাওয়ায় মণিময় সেটা খুলে ফেলল। শুধু নাওয়া-খাওয়ার সময়টুকু ছাড়া সারাদিনের মধ্যে সে বিশ্রাম নিল না।

মণিময় যে সত্যিই এত পরিশ্রম করতে পারবে মালা তা ভাবতে পারেনি। মণিমামার শক্তি, যুবকের মত উৎসাহ উদ্যম দেখে সত্যিই সে বিস্মিত হল। সে বিস্ময়ের মধ্যে শ্রদ্ধা আর প্রীতিও মেশানো ছিল।

আশেপাশের সমস্ত কলোনীর লোক এসে মণিময়দের এই রাস্তা বাঁধার কাজ দেখে গেল। দু একজন বুড়ো মাতব্বর মন্তব্য করলেন, 'পাকা হোক, কাঁচা হোক' এবার বোধহয় সত্যিই একটা রাস্তা হবে। ছেলে-ছোকরা গুলিতো এতকাল বাজে আড্ডা-ইয়ার্কি দিয়েই বেড়াচ্ছিল। তাদের দিয়ে এই কাজ করানোর মধ্যে কেরামতি আছে হে। মানুষটি সোজা নয়।'

সন্ধ্যার পর মালাদের বাড়িতেই রোড-কমিটির সদস্যদের আপ্যায়ন করা হল। খরচটা অবশ্য কমিটির। মালা নিজের হাতে সবাইকে চা বিস্কিট তেলেভাজা পরিবেশন করল। মণিময়কেও আজ একটু বিশেষভাবে সে যত্ন করল। নতুন কোন বস্তু দিয়ে নয়, উপাদান দিয়ে নয়। শুধু সেবায় আর পরিচর্যায়।

মণিময়ের পায়ে কাদা লেগেছিল। কুয়ো থেকে জল তুলে মালা নিজের হাতে সেই পায়ে জল ঢেলে দিল। মণিময় স্নান করে এলে তোয়ালে দিয়ে মুছে দিল পিঠ। মণিময় তার এই সেবাটুকু সর্বাঙ্গ পেতে গ্রহণ করল।

আজ কমলাক্ষ আসেনি। তার নাম পর্যন্ত করেনি আজ মালা। মণিময় খোঁজ নিয়ে জেনেছে সে কীর্তিপুরে নেই। টালিগঞ্জে কোন এক বন্ধুর বাড়িতে গানবাজনার আসরে গিয়ে জমেছে। গ্রামের এই বিপুল কর্মযজ্ঞে তার কোন অংশ নেই। উৎসাহ ঔৎসুক্য পর্যন্ত নেই। এই কর্মভীরু ছেলেটিকে মনে মনে অনুকম্পা করল মণিময়। এইসব ছেলে শিল্প-চর্চার নামে একান্ত আত্মকেন্দ্রিকতার চর্চা করে। এদের মনে কোন বড় আদর্শ নেই। সাহিত্য সঙ্গীত এদের ভোগসম্ভোগের উপকরণ জোগাবার উপায় মাত্র।

সবাই বিদায় নিলে মণিময় আরো কিছুক্ষণ নির্মলা আর মালার সঙ্গে বসে বসে গল্প করল।

নির্মলা বললেন, 'অনেক রাত হল। আজ আর তোমার কলকাতায় গিয়ে দরকার নেই। সারাদিন পরিশ্রম করে ক্লান্তও হয়েছ। বিছানা করে দিই। দুটি খেয়ে বরং তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়।'

মণিময় আপত্তি করল না। হেসে বলল, 'আপনার হুকুম অমান্য করবার কি সাধ্য আছে?'

মালা বলল, 'মা, খুব তো নেমন্তন্ন-টেমতন্ন করছ। কিন্তু খাওয়াতে হবে তো ডালভাত আর আলু ভাতে।'

নির্মলা বললেন, 'কেন, একটা ডিম যে ছিল।'

মালা বলল, 'বিশু আর যীশু তা খেয়ে শেষ করেছে।'

মণিময় বলল, 'উঁহু, আজকের দিনে তো নিরামিষ খাওয়া যাবে না। চল না ষ্টেশনের ধারটা একটু দেখে আসি ডিম-টিম কোথাও জোটে কিনা।'

মালা একটু ইতস্তত করল। এত রাত্রে আবার যাবে ষ্টেশন পর্যন্ত।

অবশ্য ওখানকার চায়ের দোকানটা অনেক রাত অবধি খোলা থাকে। দেড়গুণ দাম দিয়ে দুচারটে ডিম সেখানে মিললেও মিলতে পারে। অতিথি নিজে আমিষ খেতে চাইছেন। তাকে মালা নিরামিষ খাওয়ায় কী করে। আসলে মণিমামার বোধহয় একটু বেড়াবার ইচ্ছা হয়েছে। একদিনের পরিশ্রমের ফল এই রাত্রির নিস্তব্ধতায় ইচ্ছা করছে স্বচক্ষে দেখতে।

মণিময় আর একটু তাগিদ দিতেই মালা তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। টর্চ হাতে মণিময় আগে আগে চলল। যে রাস্তা তৈরি হবে সেই পাকা রাস্তাটা তার মনের মধ্যে যেন আগেই পাকা হয়ে বসে গেছে। পাকা রাস্তা তৈরি হবার পর কোথায় কোথায় ক্যালভার্ট হবে তা পর্যন্ত মণিময় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে লাগল। এক একটা ক্যালভার্টে সাত আটশ টাকা করে খরচ পড়বে মণিময় হিসাব করে দেখেছে। ক্যালভার্ট হলে যারা এপথে চলাচল করবে তাদের বেশ সুবিধা হবে। অনেকে এদিকে বেড়াবার জন্যেও আসবে। জ্যোৎস্না-রাত্রে এখানে এসে বসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করবে।

মালা মনে মনে হাসল। সবে আজ কয়েক ঝাঁকা মাটি ফেলা হয়েছে। ইট কিনবার টাকা কোত্থেকে আসবে কিছুই ঠিক নেই; রাস্তা সত্যিসত্যিই কোনদিন শেষ হবে কিনা তার কিছু ঠিক নেই, মণিমামা এখন থেকেই ক্যালভার্টের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। স্বপ্ন সবাই দেখে, কবিত্ব সবাই করে। কেউ রাগ-রাগিণী নিয়ে কেউ বা রাস্তার ইট-সুরকি নিয়ে। এই পথ দিয়ে যেতে যেতে আর একজনের মুখে আর একরকমের স্বপ্ন আর সাধনার কথা শুনেছে মালা। তারও রাস্তা গড়বার কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু বড় দ্বিধা বড় সংশয় তার মনে। মাঝে মাঝে সে যেন সব প্রত্যাশা সব প্রত্যয় হারিয়ে ফেলে একেবারে অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যায়। তখন ভারি মায়া হয় তার জন্যে। ইচ্ছা হয় হাতখানা এগিয়ে দিতে।

ষ্টেশনের দোকানটায় চারটি ডিম পাওয়া গেল। ছ'আনা করে জোড়া।

তার একপয়সাও কমে দেবে না দোকানী। এতেই কাল সকালে তার খুব অসুবিধা হবে। মণিময় নিজেই ডিম কিনল। মালাকে কিছুতেই পয়সা দিতে দিল না। তার সব আপত্তি অগ্রাহ্য হয়ে গেল।

ফেরবার পথে আবার সেই রাস্তার গল্প করতে করতে চলল মণিময়। আজ ছেলেদের উৎসাহ দেখে সে অবাক হয়ে গেছে। এদের সহযোগিতা মণিময় যদি পায় সে আর কোন ভয় করে না। জনবলটা মনোবল বাড়াবার পক্ষে নিতান্ত কম নয়।

মালা বলল, 'উৎসাহটা আপনারও কিছু কম ছিল নাকি? কোনরকম লজ্জা সংকোচ না রেখে মাটির ঝাঁকা মাথায় নিয়ে আপনি এগিয়ে আসছিলেন, ভারি অদ্ভুত দেখাচ্ছিল আপনাকে।'

স্তূপীকৃত কাঁচা মাটিব ওপর মণিময় তার টর্চের আলো যেন সস্নেহে বুলিয়ে নিল। তারপর মালার দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'সত্যি ভালো লাগছিল তোমার?'

মালা কোন জবাব দিল না। কিন্তু ওর স্মিত সম্মতিটুকু দেখতে পেল মণিময়।

আরো কয়েক পা এগিয়ে হঠাৎ মণিময় থেমে দাঁড়াল। রাস্তাটা এখান থেকে মোড় ঘুরেছে। সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে অরণ্যের অন্ধকার। হঠাৎ মণিময়ের টর্চের আলো সেই ঘনঅন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে মালার হাতখানা তুলে নিল মণিময়। তারপর একই সঙ্গে বাসনায় উত্তপ্ত আর আবেগে আর্দ্রকণ্ঠে বলল, 'জানো মালা এই রাস্তার শুরুতে তুমিই ছিলে। যেতে যেতে তুমি সেই যে একবার পড়ে গিয়েছিলে, আর আমি এমনি করেই তোমার হাতখানা সেদিন ধরে ফেলেছিলাম। সেদিন থেকেই আমি মনে মনে সঙ্কল্প করেছিলাম এই রাস্তা আমি পাকা করে তৈরি করব। দশজন এই পথ দিয়ে একদিন হাঁটবে। কেউ জানবে আসল ইনস্পিরেশন কার কাছ থেকে এসেছিল। কবিরা একজনকে লক্ষ্য করে যে কবিতা লেখেন হাজার হাজার মানুষ তা পড়ে

আনন্দ পায়। আমার এই পথের মহাকাব্যও তোমার জন্যে লেখা হবে মালা। আর তুমি যদি সম্মতি দাও এই পথ আমাদের একদিন ঘরেঁও পৌঁছে দিতে পারে। সম্পর্কে তো কোন বাধা নেই—।'

মালা মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর মণিময়ের মুঠি থেকে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'আপনি ভুল করেছেন। আমি আপনাকে সে চোখে কোনদিন দেখিনি। কোনদিন দেখতে পারবও না।'

পরক্ষণে মণিময়ের হাতের টর্চ জ্বলে উঠল কিন্তু অন্তরের সব দীপ্তি যেন নিভে গেছে।

বাকি পথটুকু তারা বিনাবাক্যে হেঁটে এল। অনুশোচনায় আত্মধিক্কারে তার মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, এ কী করল মণিময়! কেন এমন করে নিজেকে লাঞ্ছনা অপমান অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়ে দিল? আর কি সে কাউকে কোনদিন মুখ দেখাতে পারবে? এই গ্লানির গহ্বর থেকে কোনদিন কি আর মাথা তুলতে পারবে?

মণিময় বলল, 'আমি এবার ফিরে যাই মালা।'

মালা বলল, 'না না সে কি হয়? বাস বন্ধ হয়ে গেছে। ট্রেন একটা আছে। কিন্তু সে দেড়ঘণ্টার আগে নয়। তা ছাড়া ফিরে যাবার তো কোন দরকার নেই।'

ডাল, ডালের বড়া, একটু নিরামিষ তরকারি আর একমাত্র আমিষ পেঁয়াজ, ঘি, গরমমসলা দিয়ে ডিমের কালিয়া রান্না করলেন নির্মলা।

অন্য দিনের মত মালা আজও পরিবেশন করল। কিন্তু কিছুতেই যেন কোন স্বাদ নেই।

নির্মলা বললেন, 'রান্না কি ভালো হয়নি মণিময়?'

'ভালোই তো হয়েছে!'

'তবে খাচ্ছ না কেন?'

মণিময় বলল, 'খাচ্ছি তো।'

নির্মলা বলল, 'সারাদিন অত পরিশ্রম করতে কি কেউ পারে ? মালা ওর বিছানাটা তাড়াতাড়ি পেতে দে।'

মালা বলল, 'বিছানা পেতে রেখে এসেছি।'

পরিপাটি করে বিছানা পাতা আছে। সামনে ছোট একটি টিপয়ের ওপর কাঁচের গ্লাসে জল টলটল করছে। কিন্তু ও জল মণিময়ের জন্য নয়।

হ্যারিকেনের আলো নিবিয়ে দিয়ে মণিময় শুয়ে পড়ল। কিন্তু সারাদিনের এত শ্রান্তি এত ক্লান্তির পরেও মণিময়ের চোখে ঘুম এল না। বার বার তার মনে হতে লাগল আজ থেকে এ বাড়ির দোর তার কাছে বন্ধ হয়ে গেল। ঘরতো বন্ধ হলই পথও বন্ধ। এর পর কি ওই রাস্তার কাজে সে আর হাত দিতে পারবে ? ছেলেরা যত উৎসাহই দেখাক মণিময়ের সমস্ত উৎসাহ উদ্যম আজ নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাকে দিয়ে আর কিছু হবে না, কোন কাজ চলবে না।

সারারাত অনিদ্রায় কাটিয়ে ভোর হবার সময় মণিময় ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল বেলা প্রায় নটায়। ঘুমের মধ্যে কী যে আজে বাজে স্বপ্ন দেখেছে তার কিছু ঠিক নেই। কিছুই মনে করতে পারছে না মণিময়। যতদূর মনে পড়ছে কোত্থেকে ভীষণ বিকটাকার দৈত্য এসে সব ভেঙে-চুরে ছারখার করে দিয়ে গেছে। তার সেই কদাকার পায়ের তলায় থেঁতলে দিয়ে গেছে মান মর্যাদা আর ভবিষ্যতের কর্মশক্তি।

নির্মলাই চা করে নিয়ে এলেন। মণিময়ের ঘুম কেমন হয়েছিল, শরীর কেমন আছে জিজ্ঞাসা করলেন।

বললেন, 'মালার সকালে ডিউটি। তাই ভোরে উঠে প্রথম বাসেই চলে গেছে। তুমি অঘোরে ঘুমোচ্ছিলে দেখে তোমাকে আর ডাকেনি।'

চা খেয়ে আর দেরি করল না মণিময়। নির্মলার কাছ থেকে বিদায় নিল।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আবার কবে আসবে ?'

মণিময় ম্লান হেসে মৃদুস্বরে বলল, 'দেখি।' তারপর দ্রুতপায়ে পথে নেমে পড়ল।

'এই যে মণিময়বাবু, হন হন করে কোথায় যাচ্ছেন ? একটু দাঁড়ান,

'আপনার একটা রেজিষ্ট্রি চিঠি আছে। কাল থেকে ঘুরছি ধরতে পারিনি আপনাকে।'

মণিময় চোখ তুলে পোষ্ট-অফিসের পিয়নকে দেখতে পেল। বলল, 'আমার চিঠি?'

পিয়ন বলল, 'আপনারই। আপনিইতো রোড-কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী?'

মণিময় বলল, 'হ্যাঁ।'

তারপর চিঠিটা সই করে রাখল।

ব্যস্ত পিয়ন বিড়ি ধরিয়ে একটু দাঁড়িয়ে আলাপ করে গেল। হেসে বলল, 'কী আপনাদের রাস্তা-টাস্তা কী রকম হচ্ছে? মাটিতো ফেললেন, কিন্তু এই বর্ষায় যে সব ধুয়ে যাবে।'

আর একটু এগিয়ে মণিময় খামটা খুলে ফেলল। কে লিখল এই চিঠি? সরকারী চিঠি তো নয়, তাহলে তার ছাপ থাকত।

খাম খুলে অবাক হয়ে গেল মণিময়। ভিতরে চিঠিপত্র কিছু নেই। শুধু ছোট একখানা চেক। কীর্তিপুর রোড কমিটির জেনারেল সেক্রেটারীকে করুণাকণা সেনগুপ্ত দশ হাজার টাকা দিয়েছে।

চেকখানা খামের মধ্যে ফের ভরে রাখল মণিময়। তার চলবার শক্তি যেন আর নেই। ঝাপসা দুটি চোখে সামনের পথ অস্পষ্ট হয়ে গেছে। সেভিংস ব্যাঙ্কের এই চেকখানির মধ্যে কণা নিশ্চয়ই তার সর্বস্ব ধরে দিয়েছে। কিন্তু নেওয়ার ক্ষমতা কি আর আছে মণিময়ের?

৩০

নীলকান্ত আবার কাগজকলম জোগাড় করে লিখতে বসলেন। মুক্তির আর কোন পথ নেই। সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা, ব্যর্থতা-নৈরাশ্যকে অক্ষরে অক্ষরে ফের গেঁথে তুলতে হবে। ভুলভ্রান্তি, মূঢ়তা-দুর্বলতা, জীবনব্যাপী স্খলন-পতনের পুনঃপৌনিকতা, ছলনা-বঞ্চনা উপহাস-পরিহাস সহস্র আকাঙ্ক্ষা আর তার অপরিতৃপ্তি সবই রূপসৃষ্টির উপাদান। শুধু এই একটিমাত্র সিঁড়ি আছে নীলকান্তের পক্ষে ওপরে উঠবার নিজেকে নিজে অতিক্রম করে যাবার। নিজের অপকীর্তি আর অকৃতিত্বকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একজনের বলে মনে করবার জন্যে তাঁর কাছে এই একটি মাত্র পথই খোলা আছে। আর সব বন্ধ।

ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন নীলকান্ত। বাইরের গোলমাল কানে আসে। বাইরের যে জগৎ তাঁর কাছে একান্ত প্রতিকূল তার সঙ্গে নীলকান্তের কোন সম্পর্ক নেই। যেখানে সহানুভূতি নেই, সমবেদনা নেই, সেই জগতে রূপ কোথায়? সে তো এক প্রকাণ্ড মুখভরা প্রচণ্ড বিদ্রূপ। সে মুখ দেখবেন না নীলকান্ত। দরজা খুলবেন না, জানলা খুলবেন না। শত্রুর মুখ দেখবেন না। শত্রুকে দুর্গের ভিতরে ঢুকতে দেবেন না। প্রাণপণে নিজের দুর্গ আগলে রাখবেন নীলকান্ত। বাইরে হাজার হাজার শত্রু লাখ লাখ শত্রু। নাকি কোটি কোটি। রোগবীজাণুর মত তারা অসংখ্য। নীলকান্ত অসহায় একা। একা হতে পারেন? কিন্তু অসহায় হবেন কেন? তিনি যদি দোর খুলে না দেন কে তাঁর ঘরে ঢুকতে পারে? দুর্গ কি একটা? অনেক, অনেক। ঘরের দরজা ভেঙে তুমি আমার কাছে এসে দাঁড়াতে পার, হাজার প্রহরণ নিয়ে হাজারখানা হাতে আমাকেও ভাঙবার চেষ্টা করতে পার, আমাকেও ভাঙতে পার, তোমার বিদ্রূপে, অবজ্ঞায়, পরিহাসে আমাকে বিদ্ধ করতে পার, কিন্তু

তারপর? ভিতরে ঢুকে দেখবে সব ফাঁকা। তুমি যার জন্যে ঢুকেছিলে তা নেই। আমি তা নিয়ে পালিয়েছি। আর এক দুর্গে চলে গেছি। সে দুর্গ তুমি দখল করলে আর এক দুর্গে, তারপর আর এক দুর্গে। তুমি কিছুতেই আমার মনকে ছুঁতে পারবে না। তাকে আমি চারদিকে পাহারা দিয়ে সযত্নে রক্ষা করব। যে মনের মধ্যে সব দুঃখ জমা করে রেখেছি, তোমাদের আঘাতে আঘাতে যা রক্তাক্ত হয়েছে, সেই রক্ত শুকিয়ে আবার কালো হয়েছে। আমি সেই মন তোমাদের দেখতে দেব না।

'দোর খোল দোর খোল। আজ কি তোমার নাওয়া-খাওয়া নেই? কী হল তোমার?'

'আমার যা হয়েছে হোক। তা শুনে তোমার দরকার নেই। তুমি স্ত্রীরূপিণী মায়াবিনী। তোমার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি আমার ওপর নেই। তুমি আমাব শত্রু, শত্রু, শত্রু! তোমাকে দোর খুলে দেব আর অক্ষৌহিণী নিয়ে তুমি ঘবে ঢুকবে। আমি কি এতই বোকা?'

'বাবা, দরজা খোল। তোমার দুটি পায়ে পড়ি। কিছু খেয়ে নাও। না খেয়ে খেয়ে শরীরটাকে তো একেবারে শেষ করতে বসেছ। এমন করলে দেহ কদিন থাকবে?'

থাকবে না। থাকুক আমি চাই না। তুমি কন্যারূপিণী মায়াবিনী। তোমাকে আমি চিনি। খুব চিনি। তুমি আমাব আত্মজা কিন্তু আমার আত্মার সঙ্গে তোমার আর কোন সম্পর্ক নেই। তুমি এখন দূরে কত দূরে চলে গেছ। পাশের ঘরে থেকেও কতদূরে তুমি। তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখের কতটুকু আমি বুঝতে পারি? কতটুকু তুমি আমাকে বুঝতে দাও? আমার চেয়ে তোমাকে অনেক বেশি বোঝে অনেক বেশি জানে তোমার সমবয়সী যুবকবন্ধু। আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কত ক্ষীণ কত ক্ষীণ। আজ আমি না থাকলেও তোমার চলে কিন্তু একদিন আমি না আসলে তুমি আসতে না, তুমি ঠিক তুমি হতে না, আর একজনের ঘরে আর এক তুমি হতে সে কথা তুমি ভুলে গেছ। আমার মধ্যে তোমার আর কোন বিস্ময় নেই, আমার সম্বন্ধে

তোমার আর কোন কৌতূহল নেই। আমি তোমার কাছে অতীত, মৃত, প্রেত, বেশির ভাগ সময় অনভিপ্রেত। আমাকে না হলে তোমার যদি চলে তোমাকে না হলেই বা আমার চলবে না কেন?

নীলকান্ত ফের লিখতে বসলেন। কিন্তু আশ্চর্য একটি লাইনও বেরোচ্ছে না। এত কথা, এত কথা জমে আছে মনের মধ্যে কিন্তু কোথায় তার অমরময় রূপ? তিনি কি ভাষা ভুলে গেলেন? বোবা হয়ে গেলেন?

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যেতে লাগল। নীলকান্তের সময় জ্ঞান নেই। রাগ করে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন কলম, ভেঙে ফেলে দিলেন দোয়াত। কালি মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ল। তারপর সেই কালি শুধু মেঝে নয়, মেঝ থেকে চার দেয়ালে, বদ্ধ চালে, ঘরের মধ্যে যেটুকু ফাঁকা জায়গা ছিল তার সবখানি আবৃত করে দিল। নীলকান্তের মনে হল তিনি যেন এক অতল অনন্ত অন্ধকারতমঃ সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছেন। চারদিকে অনেক লোকজন। কিন্তু কেউ তাঁকে তুলছে না। তাঁর স্বর কারো কানে গিয়ে পৌঁছচ্ছে না। তিনি ভাষা ভুলে গেছেন। তিনি মৃত্যুযন্ত্রণাকে প্রকাশ করতে ভুলে গেছেন, যা মরণেরও বাড়া।

নীলকান্ত প্রাণপণে চীৎকার করে উঠলেন, 'ছেড়ে দাও আমাকে, দোর খুলে দাও, আমি বেরোব।'

তারপর নিজেই প্রচণ্ড বেগে অসুরের মত দরজা ভেঙে বেরিয়ে এলেন। কোত্থেকে যেন করুণ কান্নার সুর ভেসে আসছে। নীলকান্ত কোন কান্না শুনতে চান না। তাঁর নিজের মধ্যে যত কান্না আছে তাই কি যথেষ্ট নয়? ওঘরের বারান্দায় বসে একটি লোক কী একটা অদ্ভুত যন্ত্র হাতে কী যেন শব্দ করছে আর পৃথিবীর সমস্ত দুঃসহ যন্ত্রণা তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে। নীলকান্তের সমস্ত স্নায়ু দুঃসহ ক্রোধে ছিঁড়ে পড়ল। যারা তাঁকে ঠকিয়েছে, হিংসা করেছে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বিদ্ধ করেছে ও তাদেরই একজন। সেই তারাই। নীলকান্ত দুঃসহ ক্রোধে যন্ত্রটা কেড়ে নিয়ে প্রবল শক্তিতে আছড়ে ফেলে দিলেন।

ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে মালা আর্তনাদের সুরে বলল, 'এ কি বাবা, এ কি করলে !'

নীলকান্ত হেসে উঠলেন। এতদিনে প্রতিকূল পৃথিবীর মুখের ওপর তিনি বিষাক্ত বিদ্রূপ ছিটিয়ে দিতে পেরেছেন। শুধু সেতারই নয় ঘটি বাটি হাতের কাছে যা পেলেন তাইই ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন তিনি।

অর্ধনগ্ন কিন্তু পূর্ণ উন্মাদ নীলকান্তকে পড়শীরা এসে ধরে ফেলল। আপাতত তাঁকে তাঁর নিজের ঘরেই বেঁধে রাখা হল।

তিনি চেঁচাতে লাগলেন, 'ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও, বেরোতে দাও আমাকে।'

কন্তু প্রাণের ভয়ে কেউ তাঁর অনুরোধ রাখতে সাহস পেল না।

যে ঘর থেকে নীলকান্ত একমুহূর্তের জন্যেও বেরোতে চাইতেন না সেই ঘরে তাঁকে বন্দী করে রাখা হল। এতদিন যিনি স্বেচ্ছাবন্দী ছিলেন তিনি পরম অনিচ্ছায় শিকল পরলেন।

মুখরা নির্মলা এতক্ষণে মূক হয়েছেন। নির্বাক আর নিঃসংশয়।

কিন্তু গলিত লাভাস্রোতের মত নীলকান্তের মুখ থেকে অশ্লীল অশ্রাব্য গালিগালাজ ঝরে পড়তে লাগল। এধরণের কথা তিনি কখনো উচ্চারণ করতে পারেন তা কেউ ভাবেনি।

কমলাক্ষ শুধু বিমূঢ় হয়ে এক পাশে দাঁড়িয়েছিল। মালা এসে তার সামনে দাঁড়াল। যেন ঝড়ের মধ্যে বিপর্যস্ত ত্রস্ত ভয়ার্ত পাখী।

প্রথম কোন সান্ত্বনার কথাটি বলা যায় হঠাৎ ভেবে পেল না কমলাক্ষ।

মালা বলল, 'একজন ডাক্তার ডেকে আনুন না।'

কমলাক্ষ বলল, 'এ রোগে সাধারণ ডাক্তার কী করবে।' ওঁর অন্যরকম ট্রিটমেণ্ট করতে হবে।'

মালা বলল, 'কী সর্বনাশ হয়ে গেল বলুনতো।'

কমলাক্ষ বলল, 'অত ভাবছেন কেন। এটা নিশ্চয়ই টেম্পোরারি ইনস্যানিটি। আমার তো মনে হয় শিগগিরই উনি ফের ভালো হয়ে উঠবেন।'

কুড়িয়ে-আনা ভাঙা সেতারটার দিকে বার চোখ পড়ল মালার। কুণ্ঠিত

ভাবে বলল, 'ওটা বোধ হয় একেবারেই গেছে। আপনার কত ক্ষতি হয়ে গেল। এত লজ্জা করছে আমার। আমিই আপনাকে খবর দিয়ে এনেছিলাম।'

কমলাক্ষ চুপ করে থেকে বলল, 'ওর জন্যে ভাববেন না। আবার একটা কিনে নেওয়া যাবে।'

মালা হঠাৎ ছল ছল দুটি চোখ তুলে কমলাক্ষের দিকে তাকাল। 'দেখুন আমাদের আর কেউ নেই, আমরা বড় অসহায়।'

এতদিনের আলাপ পরিচয় কিন্তু মালা এমনভাবে কোনদিন কথা বলেনি। এমন অন্তরঙ্গ সুর কোনদিন তার মুখে ফুটে ওঠেনি। এই বিপর্যয় ওকে যেমন একান্তভাবে কাছে এনে দিয়েছে, কমলাক্ষের মনে হল সুরই হোক কি জীবনের অন্য কোন সমস্যাই হোক কিছুই তাকে এমন করে এগিয়ে আনতে পারেনি।

কমলাক্ষ বলল, 'নিজেকে অমন নিঃসহায় মনে করবেন না। অন্তত একজন—'

কথাটা শেষ করল না কমলাক্ষ। ভারি লজ্জা হল বাকি শব্দ কটি উচ্চারণ করতে। মুখে বলে কিই বা হবে। ভরসা দেওয়া চাই কাজের ভিতর দিয়ে। তার জন্যে চাই শক্তি, চাই যোগ্যতা অর্জন। শুধু নিজের জন্যে নয়, আরো একজনের জন্যে, আরো অনেকের জন্যে।

শেষ